বনতুলসী

বনতুলসী

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য



ক্যালকাটা বুক হাউস্
১/১, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীপরেশ চন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১।১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬১

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থনা :
নিউ ক্যালকাটা বাইণ্ডার্স
৫, নবীন পাল লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীগজেন্দ্রনাথ চৌধুরী,
প্রিণ্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিমিটেড,
১, গঙ্গাধর বাবু লেন, কলিকাতা-১২

মূল্য চার টাকা মাত্র

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন গুপ্ত

জীবন-রহস্য-রসিকেষু

কবিতা ও ছোটগল্প লেখকরূপেই বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম ; তারপর ক্রমে সাহিত্য-গবেষণার গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দুইটি পথই হারাইয়া ফেলিয়াছি। ১৯৩৯ সনে আমার 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই আমি 'মধুমালা' ও 'আজব বেদে' নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ এবং 'মনের আগুন' নামক একখানি ছোট গল্পের সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই তিনখানি মাত্র ব্যতীত আমার আর সকল বই-ই সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা সাহিত্য-গবেষণামূলক—ইহা ব্যতীত কাব্য ও কথা-সাহিত্যের আর কোন গ্রন্থ আমি রচনা করি নাই ; তবে আমার নামীয় আরও কয়েকজন লেখক বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর কয়েকখানি রচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি ; ইহাদের সঙ্গে আমার যে কোন সম্পর্ক নাই, তাহাই আমি নিবেদন করিতে চাই। সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরও কিছু কিছু যে ছোটগল্প এখানে সেখানে প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই একত্র করিয়া 'বনতুলসী' সংকলিত হইল। ইহার কয়েকটি গল্প 'বাৎস্যায়ন ভট্ট' এই ছদ্মনামে কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন স্বনামেই তাহা প্রকাশিত হইল। কারণ, এখন ছদ্মনাম রক্ষা করিবার আর কোন প্রয়োজন দেখি না।

সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই গল্পগুলি পাঠ করিয়া লেখককে যে ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছি। কল্যাণভাজন ডক্টর শ্রীমান্ অধীরকুমার দে এবং শ্রীমান্ তুষার চট্টোপাধ্যায় পুস্তকখানি প্রকাশের কার্যে নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছেন।

'ভট্টাচার্য ভবন'
৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড,
কলিকাতা-৩৪

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

॥ সূচী ॥

বনতুলসী

বনতুলসী

শাকার বৌটা যেদিন মরিয়া গেল, সে'দিন কেহই অনুমানও করিতে পাবে নাই যে, তাহাব দশদিনের ছেলেটা আবার বাঁচিয়া উঠিবে। সেইজন্য তিন চার মাস পর হাসপাতাল হইতে যেদিন তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া শাকা ধাওবায় ফিরিযা আসিল, তখন সরকারি হাসপাতালের শুশ্রূষাকারিণীদিগেব সেবা ও যত্নে এতকাল লালিত পালিত শিশুটির দিব্য পুষ্ট দেহখানি দেখিযা সাঁওতাল কুলিব দল একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, মা মরা ছেলে, এ' যে রাজার বেটা হয়েছে রে, শাকা! বউটা থাক্‌লে আজ কত খুসী হ'ত। শুনিয়া শাকার চোখ দুইটি জলে ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল।

শাকা কয়লা খাদের কুলি। তাহাকে সকাল ছয়টা হইতে গিয়া খাদের নীচে নামিতে হয়, সন্ধ্যা ছয়টায উঠিয়া আসিতে হয়, আবার কখনও সন্ধ্যা ছয়টায় নামিয়া সারা রাত কাটাইয়া একেবারে সকাল ছয়টায় উপরে উঠিতে হয়। সকল কুলির জন্যই এই ব্যবস্থা। শাকা মাতৃহীন শিশুটিকে লইয়া ধাওরায় ফিরিয়া অল্পকালের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে, ইহাকে লইয়া তাহার মত নিঃসঙ্গ লোকের খাদের কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। ইহাকে নাওয়ানো খাওয়ানো ঘুম-পাড়ানো, তারপর ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যখন কাঁই কাঁই করিয়া কাঁদিতে থাকিবে, তখন সামলানো, ইহা তাহার মত একা লোকের কখনই কর্ম্ম নহে। আর শুধু একা বলিয়াই কি! ধাওরায় এমন সাঁওতাল মেয়ে ত অনেকেই আছে,—তাহাদের স্বামী হয়ত খাদের দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছে, সংসারে শিশু সন্তান আর স্ত্রী, আর দেখিবার শুনিবার লোক নাই, অথচ সেই

মেয়েরাও ত একা হইয়াও সংসারের দশ কাজ গুছাইয়া ছেলে সামলাইয়া খাদের কাজ করিতেছে, কিন্তু শাকার সে অভ্যাস কোন কালেই নাই। তাহার বউ বাঁচিয়া থাকিতে সংসারের কোন কাজেই সে হাত দিতে যাইত না, সেইজন্যই তাহার আজ এই শাস্তি।

সেই দিন সন্ধ্যায় ধাওরার সর্দার কাজ হইতে ফিরিয়া দেখিতে পাইল, শাকা বারান্দার বাহিরে একটা খাটিয়ার উপর দুই হাতের তালুর উপর তাহার শিশুপুত্রটিকে লইয়া বসিয়া আছে। সর্দার অত্যন্ত বদ্‌মেজাজি লোক, তায় আবার খাদ হইতে ফিরিবার পথে পঁচাই খানা হইতে এক বাটি তাড়ি সদ্য পান করিয়া আসিয়াছিল।

সর্দারকে আসিতে দেখিয়া শাকা উঠিয়া দাঁড়াইল, সেও মনে মনে ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিল যে, সে আজ সারাদিন কাজে যাইতে পারে নাই বলিয়া সর্দারের কাছে বকুনি খাইবে এবং তাহার উত্তরও সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

সর্দার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কাজে যাওয়া হয় নি বুঝি, না? তাহার প্রশ্ন করিবার ভঙ্গিতেই শাকা মনে মনে যাহা গুছাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা সমস্তই ভুলিয়া গেল। তবু কোন মতে অবস্থাটা বুঝাইয়া বলিতে গেল।

সর্দার শুনিয়া একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, তাই নাকি, ছেলেটা আজও বেঁচে রৈছে? এত ভারি আশ্চর্য! বলিয়া একবার ছেলেটার দিকে তাকাইয়া মদের নেশায় ঢুলিতে ঢুলিতে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

পরদিন সকাল ছয়টার ভোঁ পড়িবার অনেক আগেই শাকা ঘুম ভাঙিয়া উঠিল। ঘুমন্ত ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া পদীর মার ঘরের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

পদীর মার অনেক বয়স হইয়াছে, তায় আবার চোখে দেখিতে পায় না, তাহার প্রায় কুড়ি বছর বয়সের মেয়ে ময়ুরা খাদে কাজ করে, তাহাতেই

তাহাদের দুই জনের কোন মতে চলিয়া যায়। ময়ূরার বড় বোনের নাম পদী, অনেক দিন হইল তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর হইতে সে যে স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসে নাই।

শাকা পদীর মার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ময়ূরা তখনও ঘুম হইতে উঠে নাই, অথচ ছয়টার ভোঁ পড়িতে আর বাকি নাই, তাহাকেও ছয়টায় গিয়া খাদে নামিতে হইবে।

শাকা একবার ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল, কি লা ময়ূরা, বড্ড যে ঘুমুচ্ছিস, কাজে যাবি নে ?

ময়ূরা জাগিয়াই ছিল, সে শাকার গলা শুনিতে পাইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, কিরে, এত সকালে যে, খবর কি ? এইটেই বুঝি তোর ছেলে ?

পদীর মা ঘরের এক কোণে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। সারা রাত্র তাহার ঘুম হয় না ; ধাওড়ার ঘরগুলি গ্রীষ্মকালে এমনি গরম যে, কাহার সাধ্য ভিতরে গিয়া এক মুহূর্তের জন্য স্থির হইয়া থাকিতে পারে ; তবে কুলিদিগের কথা স্বতন্ত্র—তাহারা সারাদিন খাদে খাটিয়া আসে, সন্ধ্যার পর যেখানেই হউক শুইয়া পড়িলেই ঘুম আসিয়া যায় ; কিন্তু পদীর মার ত আর সেই বালাই নাই ! কয় বৎসর ধরিয়া একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছে, ঘরের বাহিরটি হইবার যো নাই ; এমন কি, ধাওড়ার সবগুলি কুলি কাজে চলিয়া গেলে এতটুকু কথা বলিবার জন্য একটা লোক পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠে।

পদীর মা শাকার গলা শুনিয়া তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া একবার মাথাটা তুলিল। বলিল, ছেলেটাকে আবার হাসপাতাল থেকে ঘরকে লিয়ে এইচিস্ কেনে ? থাক্‌ত ওখানে পড়ে, দু'দিন বাদে আপনা থেকেই পাদ্রী সাহেবরা লিয়ে যেত ! তুই কোন্ দিক সাম্‌লাবি বল্ ?

শাকা একটু আশ্বস্ত হইয়া ছেলেটাকে লইয়া পদীর মার দিকে আগাইয়া গেল, একটু অনুনয়ের সুরে বলিল, তুমি ত সারাদিন ঘর থেকে

বেরোও না, মাসি, তোমার কাছে ছেলেটাকে রেখে যাব, যদি ক'টা দিন একটু কাছে নিয়ে ব'সে থাক, তবে কাজটা হাতছাড়া হয় না!

পদীর মা একটু মুচকিয়া হাসিল। হাসির বোধ হয় অর্থ এই যে, এই যে অন্ধ লোকটাকে সংসারের একেবারে জঞ্জাল বলিয়া তোমরা বিবেচনা কর, সময়ে অসময়ে তাহাকে দিয়াও ছোট বড় একটা কাজ করাইয়া লওয়া একেবারে অসম্ভব হয় না!

পদীর মা বলিল, তা' আর ভাবনা কি, হাসপাতালের ঐ যে ছোট বাবু আছে, ও'কে চারটে পয়সা দিলে এক দানা আফিম্ দেবে, আমাব কাছে ও'টা দিয়ে যাস্, একটু একটু মুখে দিয়ে সারাদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌ব, তারপর সন্ধ্যেয় ফিরে তুই একটা ব্যবস্থা কর্‌লেই চল্‌বে।

শাকা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সুরে বলিল, তোমাদের দশজনের দয়াতেই ত এখানে থাক্‌তে সাহস পাচ্ছি, মাসি! নইলে বউটা যেদিন মরে গেল, সে দিন মনে করেছিলাম, আর এই কাজ কর্ম দিয়ে কি হবে, বনের সাঁওতাল হয়ে জন্মেচি আবার বনকে চলে যা'ব! তাই হয় ত চলেও যেতাম, মাসি! কিন্তু হাসপাতাল থেকে ডাক্তার বাবু যখন খবর পাঠালেন, তোর ছেলেটাকে দেখবি আয়, তখন ছেলেটাকে দেখে এসে আর ঘর ছেড়ে বেরুতে ইচ্ছে হ'লো না। ভাব্‌লাম, তোমরা দশজন আছ, আমার ছেলেটার একটা ব্যবস্থা হবেই!

ঘুমের চোখে ময়ূরা খাটিয়ার উপর বসিযা শাকার কথাগুলি শুনিতেছিল। তখনও ভাল করিয়া চারিদিক ফর্সা হয় নাই, ধাওরায় ঘরে ঘরে সকল কুলিই জাগিয়া উঠিয়াছে, যে যাহার মত এক রকম খাইয়া দাইয়া দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

ময়ূরা শাকার কথার উপর একটা ধমক দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, নে নে, কথা রাখ, এখন কাজে বেরুবি কি না দেখ, খাদে ভোঁ পড়্‌ল বলে। বলিয়া নিজে উঠিয়া বাসি মুখেই গত রাত্রের এক হাঁড়ি পান্তা ভাত খাইতে বসিয়া গেল।

শাকা পদীর মার সম্মুখে ছেলেটাকে শোয়াইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পদীর মা বলিয়া উঠিল, দেখ, সারাদিন খেতে না দিলে ছেলে কিন্তু কেঁদে খুন হবে, আমি সামলাতে পার্‌ব না, পারিস্ ত হাসপাতাল থেকে নিয়ে একটু যা' বল্লাম আমাকে দিয়ে যাস, রাত্তিরে এসে তুই একটু কিছু খাওয়ালেই চলবে।

ময়ূরা উপহাস করিয়া উঠিল, আহা, মরা বৌয়ের সোহাগ আজও গায়ে লেগে রয়েছে, ছেলে পুষ্‌বার সাধ্যি নেই, তবু এটাকে নিয়ে টানাটানি। দে না ওটাকে পাদ্রীদের হাতে তুলে, সুখে থাক্‌বে।

শাকা তাহার কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া বাহির হইয়া গেল। ময়ূরার মনে তাহার মা'র এই ব্যবস্থাটা আদৌ ভাল লাগিল না। কিন্তু তবু তাহার মনেব অবস্থাও স্পষ্ট করিয়া কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না।

ময়ূরার এই দীর্ঘ অবিবাহিত জীবনের একটু ইতিহাস আছে।

একবার বৎসর তিনচারি আগে পৌষ সংক্রান্তির দিন সে দামোদর তীরে কালাঝড়ের মেলা দেখিতে গিয়াছিল। সঙ্গে তখন তাহার দিদি পদীও ছিল। সর্দারই ধাওরার মেয়েগুলিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ফিবিবার সময় ময়ূরা মেলার মধ্যে কোথায় যে হারাইয়া গেল, আর কেহ তাহাকে খুঁজিযা পাইল না। পদী কাঁদিয়া ঘরে ফিরিল। মাস খানেক চলিয়া গেল, ময়ূরা আর ফিরিল না, সকলে মনে করিল, সে আর ফিরিবেও না। কিন্তু একদিন সত্য সত্যই সে ফিরিয়া আসিল। ধাওরা শুদ্ধ একটা ছি ছি পড়িয়া গেল। পদীর স্বামী আসিয়া সেই যে পদীকে লইয়া গেল, আর আজ পর্যন্তও অন্ধ মা-টাকেও এক চোখ দেখিয়া যাইবার জন্য একবার আসিতে দিল না। ময়ূরাকে সকলে ধাওরা হইতে খেদাইয়া দেওয়াই এক প্রকার স্থির করিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র তাহার অন্ধ মা-টার দিকে তাকাইয়া তাহাতে নিবৃত্ত হইল। সেই অবধি তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ

করা দূরে থাকুক, তাহার সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করিতে পর্যন্ত সাঁওতালেরা ঘৃণা বোধ করিত।

শাকা হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুন্‌লে মাসি, তুমি যা আন্‌তে বলেছিলে, ছোটবাবু বল্লে, ও' বিষ; সায়েব জান্‌তে পেলে ধ'রে জেলে দেবে; কিছুতেই দিতে চাইলে না।

পদীর মা বলিল, তা' হলে তোমার ছেলে তুমি নাও বাপু, আমি অন্ধ মানুষ, আমি ও'কে সাম্‌লাতে পার্‌ব না।

শাকা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, আজ দিনটা কোন মতে রাখ, মাসি! কাল্‌কে হাজিরা পাবার দিন, যা হোক্ একটা কিছু ব্যবস্থা কাল থেকে কর্‌ব, আজকের দিনটা শুধু খাদ থেকে ঘুরে আসি।

ইহার উত্তরে পদীর মা কোন কথা বলিবার পূর্বেই খাদে ছয়টার ভোঁ বাজিয়া উঠিল। শাকা কোন মতে নিজের ঘরে আসিয়া কোণ হইতে গাঁইতিটা লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে চাণকের দিকে ছুটিয়া চলিল, পদীর মার কোন কথা শুনিবার তাহার আর অবসর হইল না।

পদীর মা অন্ধ হইয়া অবধি স্বভাবতঃই দশজনের সহিত মেলামেশা করিতে পারিতেছে না; তাহার উপর ময়ূরার উপর এই প্রকার কলঙ্ক রাষ্ট্র হওয়ার পর হইতে ধাওরার মধ্যে সে আর দশজনের সম্মুখে নিজেও যেমন বাহির হইতে পারিতেছে না, তেমনি দশজনও তাহাদের সংসর্গ হইতে দূরে দূরে সরিয়া ফিরিতেছে। সাঁওতালদিগের সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে তাহাদের যাতায়াত একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সাঁওতালের মন কখনই এই প্রকার একাকী নিঃসঙ্গভাবে যাপনে অভ্যস্ত নহে। সেইজন্য দশজনের মধ্যে থাকিয়াও অন্ধের পক্ষে এই নির্জনতার নির্বাসন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন অবস্থায় শাকার এই সাহায্য-প্রার্থনা তাহার কাছে নিতান্ত অগ্রাহ্য বলিয়াও বিবেচিত হইল না। সে মনে করিল, এই লোকটার নিঃসহায় অবস্থার ভিতর দিয়া সে পুনরায় সমাজে গিয়া উঠিতে পারে। ইহাই

বা বিচিত্র কি যে হয়ত কোনদিন এই মৃতদার শাকা ময়ূরাকে বিবাহও করিতে সম্মত হইতে পারে! তাহা হইলে মেয়েটারও ত একটা গতি হইয়া যায়!

ময়ূরা তাহার মাকে এই সম্পর্কে আর কোন কিছু না বলিয়া নিজের কাজে বাহির হইয়া গেল, তাহার মনেও যে এমনি একটা আশার উদয় না হইয়াছিল, তাহাই কে বলিতে পারে?

পদীর মা লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া ধাওরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের ধাওরার সম্মুখ দিয়াই খাদে যাইবার পথ। পদীর মা অনুমানে বুঝিল, দুই তিনটা সাঁওতাল মেয়ে খাদের দিকে যাইতেছে।

পদীর মা বলিল, এই যে তোরা কে যাস্ লা, হাসপাতালের দাইটাকে এক বাটি দুধ পঠিয়ে দিতে একটু ডেকে বলে যাস ত!

শুনিয়া মেয়েগুলি দাঁড়াইল। একটু বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। একজন রসিকতা করিয়া বলিয়া উঠিল, দুধ? দুধ কি হবে মাসি? নাতি নাৎনী হলো নাকি? বলিতেই সকলে এক সঙ্গে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পদীর মা এই বিদ্রূপের অর্থ বুঝিল। প্রথমটা একটু ঘা খাইয়াই যেন ইহার জবাব দিতে গিয়াও থামিয়া গেল। তারপর আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, শাকা তার ছেলেটাকে আমার কাছে ফেলে রেখে চলে গেছে, ঘুম ভাঙ্গতেই ও'টা কেঁদে উঠ্‌বে, আমি ও'কে কি ক'রে রাখি, বল দিকিন?

মেয়েগুলি পরস্পর কি বলাবলি করিতে করিতে চলিয়া গেল। কতক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালের দাই এক বাটি দুধ লইয়া আসিয়া পদীর মা'র ঘরে হাজির হইল, বলিল, ডাক্তারটা বড় কড়া লোক মাসি, তা নয়ত এমন মা-মরা দুধের ছেলেটাকে কি আর বা'র ক'রে দি? দাও এই দুধ টুকুন খাইয়ে দি'।

পদীর মা এতক্ষণে ঘরের ভিতরে তাহার কোণটিতে আসিয়া বসিয়াছিল, দাই'র সাড়া পাইয়া ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, ও'রই কি

রকম আক্কেল বল দিকিন্, আমি কাণা মানুষ, আমি কি দুধের ছেলেকে সাম্‌লাতে পারি? ও যে আমার কাছে ছেলেটাকে ফেলে রেখে গেল?

দাই মেয়েটি ভাল, অল্প বয়সে বিধবা হইয়া অবধি ডাক্তারের অনুগ্রহে হাসপাতালে এই চাক্‌রিটি পাইয়াছে। খাইয়া পরিয়া তাহার একার সংসার স্বচ্ছল ভাবে চলিয়া যায়। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও সে নিজের বাড়ী হইতে এই দুধটুকুন ছেলেটার জন্য লুকাইয়া লইয়া আসিয়াছে।

দাই বলিল, সেই বা কি কর্‌বে মাসি! খাদের কাজ, জান ত সব ব্যাপার! একদিন কাজে না গেলে পরের দিন শিয়াল কুকুরের মত রাস্তায় টেনে বার ক'রে দেবে।

কিন্তু শাকার উপর দাই'র এই সহানুভূতির ভাবটুকু পদীর মা'র ভাল লাগিল না। পদীর মা'র ইহাই এতক্ষণ ভাবিতে ভাল লাগিতেছিল যে, এই ধাওরায় শাকার সাহায্য-প্রার্থনা করিবার একমাত্র সে ব্যতীত আর কেহ নাই। অন্ধ হইয়াও সাহায্য করিলে সে-ই কবিবে, না করিলেও সে-ই না করিবে। এই বিষয়ে আর কেহ যে কোন কৌতূহল দেখাইবে, তাহা তাহার মোটেই মনঃপূত নহে। অথচ এই নিতান্ত পরোপকাবিণী মেয়েটিকেও সে গায়ে পড়িয়া আঘাত দিয়া কোন কথা বলিতে সাহস পাইতেছিল না।

দাই ছেলেটিকে লইয়া দুধ খাওয়াইল, তারপর অনেকক্ষণ ধবিয়া কোলের উপর শোয়াইয়া দুই হাঁটু দোলাইয়া ঘুম পাড়াইল, তারপর পদীর মা'র কাছে শোয়াইয়া রাখিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

কয়েক দিন পর সর্দার একদিন শাকাকে ডাকিয়া বলিল, দেখ, তুই আর একটা বিয়ে থা' কর, এই কাণটাকে যে তোর ছেলেটার পিছে খাটিয়ে মারছিস, ও' কাজটা ভাল দেখাচ্ছে না। তার চাইতে বরং তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল, তোর ছেলেটাও বেঁচে যা'বে, ময়ূরারও একটা গতি হবে।

শাকাও কয়েকদিন ধরিয়া যে ইহা না ভাবিতেছিল, তাহা নহে। আর ইহাতে যখন সর্দারেরও সম্পূর্ণ মত আছে বলিয়া জানিতে পারিল, তখন বিষয়টা সে একটু বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। এতখানি হয় ত তাহার ভাবিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, তবে একটা কথা এই যে, ময়ূরাকে শাকার খুব যে ভাল লাগে, তাহা নহে। ময়ূরা যেন একটু কি রকম স্বভাবের মেয়ে। এত বড় একটা কলঙ্ক মাথায় লইয়া ধাওরার দশজনের মধ্যে সে কেমন মাথা তুলিয়া আছে, অন্য কেহ হইলে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া থাকিত। তাহার এই সকল বিষয়ে যেন একেবারে ভ্রূক্ষেপও নাই। আর একটা কথা শাকা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, ময়ূরা কোনদিন তাহাকে এবং যাহার জন্য বিশেষ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে হইতেছে, সেই ছেলেটাকে ভাল বাসিবে!

শাকাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সর্দার বলিল, তা'হলে তোকে একটা কথা বলি, শোন! তোর যখন এত ভাবনা, তখন তুই আর ওদের ঘর মাড়াস্‌নে। মেয়েটার এমনি ত একটা কলঙ্ক মাথার উপর রয়েই গেছে, তার উপর তোর এখন ওদের ঘরে এত যাতায়াত ভাল দেখায় না। ছেলে পুষতে না পারিস্‌, পাদ্রীদের দিয়ে দে, সাঁওতালের ছেলে বলে ওরা ঘেন্না করবে না, মাথায় তুলে নিয়ে নেবে।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। বিপত্নীক জীবনে একমাত্র পুনর্বার বিবাহ করিলেই যে তাহার পারিবারিক জীবনের সামান্য অব্যবস্থাটুকু দূর হইতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে কিই বা বলিবার থাকিতে পারে? আর যদি সে বিবাহ করিতে সম্মত না-ই হয়, তবে একটা অনূঢ়া বয়স্থা মেয়ের পরিবারের সঙ্গে সে কি অধিকারেই বা এত ঘনিষ্ঠতার দাবী করিতে পারে?

কিন্তু তবু শাকা সেই দিন সর্দারের কোন কথারই স্পষ্ট কোন জবাব দিতে পারিল না।

শাকা সেদিন নিজের ঘরে ফিরিয়া কেবলই এই কথাটা ভাবিতে লাগিল। পাশেই খাটিয়ার উপর ছেলেটা ঘুমাইতেছে, রাত্রিও অনেক

হইতে চলিল, এখন যেমন করিয়াই হউক চারিটা ভাত সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। উহার কতক আজ রাত্রেই খাইবে, আর কতক কাল সকালে কাজে যাইবার আগে খাইয়া যাইবার জন্য হাঁড়ির মধ্যেই জল ঢালিয়া রাখিবে।

রান্না করিয়া খাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। ধাওয়ার কুলিদিগের মধ্যে তখনও অনেকেই জাগিয়া আছে। শাকা ধীরে ধীরে পদীর মার ঘরের সম্মুখে আসিল; তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, মাসি, ঘুমিয়েছ? পাশেই দেখিতে পাইল, একটা খাটিয়ার উপর ময়ূরা ঘুমাইতেছে।

পদীর মা জাগিয়াই ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, কিরে শাকা, এত রাত্তিরে যে, তোর ছেলে ঘুমুল?

শাকা বলিল, তোমার নিকট একটা কথা বলতে এসেছি, মাসি! আমি মনে করেছি, আমি ময়ূরাকে বিয়ে করব।

পদীর মা আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল, আমি আশীর্বাদ করি, তোরা সুখী হ'। বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটী কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিল।

বিবাহে একটু বেশ ধুমধামও হইল। অনেকদিন পরে এই উপলক্ষে পদীও তাহার স্বামীকে লইয়া আসিল, আশে পাশের ধাওবার সর্দারেরাও কয়েকজন যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করিল। এইভাবে পদীর মা ও ময়ূরা গিয়া আবার সমাজে উঠিল।

বিবাহের আগে শাকার একটা বড় ভয় ছিল যে, হয়ত ময়ূরা তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে পারিবে না। শাকার পক্ষে এমন ভাবিবার কতকগুলি কারণও ছিল;—প্রায় সমবয়সী ছেলে ও মেয়ের মধ্যেই সাঁওতালদিগের বিবাহ হয়, কিন্তু ময়ূরার তুলনায়ও শাকার বয়স একটু বেশীই বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার উপর, কি ঘরে কি বাইরে, শাকা একজনের সাহায্য না পাইলে একেবারে অচল হইয়া পড়ে। এই ত সকাল বেলায় চারিটা পান্তা ভাত কোন মতে মুখে গুঁজিয়া গাঁইতিটা

কাঁধে করিয়া সে খাদে গিয়া নামে, তারপর সেখানে গিয়া দুই কোপ কয়লা কাটিতেই যেন তাহার প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হয়, সেখানেও যদি কেহ তাহাকে কয়লার চাপগুলি কোদালিতে করিয়া গাড়ীতে বোঝাই করিয়া দিতে সাহায্য করে, তবেই সে সারাদিনে একটা গাড়ী কয়লা বোঝাই দিয়া ধাওরায় ফিরিতে পারে। শাকা জানে, এমন অকর্মণ্য পুরুষকে সাঁওতাল মেয়েরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। সাঁওতাল পুরুষগুলি প্রায়ই এমনই অকর্মণ্যই হয়, তবু শাকা যেন তাহাদের মধ্যেও এক ধাপ নীচে। ময়ূরার পক্ষে শাকাকে ভালবাসিবার পথে আর একটা বড় বাধা—তাহার নিজের এই শিশু ছেলেটা। অবশ্য বিবাহের পর হইতে এ পর্যন্ত এখনও ময়ূরা ছেলেটার প্রতি কোন অনাদর প্রকাশ করে নাই, তবু শাকার যেন মনে হয়, ময়ূরাকে তাহার ছেলেটার পাছে খাটাইয়া যেন সে নিজে কি অপরাধই না করিতেছে। ময়ূরা ছেলেটাকে কোন সময় কোলে লইয়া আদর করিতে গেলে, শাকা তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে নিজের কোলে কাড়িয়া নেয়; বলে, দে উটাকে আমার কাছে, আমার এখন আর কোন কাজ কর্ম নেই। ইহাতেও আবার ময়ূরা মাঝে মাঝে রাগ করে, মুখ নাড়া দিয়ে বলে, ইঃ দেখ না, ওর ছেলে যেন আমি গিলে খেঁয়েচি, একটু কোলে করেছি কি চিলের মত চোঁ মেরে এ'সে নিজের কাছে টেনে নেওয়া হচ্ছে। এত যদি অবিশ্বাস, ত' আমাকে বিয়ে করেছিলি কেনে?

শুনিয়া শাকা অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে, ইহার জবাব দিতে গিয়া কি বলিতে যে কি বলে, তাহার নিজেই কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় না।

সে'দিন কি একটা পর্ব উপলক্ষে খাদের কুলিদিগের ছুটি ছিল। শাকা ময়ূরাকে বলিল, চ' পদীর ও'খান থেকে বেড়িয়ে আসি, যাবি?

পদীর মা শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিল, যা, না, সে'বারে এত ক'রে ব'লে গেল, যা' একবার গিয়ে ঘুরে আয়, কত খুসী হ'বে।

প্রস্তাবটা ময়ূরার মনঃপূত হইল। তবুও একটু ইতস্তত করিয়া

কহিল, ই দিক দিয়ে তোর ছেলে সাম্‌লাবে কে? সেটা ভেবে দেখিছিস্‌?

পদীর মা বাধা দিয়া কহিল, আহা হা, একদিনের ত ব্যাপার, আজ রাতেই ত তোদের ফিরতে হ'বে, এই সময়টুকু ত আমিই ও'কে আগলে বসতে পারব।

শাকা একটু আহত হইল। একদিন কেন, তাহার চাইতে বেশী সময়ের জন্যও ছেলেটার ভার পদীর মা'র উপর দিয়া ইতিপূর্বেও বহুবার নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে, সেইজন্য আজ সেই ছেলে সম্বন্ধেই ময়ূরার এই দুশ্চিন্তা শাকার কাছে অভিনব বলিয়া বোধ হইল। শাকা মনে করিল, ময়ূরা হয় ত মনে করে, এই সামান্য মা-মরা শিশুটা তাহাদের কর্মক্লান্ত জীবনের মধ্যে মুহূর্ত মাত্র অবসর সম্ভোগেরও এক দুরপনেয় বাধা। আর এই অপরাধও প্রকৃতপক্ষে এই শিশুর নহে, শাকা বুঝিল, এই অপরাধ তাহার নিজেরই।

শাকা একটুকু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, চল না, ও'তে আর কি হ'বে, দাইটাকে ব'লে দিয়ে যা'ব, দুকুর বেলা এ'সে এক বাটি দুধ গিলিয়ে রেখে যা'বে।

ময়ূরা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, দাই কি তোর ঘরের বাঁদী যে, সে তা'র নিজের কাজ ফেলে এসে তোর ছেলেকে দুধ খাইয়ে যাবে?

হতভাগা শাকা! কি বলিতে গিয়া কি বলিয়া ফেলে! সে কি কখনও ঘুণাক্ষরেও জানে যে, হাসপাতালের দাইটা যে তাহার সঙ্গে কখনও কালে ভদ্রে পথে ঘাটে দেখা হইলে হাসিয়া কথা বলে, ইহা ময়ূরা সহ্য করিতে পারে না?

দাই'এর নাম করিয়া এমন কি অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা কিছুতেই বুঝিতে না পারিয়া শাকা কেবল ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া ময়ূরার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

পদীর মা বলিল, এক বাটি দুধ এখানে রেখে গেলে আমিই কি ও'কে তা' খাওয়াতে পারব না? শুনিয়া এইবার ময়ূরা হাসিয়া উঠিল, বলিল,

ও'কথা আর বলিস্ নি'—সেই সে দিনের কথা মনে নেই ? কিরে শাকা ? সেই যে সেদিন আমরা যাত্রা দেখতে গিইছিলাম, ব'লে গিইছিলাম, আমাদের বেশী রাত হয়ে গেলে, ছেলেটাকে এই দুধটুকুন পারিস ত খাওয়াস, তারপর··· বলিয়া ময়ূরা হাসিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। শাকাও অবশেষে এই হাসিতে যোগ দিল, ঘরের কোণে একখানি ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া পদীর মাও নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

ব্যাপারটা হইয়াছিল বড় রগড়ের। সে'দিন চুরুলিয়া গাঁয়ে কলিকাতা হইতে এক যাত্রার দল আসিয়াছিল। কাজ হইতে ফিরিয়া শাকা ময়ূরাকে লইয়া যাত্রা দেখিতে গিয়াছিল, যাইবার কালে তাহারা পদীর মাকে বলিয়া গেল, আমাদের ফির্তে যদি দেরি দেখ, তা হ'লে ছেলেটাকে দুধ ফোঁটা পাব ত খাইয়ে দিও। ফিরিতে তাহারা বাস্তবিক দেরি করে নাই। যাত্রায় আগে হইতেই ভয়ানক ভীড় হইয়াছিল, তাহারা গিয়া ভীড়ের মধ্যে এতটুকু দাঁড়াইবাব জায়গাও করিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া তাহাদের ফিরিতে হইল। ফিরিয়া দেখে, সে এক কাণ্ড! পদীর মা ছেলেটাকে কোলে লইয়া বসিয়া একটা বাটি হইতে ঝিনুক দিযা দুধ তুলিয়া মুখ মনে করিয়া তাহার নাকের ফুটার ভিতর ঢালিতেছে। দুধ নাকের ফুটার ভিতরেও প্রবেশ করিতেছে না, দুই গাল বাহিয়া সমস্তই মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। হয় ত তাহারা ঠিক সময়ে ফিরিয়া না আসিলে ছেলেটা দম বন্ধ হইয়া মরিয়াই যাইত। শাকা ছুটিয়া গিয়া ছেলেটাকে পদীর মা'র কোল হইতে নিজের কোলে লইল, তারপর কাঁধের গামছাখানি দিয়া তাহার মুখখানি মুছাইয়া দিল, নিজের হাতে আবার দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইল। সে মনে করিল, আজ ছেলের একটা মহা ফাঁড়া কাটিয়াছে। কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বুকটা সে রাত্রে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর হইতে পদীব মা'র কাছে ছেলেটাকে ফেলিয়া রাখিয়া খাদের কাজে বাহিরে যাইতেও তাহার কেমন একটা ভয় ভয় করিত।

কিন্তু সে' অনেক দিনের কথা। শাকা তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল, আজ এতদিন পরে ময়ূরার ঐ প্রসঙ্গের উল্লেখে ঘটনাটি একটুকু স্মরণ হইল মাত্র!

ময়ূরার হাসি দেখিয়া শাকার মনটা একটু প্রসন্ন হইল। ভাবিল, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। ময়ূরা রাগিলেই শাকার যত ভয়, ময়ূরার মন যখন খুসিতে ভরিয়া থাকে, শাকাও তখন পৃথিবীখানিকে স্বর্গ মনে করে!

শাকা বলিল, চল, চল, আর দেরি নয়, অনেক পথ আবার হাঁটতে হবে। রোদ্দুর না উঠ্‌তেই চ' বেড়িয়ে পড়ি।

ময়ূরা উঠিয়া সাজিতে বসিয়া গেল। একখানি চওড়া কালাপেড়ে আন্‌কোরা শাড়ী পরিল, কাজল করিয়া চোখে মাখিল, খোঁপায় মস্ত বড় একটা গেঁদা ফুল গুঁজিয়া দিল। শাকাও বহুদিন পর সযত্নে তাহার বাব্‌রি আঁচ্‌ড়াইল, একখানি লাল গামছা মাথায় বাঁধিল, ঘরের কোণ হইতে আড় বাঁশীখানি খুঁজিয়া বাহির করিল।

তাহারা বাহির হইবার কালে পদীর মা জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটার তা'হলে একটা কিছু······

শাকা কথাটা অগ্রাহ্যের ভাবে শুনিয়া লইয়া বলিল, যা হোক্ একটা কিছু তুমিই করো, মাসি! আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। বলিয়া তাহারা দুইজনই বাহির হইয়া পড়িল।

পদী বলিল, কি রে শাকা, তুই ত আর কচি ছেলেটি নস্, ময়ূরা না হয় নোতুন! তুই ত বুঝ্‌তে পারিস্ সব। ও'কে এখন থেকে আর খাদে নামতে দিস্ কেনে? ডাক্তারের কাছে একদিন নিয়ে যা', ডাক্তার লিখে দিলেই ঘরে ব'সেই এ' ক'মাস ও' হাজিরা পাবে।

ইঙ্গিতটা কেবল যে শাকাই বুঝিল, তাহা নহে, ময়ূরাও স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। এক অনাস্বাদিতপূর্ব মাতৃত্বের সম্ভাবনায় তাহার মনে যেন কি এক অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল। দিদির কাছে

এই মনোভাব গোপন করিবার উদ্দেশ্যে সে অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

পদা বলিল, মা'কেই বা আর দোষ দিই কি করে? চোখে দেখ্‌তে পেলে দু' মাস আগেই সে নিজেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত।

বাস্তবিকই শাকা এই বিষয়ে আগে কিছু সন্দেহমাত্রও করিতে পারে নাই, পদীর এই কথায় এখন সে নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া নিজেকে এই অজ্ঞতার জন্য অপরাধী বিবেচনা করিতে লাগিল।

বিষয়টা একটু ভাবিয়া লইয়া শাকা বলিল, উ আর কি হয়েছে, আমি আজকে রেতেই ফিরে উকে ডাক্তারের কাছে লিয়ে যাব। ডাক্তারটা বড্ড ভাল লোক রে, আমাকে খুব খাতির করে।··· এ'জন্যে তুই ভাবিস্‌নি'। আমি আর উকে কুটোটি এখান থেকে উখানে লিতে দিচ্ছিনে।

পদী বাধা দিয়া বলিল, নে নে সোহাগ রাখ, আগের বৌটার উপরও ত তোর দরদ কম ছিল না, শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায়ও তোর জন্যে খেটে খেটেই ত ও গেল।

শাকা যেন সহসা পিঠে একটা চাবুকের ঘা খাইল। তাহার সেই বৌটা! বাস্তবিকই ত সে তাহার জন্য খাটিয়া খাটিয়াই মরিয়াছে! শাকা বারণ করিলেও সে শুনিত না। তাহার জন্য পাঁচ তরকারি রান্না করিত, তাহার ময়লা কাপড় ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া আছড়াইত; এমন কি, যেদিন তাহার ছেলেটা মাটিতে পড়িল, সেদিনও সকাল বেলা তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া খাদের কাজে পাঠাইয়া তবে সে শয্যা লইয়াছে। ধাওরার কুলিরা বলে, শাকার অযত্নেই তাহার বউটা মরিয়াছে! কথাগুলি মনে হইতেই শাকার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কোনভাবে আত্মগোপন করিয়া বলিল, না রে পদী, একবারের ভুল কি আর বারবার হয়। ও থেকেই ত শিখেছি, এ' অবস্থায় বউয়ের কেমন যত্ন নিতে হয়!

পদী বলিল, নে নে, সে জন্যই ত আজ পাঁচ মাসেও এ'কে নিয়ে খাদে

টানাটানি কচ্ছিস। ডাক্তার জান্‌লে তোকে জরিমানা না করে, ত' কি বলেছি।

শাকা শঙ্কিত হইয়া উঠিল, জরিমানা দিবার ভয়ে নহে, হয় ত তাহার অজ্ঞতার জন্য ময়ূরার ইতিমধ্যেই কোন অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহাই ভাবিয়া; সে নিজের অপরাধের আর যেন কূল দেখিতে পাইল না।

একটু বিচলিত ভাবে শাকা পদীকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যারে, পদী, তুই ত সব বুঝিস, বল দিকিন, ময়ূরার ত কোন অনিষ্ট হয়নি?

পদী এইবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, বুড়ো ত হতে চললি, কি ছেলেমান্‌ষামি করিস্! অনিষ্ট কি ইষ্ট, আমি এখন কি ক'রে বুঝব, বল দিকিন!

সেই দিনই অনেক রাত্রি করিয়া তাহারা নিজেদের ধাওরায় ফিরিল। পদীর মা তখনও তাহার ছেঁড়া মাতুরটির উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে, তাহার সাম্‌নেই শাকার ছেলেটা গরমের জন্য ঘুমাইতে না পারিয়া কেবল এ'পাশ ও'পাশ করিতেছে।

তাহাদের পায়ের সাড়া পাইয়া পদীর মা বলিয়া উঠিল, কি রে, এ'লি? কি তোদের আক্কেল, বল দিকিন? একটা কাণা মানুষের কাছে এই দুধের ছেলেটাকে ফেলে রেখে সারা দিনের নামে বেরিয়ে গেলি, আমি এ'কে কি ক'রে সামলাই, একবার ভেবেও দেখলি নে? সারাটা দিন কিছু ও'র মুখে দিতে পারি নি'। ধাওরা শুদ্ধ লোকগুলো আজ কোথায় বেরিয়ে গেছে, একটাকে দিয়ে যে দাইটাকে খবর পাঠাব, তার পর্যন্ত উপায় নেই। সারা দিন আমার এই শুক্‌নো মাইটা চুষে চুষে এটা বাঁচে কি করে? বলিয়া পদীর মা যেন একেবারে হাঁপাইতে লাগিল।

শাকা কিংবা ময়ূরা তাহার এতগুলি কথার জবাবেও কিছু বলিল না দেখিয়া পদীর মা এইবার বাস্তবিকই ক্রুদ্ধ হইল, বলিল, যা' এক্ষুণি যা ত শাকা, হাসপাতালে দুধ থাকে, দাইটাকে ব'লে এক কৌটা নিয়ে আয়, নইলে আজ রাতেই ছেলেটা মরবে।

শাকা বলিল, চল ময়ূরা, তুইও চল, ডাক্তারকে দেখিয়ে তোর খাদের ছুটি লিখিয়ে আনব।

পদীর মা শাকার কথায় কান দিল না, সাম্‌নের দিকে হাতড়াইয়া ছেলেটা কোথায় অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, ঠাহর করিতে লাগিল।

পরদিন সকালেই দাইএর মুখ হইতে পদীর মা সকল কথা শুনিল। দাই বলিল, কাজটা ভাল হয়নি', মাসি! আরও দু'মাস আগেই ও'কে ছুটি নিতে হ'ত, ডাক্তার খুব রাগ কচ্ছিল। জান ত, খাদের নীচেকার কাজ!

পদীর মা শঙ্কিত হইয়া বলিল, আমি কি করব, মা; নিজে যদি নিজের ব্যথা না বুঝে, আমি ত কাণা মানুষ!

সেইদিন হইতেই ময়ূরার খাদে যাওয়া বারণ হইল। শাকা এইবার রীতিমত একজন কর্ম্মঠ লোক হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। খাদে যাইবার আগে সে নিজেই সকলের রান্নাবান্না করিয়া রাখিয়া যায়; ময়ূরা তাহার কাছে বসিয়া সমস্তই দেখাইয়া দেয়, তাহার অপটু হস্তের ছোট খাট ভুলত্রুটির জন্য মাঝে মাঝে ময়ূরার নিকট হইতে প্রাপ্ত কৌতুক-তিরস্কারগুলি তাহার উপরি পাওনার মধ্যেই সে গণ্য করে।

একদিন খাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শাকা দেখিল, ময়ূরা তাহার ছেলেটাকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

শাকা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, আরে, উটাকে তুই আবার লিতে গিইচিস্ কেনে? ফেলে রাখনা, ও'খানে!

পদীর মা'র সঙ্গে একটু আগেই ময়ূরার এই ব্যাপার লইয়াই একটু কথা কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। এখন শাকার গলা শুনিতে পাইয়াই পদীর মা বলিয়া উঠিল, ইস্, কি সোহাগ আমার, ফেলে রাখ না ও'খানে; যেন ক'টা দাসী বাঁদী আছে, ফেলে রাখতেই ছুটে এ'সে ধরবে। এই দাসী কথাটি দিয়া সে নিজেকে এমন স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিল যে, তাহা বুঝিতে শাকা কিংবা ময়ূরা কাহারও বাকি রহিল না।

শাকা খাদ হইতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিল, সে তাহার এই কথার উপর পদীর মা'র নিকট হইতে এমন একটা জবাব কখনও আশা করিতে পারে নাই। সে নম্র সুরে বলিল, সে কথা হচ্ছে না, মাসি! আমি বলছি কি, ছেলেটা না হয় মাটিতে পড়েই একটু গড়াল, কিন্তু তাই ব'লে ময়ূরাকে ত আর এই অবস্থায় নিজের ছেলে বওয়াতে পারিনে!

পদীর মা মুখ ভেংচাইয়া বলিল, আহা হা, তা হলে তোমার ছেলে বইবে কে? আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি, তোমার ছেলেকে আর ব'য়ে মর্‌তে পারব না! ভগবান্ দিক্, আমার নিজের মেয়ের ছেলের তা হলে অনাদর হবে!

ময়ূরা অগত্যা ছেলেটাকে লইয়া মাটিতে শোয়াইয়া রাখিল।

শাকা সেই রাত্রে শুইয়া শুইয়া ভাবিয়া স্থির করিল, ইহাকে লইয়া গিয়া পাদ্রীদেরে দিয়া আসিবে। ইহা সে নিশ্চিত বুঝিতে পারে যে, এখন হইতেই যে নমুনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ময়ূরার সন্তান হইলে ইহার অযত্নের একশেষ হইবে! ময়ূরা নিজের সন্তান লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, পদীর মারও যে মনোভাব আজ ব্যক্ত হইল, ইহাতেও সে যে কোনদিন আর তাহার এই ছেলেকে আপনার করিয়া দেখিতে পারিবে, তাহাও শাকার কাছে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইল। শাকা ঘুমন্ত ছেলেটার দিকে একবার তাকাইল। যেদিন সে প্রথম ইহাকে হাসপাতাল হইতে তাহার শূন্য ঘরখানিতে লইয়া আসিয়াছিল, সেই দিনের কথা তাহার মনে হইল, সেইদিন ইহার চেহারা দেখিয়া ধাওরার সকলে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল, আর আজ প্রায় এই এক বৎসরের অযত্নে ইহার শরীরের কি হাল হইয়াছে! হাত পা গুলি কেমন সরু সরু কাঠির মতন, পেট্‌টি টিলটিল করিতেছে, তাহার উপর কয়েকটা নীল শিরা,—মৃত্যুর শীর্ণ অঙ্গুলীর ছাপ বলিয়া ভ্রম হয়,—মাথার চুল কয়টা পোড়া তামার মত কটা হইয়া গিয়াছে, এই বয়সে আজিও একটিও দাঁত পর্যন্ত দেখা দেয় নাই; অনাহারে অযত্নে

পড়িয়া এমনই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, একটু চেঁচাইয়া কাঁদিতেও ইহার কষ্ট হয়। ইহার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে শাকার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার নিষ্ঠুর সঙ্কল্প কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন কাজ হইতে ফিরিয়া শাকা দেখিল, তাহার ছেলেটা মাটির উপর যে জায়গায় প্রত্যহ পড়িয়া থাকে, সেই জায়গায়ই চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। শাকা ঘরে ঢুকিয়া কাঁধ হইতে গাঁইতিটা নামাইয়া রাখিয়া ইহার কাছে যাইতেই ছেলেটা ঠোঁট ভাঙ্গিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া কান্নার সুরটুকুও বাহির হইল না। শাকা দুই হাতে ছেলেটাকে তুলিয়া লইয়া ডাকিল, ময়ূরা! ময়ূরা পাশের বারান্দায় মাটির উপর শুইয়া ছিল, সেখান হইতেই সাড়া দিল, কি, হয়েছে কি তোর? ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস্ কেনে?

শাকা ছেলেটাকে কোলে লইয়া তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটাকে খাইয়েছিলি? এটা আজ এমন কচ্ছে কেন?

ময়ূরা মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, এত কথা জানিনে বাপু, নিজের শরীর নিয়েই অস্থির, কার ছেলে কখন খে'ল, কি খে'ল না, ব'সে ব'সে অত তত্ত্ব নিতে পারব না!

শাকা ময়ূরার এই ব্যবহারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল! বুঝিতে পারিল, আজ মায়েতে মেয়েতে মিলিয়া এই অসহায় শিশুটার বিরুদ্ধে একটা কিছু ষড়যন্ত্র হইয়া গিয়াছে!

শাকা সে রাত্রে নিজেই দাইএর কাছ হইতে একটুকু দুধ চাহিয়া আনিয়া ছেলেটাকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিল।

পরদিন খাদে যাইবার আগে শাকা নিয়মিত ভাবে ঘরের কাজ কয়টি করিয়া রাখিতেছে, এমন সময় ময়ূরা জাগিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ শাকা, আমি রাত্তিরে স্বপ্নে দেখ্‌ছিলাম কি, আমার খুব একটা অমঙ্গল হ'বে।

শাকা অধীর হইয়া গিয়া বলিল, অমন কথা কেন বলিস্, ময়ূরা?

ময়ূরা বলিল, তা আর হবে না ? তুই আমাকে দেখতে পারিস্‌নে, আমার যে ছেলে হবে, তার জন্যেও তোর কোন মায়া মমতা হবে না। তুই তোর এই ছেলেকে নিয়েই সব ভুলে রয়েছিস !

শাকা অত্যন্ত সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে আমাকে তুই কি কর্‌তে বলিস্‌, ময়ূরা ? ছেলেটাকে তা হলে পাদ্রীদেরে দিয়ে দি ? বলিয়া উৎসুক ভাবে ময়ূরার দিকে তাকাইল।

ময়ূরাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে তাই দিয়ে দি', কি বলিস্‌ ?

ময়ূরা পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, তোর ছেলে, তোর যা ইচ্ছে, কর, কিন্তু আমি ব'লে রাখ্‌ছি, আমার ছেলে যেন তোর কাছে অযত্ন না পায় !

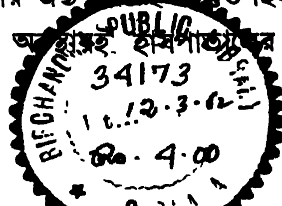
শাকা ময়ূরার মনখানি দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিতে পাইল। সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করিয়া বলিল, আচ্ছা, তুই যা বলিস্‌ তাই কর্‌ব !

কথাটাতে ময়ূরা মনে মনে স্বস্তি বোধ করিলেও বাহিরে রাগ প্রকাশ করিল, কহিল, আমি কি বল্‌ব রে, তোরও ত একটা আক্কেল আছে ! আমি ত দু'দিন বাদেই আট্‌কা পড়্‌ব, ঘরে একটা কাণা বুড়ী, তুই থাক্‌বি খাদে, তোর ছেলেকে কে সামলায় ?

ভাবিয়া দেখিতে গেলে কথাটা একেবারে মিথ্যা নয় ; কিন্তু শাকা কোনদিনই সংসারে এত ভাবিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। সে বলিল, আচ্ছা আজ খাদ থেকে ঘুরে আসি, তারপর একটা ব্যবস্থা যা হোক কর্‌ব।

কিন্তু শাকার এই সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবার আগেই সে খাদ হইতে ফিরিয়া শুনিল, দুপুর বেলাই ময়ূরাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে এবং সেখানে সে ইতিমধ্যেই এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে।

শাকা আজই এই সংবাদ পাইবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। শুনিয়া সে খাদের সেই কালিঝুল মাখা অবস্থায়ই হাসপাতালের দিকে



দৌড়াইল। ডাক্তারকে দাইকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিয়া আসিল, ময়ূরার যেন কোন অযত্ন না হয়। একবার ইচ্ছা হইল, ময়ূরাকেও একচোখ দেখিয়া যায়, কিন্তু ডাক্তার তাহাকে সূতিকাগৃহে এখন প্রবেশ করিতে বারণ করিলেন, শাকা ধাওরায় ফিরিয়া আসিল।

পদীর মা শাকার সাড়া পাইয়া একেবারে গর্জাইয়া উঠিয়া বলিল, এক শ' দিন বলেছি, ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে আয় পাদ্রীদের ওখানে, আহা হা, সোহাগে আর বাঁচিনে, ছেলে পুষ্‌বার মুরোদ নেই, তবু সখ দেখ না! এখন কোন দিক সাম্‌লাবি, বল্? ময়ূরা ছেলে নিয়ে ঘরে এলে, আমি কিন্তু এটাকে বাইরে টেনে ফেলে দেব, বলে রাখচি!

শাকা বলিল, তুমি রাগ করো না মাসি, ময়ূরা ছেলে নিয়ে ঘরে আস্‌বার আগেই আমি ওকে রেখে আস্‌ব। পাদ্রীদেরে আমি বলে রেখেছি।

পদীর মা মুখখানি হাঁড়ির মত করিয়া কহিল, যা খুসি তোমার কর বাপু, আমি কিন্তু জানিনে, পরে আমাকে দোষ দিও না যে, আমিই তোমার ছেলেকে তাড়িয়েছি।

ছেলেটা ঘরের সেই নিয়মিত কোণটিতে পড়িয়াছিল, ক্ষুধায় হাতের একটা মাংসলেশহীন শুষ্ক আঙ্গুল মুখের মধ্যে পূরিয়া দিয়া পরম তৃপ্তিতে চক্ষু মুদিয়া চুষিতেছিল।

শাকা তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই ছেলেটা কোটরগত চক্ষু দুইটি মেলিয়া তাকাইল, শাকাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহার জীর্ণ অস্থিসার হাত দুইখানি মেলিয়া তাহার কোলে উঠিতে চাহিল! শাকা কতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ছেলেটাকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া দাইয়ের ঘরের দিকে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় খাদ হইতে ফিরিয়া শাকা ময়ূরাকে দেখিতে গেল। ডাক্তার সেদিন আর বারণ করিল না, সে ধীরে ধীরে ময়ূরার শিয়রের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, ময়ূরা, ঘুমুচ্চিস?

ময়ূরা শাকার স্বর চিনিতে পাইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। সদ্য মাতৃত্বের গৌরবে তাহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শাকার চোখে চোখ পড়িতেই ময়ূরা হাসিয়া বলিল, দেখবি, ছেলেটাকে, কি চমৎকার হয়েছেরে দেখতে। এই দেখ—বলিয়া তাহার পার্শ্বস্থ শিশুটির উপর হইতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বস্ত্রাবরণখানি অপসারণ করিয়া শাকার সম্মুখে ধরিল।

দেখিবা মাত্র শাকা ময়ূরার অলক্ষ্যে কি ভাবিয়া একবার শিহরিয়া উঠিল; হয়ত ভাবিল, তাহার আগের বৌয়ের ছেলেটাও দেখিতে অবিকল এই রকমই হইয়াছিল। আজ তাহাকে দেখিলে কেহ তাহা অনুমানও করিতে পারিবে না।

শাকা বলিল, বেশ, বেশ, সাবধান সতর্কে থাকিস্, ডাক্তার যা' বলে শুনিস্। এই ত ক'দিন, তারপর দিন দশেক বাদে এসে তোকে ঘরকে লিয়ে যাব!

শাকা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এতদিন ময়ূরার নিজের সন্তান ছিল না বলিয়াই তবু কোনমতে তাহার মাতৃহারা শিশুটাকে নিজের কাছে রক্ষা করিতে পারিয়াছে; কিন্তু আজ আর সে সম্ভাবনা নাই; ময়ূরা তাহার নিজের সন্তানের পিতৃস্নেহে অন্য কাহাকেও অংশীদার হইতে দিবে না, তাহার নিজের সন্তানকে স্নেহ-মমতা, সুখভোগের একচ্ছত্র অধিকারী করিয়া তাহাদের পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিবে; ময়ূরার মাতৃ-হৃদয়ের এই স্বভাব-দুর্নিবার স্বার্থপরতা হইতে শাকা তাহার মাতৃহীন শিশুকে রক্ষা করিবে কি উপায়ে? ধাওরায় ফিরিবার পথে এই কথাটাই সে বার বার চিন্তা করিতে লাগিল।

পাঁচ ছয় দিন পর একদিন শাকা কাজ হইতে ফিরিয়া এক দুঃসংবাদ শুনিল। ময়ূরার নবজাত শিশুটির গলায় কি এক ঘা হইয়াছিল, গত রাত্রি হইতে তাহার অবস্থা খারাপের দিকে চলিয়াছে।

শাকা উন্মাদের মত হইয়া গিয়া হাসপাতালের দিকে ছুটিল।

ঘরের বারান্দায় দাইকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে, ছেলেটা কেমন আছে? বাঁচবে ত?

দাই চোখমুখের এক নৈরাশ্যজনক ভঙ্গি করিয়া কি যে বুঝাইতে চাহিল, তাহা অনুমান করিতেও শাকার বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে জানে, ভগবান না করুন, এই ছেলের যদি কোন অমঙ্গল হয়, তবে জন্মের মত তাহার ময়ূরাকেও হারাইতে হইবে।

সে অত্যন্ত শঙ্কিত ভাবে ময়ূরার ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া ভিতরের দিকে চাহিল। দেখিল, ময়ূরা ছেলেটার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহাকে স্তন্যপান করাইতেছে। ছেলেটা স্তন্যপান করিতে পারিতেছে না, দুই গাল গড়াইয়া দুগ্ধধারা মাটিতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

শাকা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই ময়ূরা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ, ছেলের আমার কি হলো! দু'দিন ধ'রে কিছুই গেলাতে পাচ্ছিনে। তোলা দুধ গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়্‌ছে, বুকের দুধ টানতে পাচ্ছে না। তুই যা! ডাক্তারকে আবার নিয়ে আয়, একটা কিছু করুক।

শাকা ইহার কি জবাব দিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না—একবার ছেলেটার দিকে, একবার ময়ূরার দিকে তাকাইয়া হতাশ ভাবে বলিল, আচ্ছা, তা হ'লে ডাক্তারকে একবার খুঁজে দেখি।

অনেক রাত্রে শাকা হাসপাতাল হইতে ধাওড়ায় ফিরিল, এতক্ষণ এই সোরগোলে তাহার নিজের ছেলেটার কথা মনেই ছিল না। ঘরে ফিরিয়া শাকা দেখিল, তাহার ছেলেটা হাতের একটা আঙ্গুল চুষিতে চুষিতে সারাদিনের অনাহারে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই মাতৃহীন ছেলেটাকে এতকাল এইভাবে অভুক্ত রাখিয়াছে বলিয়াই বুঝি আজ আর একটা ছেলে মাতৃস্তন্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও অনাহারে মরিতেছে।

শাকার সাড়া পাইয়া পদীর মা একেবারে কাঁদিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে, কেমন দেখে এলি ?

শাকা বলিল, না মাসি, তুই ভাবিস্‌নে। ডাক্তার বল্লে, ছেলেপিলের ও'রকম হ'য়েই থাকে। তবে একেবারে কিছু খেতে পাচ্ছে না, এ'জন্যে বড্ড কাহিল হ'য়ে গেছে।

পদীর মা বলিল, আমার একটা কথা রাখবি, শাকা? তুই তোর এ ছেলেটাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেল ; জানিস্‌ ত, লোকে বলে, সতীনের ছেলের বাতাসে নিজের ছেলে দুদিনে আধখানা হয়ে যায়।

শাকা পদীর মার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া বলিল, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, মাসি, কালই আমি ওকে পাদ্রীদের কাছে নিয়ে যাব ; এজন্যে আর তোমাদের কিছু বল্‌তে হবে না।

এই অসহায় শিশুটি এক কোণে মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া তাহার নবজাত দৌহিত্রের বিরুদ্ধে যে কি ঘোরতর অমঙ্গলের ষড়যন্ত্রই করিতেছে, তাহা শাকা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না সত্য, কিন্তু ইহা তাহার বুঝিতে ব্যকি রহিল না যে, ইহাকে আর তিলার্ধ কালও তাহার সঙ্গে রাখা সঙ্গত হইবে না।

সেই রাত্রেই ময়ূরার ছেলেটা মরিয়া গেল। যখন রোরুদ্যমানা ময়ূরাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া দাই তাহার ধাওরাতে আসিল, তখনও কিছু রাত্রি রহিয়াছে।

সদ্য সন্তানহারা শোকবিহ্বলা ময়ূরা আসিয়া ঘরের মেঝের উপর অজ্ঞান হইয়া লুটাইয়া পড়িল। শাকা ও পদীর মা বিমূঢ়ের মত হইয়া গিয়া ঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এই গোলমাল সোর হাঙ্গামায় শাকার ছেলেটার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে এতক্ষণ যে ঘুমাইয়াছিল, তাহাও নহে। ক্ষুধার জ্বালায় যখনই তাহার পেটটা কামড়াইতে থাকিত, তখনই সে চপ্‌ চপ্‌

করিয়া হাতের আঙ্গুল চুষিতে চুষিতে আবার একটু স্থির হইয়া থাকিত, এই ভাবেই তাহার আজিকার রাত্রি কাটিতেছিল।

সে মুখ তুলিয়া তাহার অত্যন্ত নিকটেই ময়ূরাকে দেখিতে পাইল। কোথা হইতে যেন একটু দুধের গন্ধ আসিল, শিশুর সারাদিনের বুভুক্ষু আত্মা এই গন্ধে একেবারে যেন পাগলের মত হইয়া গেল। সে উপুড় হইয়া শুইয়া সাম্‌নের দুই হাতের উপর ভর করিয়া মাথাটা একটু উঁচু করিল, সদ্য শিশুসন্তানহারা জননী ময়ূরার দুগ্ধস্ফীত স্তনভার হইতে নিষ্ফল দুগ্ধধারা অযাচিতে ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছিল। শাকার ছেলেটা হামাগুড়ি দিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেল। তারপর মূর্ছিত ময়ূরার দুগ্ধসিক্ত স্তনাগ্র নিজের আজন্ম স্তনদুগ্ধবঞ্চিত পিপাসিত ওষ্ঠের ভিতর পূরিয়া দিয়া আকণ্ঠ পান করিতে লাগিল।

ময়ূরার যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সে অনুভব করিল, তাহার বুকেব ভার অনেকখানি লঘু হইয়া আসিয়াছে, এক অনাস্বাদিত পুলক শিহরণে তাহার সমগ্র দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ময়ূরার একখানি হাত অলক্ষ্যে ছেলেটার মাথায় আসিয়া পড়িল। যেন সে নিজের অজ্ঞাতেই তাহার জীর্ণ মস্তকখানিতে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল।

তখন পূবদিক প্রায় ফর্সা হইয়া আসিতেছিল। ময়ূরার অবস্থাটা একবার দেখিবার জন্য শাকা বারান্দা হইতে ঘরের ভিতরে উঁকি মারিল। সে নিজের চক্ষুকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনে করিল, সারারাত্রির ঘুম লইয়া সে ভুল দেখিতেছে, ভাল করিয়া চোখ রগ্‌ড়াইয়া লইয়া আবার দেখিল, ইহার সে কোনই অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। সে অগত্যা ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, ছেলেটা যেন তাহার সমস্ত জীবনের পিপাসা মিটাইয়া স্তন্য পান করিয়া পরম তৃপ্তিতে ময়ূরার বাহুবন্ধনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

শাকা কিছুই বুঝিতে পারিল না। একবার ভাবিল, পদীর মাকে ডাকিবে, কিন্তু সে ত অন্ধ, এই দৃশ্য ত চোখে দেখিতে পাইবে না, আর যদি কেহ ইহা চোখে না-ই দেখে, তবে যে মুখে বলিলে বিশ্বাস করিতে পারিবে না! শাকা চোখে দেখিয়াও যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

উভয়েই অঘোরে ঘুমাইতেছে। মুখে উভয়েরই পরম তৃপ্তির চিহ্ন। মাতাপুত্রের এমন পবিত্র ছবি শাকা আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

সহসা শাকা বুঝিতে পারিল যে, ছেলেটা চুরি করিয়াই এ কাজ করিয়াছে, ময়ূরা জগিয়া উঠিয়া ইহাকে তাহার কোলের মধ্যে দেখিতে পাইলে হয়ত টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। শাকা ভয় পাইল। ভাবিল, চুপি চুপি ছেলেটাকে সরাইয়া লইবে এবং ময়ূরার এই মোহ ভাঙ্গিবার আগেই ইহাকে একেবারে জন্মের মত ধাওরার বাহির করিয়া পাদ্রীদের হাতে দিয়া আসিবে। শাকা বুঝিল, নহিলে নিজের পুত্রহারা ময়ূবার কাছে এই সতীনের ছেলেটার আর নিস্তার নাই।

ময়ূরার হাতখানি সন্তর্পণে তুলিয়া ধরিয়া শাকা ছেলেটাকে সরাইয়া লইতে গেল। অমনি ময়ূরা জাগিয়া উঠিয়া ছেলেটাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। ময়ূরা বলিল, ওকি হচ্ছে? ছেলেটাকে এমন করে ধরতে এইছিস্ কেনে?

শাকা মনে করিল, ময়ূরা হয়ত শোকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া এই ছেলেটাকেই নিজের ছেলে মনে করিতেছে! শাকা ইহার কি জবাব দিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না; একটু ভাবিয়া বলিল, উটা কেমন করে তোর কাছে এসে পড়ল! দে, দে, উটাকে আমার কাছে দিয়ে দে!

ময়ূরা বলিল, না, না এটাকে তোর কাছে দিতে যাব কেনে? কে বলে আমার ছেলে মরেছে, এইত আমার ছেলে আমি ফিরে পেয়েছি!

শাকা মুগ্ধ বিস্ময়ে ময়ূরার দিকে তাকাইয়া. রহিল। ময়ূরা ত বাহ্যজ্ঞান শূন্যের মত কথা বলিতেছে না, তবে ময়ূবা যাহা বলিতেছে, তাহা কি তাহার প্রাণ হইতেই বলিতেছে? কিন্তু শাকার এ বিষয়ে আর কোন সংশয় রহিল না।

ধাওরার সকলে ময়ূরার এই ব্যবহারে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইযা গেল। কেহ কেহ বলিল, নিজেব ছেলে হারিয়ে ছেলের যে কি মূল্যি, তা বুঝেছে। কেবল অন্ধ পদীর মা ইহার ভালমন্দ কিছুই বলিল না।

ঝরা পালক

সেই বার বর্ষা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল, তখন ছোটনাগপুরের ছোট একটি শহরে এক সার্কাসের দল আসিয়া তাঁবু ফেলিল। শহরখানি ছোট, একটি সামান্য লোহার কারখানাই ইহার প্রাণ, তাহা ছাড়া একটি ছোটখাট বাজার, খানকতক মুদি ও মনিহারী দোকান, একটি ছোট ডাকঘর, পুলিশ ফাঁড়ি, কুলিমজুরের ছেলেমেয়েদের পড়িবার জন্য একটি অবৈতনিক নিম্নতন বিদ্যালয় ও একটি কোম্পানীর হাসপাতাল ইহাতে ছিল। নানা কাজে মোট হাজার দশেকের মত লোক ইহাতে বাস করিত। পশ্চিম ভারতের কোন স্থান হইতে সার্কাসের দলটি পূজা উপলক্ষে কলিকাতায় যাইতেছিল, পথিমধ্যে কি মনে করিয়া দলবল সহ এখানে নামিয়া পড়িল এবং শহরের প্রান্তবর্তী একটি খোলা জায়গায় তাঁবু খাটাইয়া তামাসা দেখাইবার নিমিত্ত তোড়জোড় করিয়া রং-বেরঙের কাগজে বিজ্ঞাপন বিতরণ করিতে লাগিল। এই শহরে সার্কাসের দল এই প্রথম; সেইজন্য ইহার অধিবাসীদিগের মধ্যে এই বিষয়ে উৎসাহের আর সীমা রহিল না।

সার্কাসের দলের মধ্যে একটি সিংহ, দুইটি বাঘ, একটি হাতি, তিন চারিটা ঘোড়া, কয়েকটি আরও ছোটখাট জানোয়ার এবং বিবিধ ক্রীড়া-কুশলী দশ পনের জন স্ত্রী ও পুরুষ খেলোয়াড় ছিল।

সার্কাসের মালিক একজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক। বয়স প্রায় তাঁহার পঞ্চাশের কাছাকাছি। এক কালে তিনি এক সাহেবের সার্কাস কোম্পানীতে চাকুরী করিতেন, আজ দশ বার বছর হইল স্বাধীনভাবে এই দলটি খুলিয়াছেন এবং নানাস্থান হইতে জানোয়ার ও খেলোয়াড়

কয়টিকে সংগ্রহ করিয়া নিজের যত্নে শিক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়। তবে একবার খাঁচার মধ্যে সিংহের সঙ্গে খেলা দেখাইতে গিয়া একটা দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অবধি খেলা এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন দিন 'বিশেষ প্রোগ্রাম' থাকিলে তাঁহাকে খেলোয়াড় বেশে রিংএর মধ্যে তখনও দেখা যাইত। ভদ্রলোকের নাম আলফ্রেড্ রঙ্গনাথম্।

দলের মধ্যে কয়েকটি মেয়ে খেলোয়াড়ও ছিল। তাহাদের মধ্যে মারাঠি যমজ ভগিনী মালিনী ও শালিনীই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সমান্তরালস্থিত দুইটি তারের উপর দিয়া তাহাদের এক চাকার সাইকেল-দৌড়ের প্রতিযোগিতা যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই এই উদ্ভিন্নযৌবনা নিটোল স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী ভগিনীদ্বয়ের অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

রামরাও সার্কাসের একজন 'ক্লাউন' বা ভাঁড়। সার্কাসের মালিক রঙ্গনাথম্ বলেন, সকল খেলোয়াড়কেই চেষ্টা ও যত্ন করিলে এক রকম না এক রকম করিয়া শিখাইয়া লইয়া কাজ চালানো যায়, কিন্তু বাদে ক্লাউন। সত্যকার হাস্য-পরিহাস করিবার মত ক্ষমতা অনেকেরই থাকে না। তাহাদিগকে জোর করিয়া ভাঁড় সাজানো বিড়ম্বনা মাত্র। রামরাওকেও রঙ্গনাথম্ এমনি বিড়ম্বনার মধ্যেই গণ্য করিতেন। রঙ্গনাথম্ সর্বদাই তাঁহার একজন ভূতপূর্ব ভাঁড়ের কথা স্মরণ করিয়া বলিতেন, ক্লাউন ছিল বটে আবন্তী। তার হাসানোর কায়দায় গ্যালারীর লোকগুলো হাস্‌তে হাস্‌তে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌ত। আবন্তী ছিল একজন হিন্দুস্থানী। সে এই দলে কাজ করিবার কালেই এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। তাহার মৃত্যুটী বড়ই করুণ। একটি সরু লম্বা চিম্‌নী সে সোজাসুজি ভাবে মাথায় করিয়া দাঁড়াইত। যমজ ভগিনীর অন্যতম শালিনী—তখন তাহার বয়স চৌদ্দ পনের বৎসর, বন্দুকে এক নম্বর কার্তুজ পূরিয়া সেই চিম্‌নির ফুটোটির ভিতর দিয়া গুলি করিত।

নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখিয়া যে পরের মাথার উপর দিয়া বন্দুকের গুলি চালাইত, সে-ই দর্শকের নিকট হইতে অজস্র করতালি লাভ করিত। আর যে হতভাগ্য নিজের সমগ্র দেহখানিকে পাষাণের মত স্থির করিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে সেই মৃত্যু-দূতকে নিজের মাথাটি ঘেঁষিয়া পার হইয়া যাইবার জন্য পথ করিয়া দিত, সে-ই সহস্র লোক-চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু একদিন সে বাস্তবিকই সকলের চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, সেদিন তাহার শেষ দিন। বালিকার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল, সহস্র লোকচক্ষুর সম্মুখে বন্দুকের গুলি আবন্তীর মস্তক বিদীর্ণ করিয়া গেল। তারপর হইতে আবন্তীর এই শূন্যস্থান রামরাও অধিকার করিয়াছে। রঙ্গনাথম্ বলেন, দলের যেমনটি যায়, তেমনটি আর আসে না, আবন্তী কি রকম অদ্ভুত হাস্‌তে হাস্‌তে বন্দুকের সাম্‌নে এসে দাঁড়াত, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখলেই লোক হেসে অস্থির হতো ; আর এর মুখখানি দেখ্‌লে আপনা থেকেই কান্না আসে। তবু রামরাওকে দিয়াই এই কাজটা চালাইয়া লইতে হয়, অন্য খেলোয়াড়-দিগের অনেক কাজ, অনেক খেলা—এই নিতান্ত অগৌরবের একটি কাজ যেমন তাহাদের করিবার অবসর নাই, তেমনই প্রবৃত্তিও হয় না।

সেই দিন এই শহরে সার্কাসের 'উদ্বোধন রজনী'র খেলা মাত্র আরম্ভ হইতে চলিয়াছে, রঙ্গনাথম্ আসিয়া রামারাওর পিটে চাবুকের বাঁটটা দিয়া একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন, কি যে আক্কেল তোর, এই বুঝি সাজ হলো? ক্লাউনের এই সাজ? ইস্ যেন একেবারে নবাবপুত্তুর সেজেছেন? যা, যা, মুখটাতে আর একটুকু কালি টালি মেখে আয়, আর তোর সেই ছেঁড়া পায়জামাটা কোথায়? সেই যে কালো আর সব্‌জের ডোরা কাটা?

রামরাও তাহার খড়িমাখা মুখখানি হইতে লাল টুকটুকে ঠোঁট দুইখানি বাহির করিয়া বলিল—ও পায়জামাটাতে গন্ধ হ'য়ে গেছে, ওটা কাচ্‌তে দিইচি!

রঙ্গনাথম্ একটু তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন, আজ তিরিশ বচ্ছর সার্কাসের দলে কাজ কচ্ছি, ক্লাউনের জামা-কাপড় কাচ্‌তে দিতে শুনিনি। আবন্তী চিরদিন নিজেই কেচে নিত। এমন নবাবের বেটা ক্লাউন হলেই আমার দল চলেছে, আর কি! কিন্তু যাক্ ওই জায়গাটাতে বুঝলি, যে ভাবে শিখিয়ে দিইচি, ঠিক ওই ভাবে কর্‌তে হবে কিন্তু……দেখিস্ আজকে আবার ভুলিস নি··· আজকের শো-টা ভাল হলেই এখানে কয়েকটা নাইট শো চল্‌তে পারে···বলিতে বলিতে তিনি জানোয়ারের খাঁচাগুলির দিকে চলিয়া গেলেন।

রামরাও যে অভাবে পড়িয়া পেটের দায়ে এই সার্কাসের দলে পড়িয়া আছে, এমন মনে হয় না। সে ধনীর ছেলে, গুজরাটের কোন জায়গায় তাহার বাড়ী, সেখানে তাহার বাপ-মা-ভাই-ভগিনী সকলেই আছে, তাহারা তাহাকে কতবার দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া কত পত্র লিখিয়াছে, তাহার বাপ নিজেও একবার আসিয়াছিলেন। রামরাও সে সব কানেই তুলে নাই। একবার কি কুক্ষণে এই সার্কাসের দল তাহাদের গ্রামের নিকটবর্তী এক সহরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বৎসরই রামরাও কি একটা পরীক্ষায় ফেল্ করিয়া টিকেট-বিক্রেতা হিসাবে এই দলে আসিয়া প্রবেশ করে। সে কোন খেলা জানে না, শিখিতে চেষ্টাও করে নাই। একটা সুস্থ সবল লোক দিয়া সার্কাসের দলে টিকিট বিক্রয় করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, তাহার চাইতে এই কাজে দলের খেলোয়াড়ের কার্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত কোন বয়স্ক লোককে নিযুক্ত করিলে এই সমস্ত গৃহসম্পর্কহীন চির-যাযাবর হতভাগ্যদের আমরণ একটা অবলম্বন হয়। অল্পদিনের মধ্যেই রামরাওকে টিকিট-ঘরটি এমনই একজনের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁবুর ভিতরের কোন কাজে আসিয়া যোগদান করিতে হইল। কিন্তু তাঁবুর ভিতরেই নিতান্ত সাধারণ একটা লোকের জন্য কি ব্যবস্থাই আর হইতে পারে? 'অবশেষে আবন্তীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে আবন্তীর পদটি লাভ করিয়া হাতে মুখে চুণ কালি মাখিয়া

নানারকম অঙ্গভঙ্গি দ্বারা দর্শকদিগকে আনন্দ পরিবেশনের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। একমাত্র একটি কারণে রঙ্গনাথম্ এই লোকটাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন—রামরাও তাহার মাহিয়ানার জন্য কখনই মুখ ফুটিয়া কোনদিন কাহাকেও তাগিদ করিত না। রঙ্গনাথম্ খুশী হইয়া যখন যাহা তাহার হাতে তুলিয়া দিতেন, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকিত। রামরাও নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিল, সেইজন্য সে তাহার পারিশ্রমিক হিসাবে যখন যাহা পাইত, তাহা কোনদিনই তাহার নিজের যোগ্যতার পুরস্কার বলিয়া গণ্য করিত না, উপরন্তু কর্তৃপক্ষের নিতান্ত সহানুভূতির নিদর্শন বলিয়াই হাত পাতিয়া লইত।

সেই দিনের খেলার প্রথম দিকেই একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। যমজ ভগ্নীদ্বয় যখন সমান্তরাল তারের উপর দিয়া এক চাকার সাইকেল দৌড় দেখাইতেছিল, তখন সহসা শালিনী ডানদিকে কাত হইয়া সাইকেল-শুদ্ধ নীচে পড়িয়া গেল। ভাঁড় রামরাও নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল এবং বিনা সাইকেলেই হাত পা'র বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া সাইকেল চালাইবার ব্যঙ্গ-অভিনয় করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে কৌতুক দান করিতেছিল। এমন সময় দুর্ঘটনাটি ঘটিয়া গেল। ইহার ফলে শালিনীর ডান হাতটি তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া গেল এবং বুকের ডান দিকটার পাঁজরের উপরও গুরুতর আঘাত লাগিল।

রামরাও রিংএর মধ্যেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া এক ভয়ার্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। দর্শকগণ দুর্ঘটনার গুরুত্ব বুঝিতে পারিল না, কিংবা বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। তাহারা ভাঁড়ের চীৎকারকে তাহার কৌতুকের কোন অঙ্গ বিবেচনা করিয়া বরং হাসিয়া আকুল হইতে লাগিল।

রঙ্গনাথম্ তীরবেগে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া রামরাওর গায়ে সজোরে বুট দিয়া আঘাত করিয়া কহিলেন,—'এই উল্লু, ইস্ কী পকাড়নে নেই সেক্‌তা?' বলিয়া নিজেই মূর্ছিতপ্রায় আহতাকে

টানিয়া তুলিয়া রিঙের বাহিরে লইয়া গেলেন। ক্রীড়া অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মালিনী সাইকেল হইতে নামিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল।

ভাঁড়বেশী রামরাওকে ম্যানেজারের পদাঘাত খাইতে দেখিয়া দর্শকদিগের মধ্যে হাসির একেবারে রোল পড়িয়া গেল, যেন এমন হাসির একটা ব্যাপার ইতিপূর্বে সারা সংসারেও আর ঘটে নাই।

রামরাও ব্যাপারটা তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তবে সাংঘাতিক যে একটা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার তিলমাত্রও বুঝিতে বাকি রহিল না। সে তখনও রিংএর মাঝখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর গ্যালারীতে বসিয়া দর্শকের দল হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

এমন সময় দলের একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কুঞ্জরমন সহসা পর্দা সরাইয়া রিংএর ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তারপর রামরাওকে কানে ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিতরের দিকে লইয়া গেল; দর্শকের গ্যালারীতে হাসির তরঙ্গ বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

কুঞ্জরমন জিজ্ঞাসা করিল, তোর কি রকম আক্কেল বল দিকিন্, ও কাত হয়ে পড়ে গেল, তুই হাত টুকুন বাড়িয়ে একটু ধরতেও পার্লি নে?

বাস্তবিক এই অনুযোগের কোন অর্থ হয় না। পাঁচ বছর ধরিয়া যমজ ভগ্নীগণ তারের উপর খেলা করিতেছে, আজ হঠাৎ এমন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য কে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে? বিশেষতঃ সে যে রিংয়ের মধ্যে তখন অকারণেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও নহে—তাহারও ইহাতে একটা নির্দিষ্ট কর্তব্য ছিল এবং তাহা সে যথাসাধ্য পালন করিতেও ত্রুটি করে নাই।

রামরাও ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, সে তাহার সেই অদ্ভুত হাস্যকর পোশাক পরিহিত কালি ঝুল মাখা চেহারাটা লইয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা রঙ্গনাথম্ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, যাও, রমন, আর দেরি করো না, গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়ে, এই হতভাগাটাকে চাব্‌কালেও যদি কোন লাভ হত! যাও, হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে আবার তোমার শোগুলো দেখাতে হবে। ইস্, এখানে এসে এখন মুখ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়!

আহতাকে পূর্বেই লইয়া গাড়ীতে তোলা হইয়াছিল। কুঞ্জরমন তাহাকে লইয়া হাসপাতালের দিকে বাহির হইয়া গেল।

সার্কাসের ব্যাণ্ড অত্যন্ত করুণ স্বরে বাজিতে আরম্ভ করিল, রামরাও তাহার সেই অপরূপ বেশটি লইয়াই এক কোণে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

এই দিকে পরবর্তী শো দেখাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া দর্শকগণ অস্থির হইয়া উঠিল, ঘন ঘন করতালি দিয়া কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

রামরাও তাহার নিভৃত কোনটিতে আসিয়া বসিযা ভাবিতে লাগিল। সে কি ইচ্ছা করিলেই শালিনীকে দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করিতে পারিত? কে জানে, হয়ত সে পারিত। কুঞ্জরমন এই দলের এত বড় একজন খেলোয়াড় যখন বলিয়াছে, সকলেই তাহাতে বিশ্বাসও করিবে। তাহার মত সামান্য একটা ভাঁড়ের কথা কেহ কোনদিন শোনেও নাই, কখনও শুনিবেও না।

কুঞ্জরমনের দুঃখিত হইবার কথাই বটে। কুঞ্জরমন-শালিনীর কথা দলের সকলেই জানে। কেবল কুঞ্জরমন অদ্বিতীয় একজন খেলোয়াড়, নহিলে রঙ্গনাথম্ কবেই তাহাকে দূর করিয়া দিতেন। কুঞ্জরমন একদিন ত প্রকাশ্যেই বলিয়াছিল, সে ইচ্ছা করিলেই শালিনীকে বিবাহও করিতে পারে এবং অচিরকাল মধ্যেই তাহাদের বিবাহকার্যও সম্পন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু একমাত্র বাধা মালিনী, তাহার যমজ ভগিনী। একজনের বিবাহ হইবে দলের এত বড় একজন খেলোয়াড়ের

সঙ্গে, আর একজন থাকিবে অনূঢ়া—তাহাতে হয়ত এই যমজ ভগিনীর যুগ্ম জীবনে যে ছন্দ তাল রক্ষা করিয়া এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে একটা নির্মম পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে ; সেইজন্য এই ক্রীড়াশিল্পী সম্প্রদায় এই যুগ্ম সৌন্দর্যকে এতকাল ধরিয়া সাবধানে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ তাহা বুঝি নিয়তির নির্মম পরিহাসের মধ্যে চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গেল !

রামরাও লক্ষ্য করিল, আজ দলের প্রত্যেকের মুখেই এক করুণ বিষাদের ছায়া, যেন কি এক গভীর শোক সহসা এই সহস্র দীপোজ্জ্বল আনন্দ পুরীখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল !

রঙ্গনাথম্ ব্যস্তভাবে সহসা সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, এই যে রামু, তোকেই খুঁজ্‌ছি, চল এ'বার বন্দুকের খেলাটা সেরে ফেলি ! রমন ত এখনও ফির্‌ছে না, শুন্‌ছিস্ ত, লোকগুলো কি রকম হাঙ্গামা আরম্ভ করেছে ! এ'বার ঢিল ছুঁড়ে আলোটালোগুলো ভেঙ্গে না দেয়।

রামরাও সেই জায়গায়ই স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া জবাব দিল, বন্দুকের খেলা ? কোন্ বন্দুকের খেলা ?

এমন ভাবে সে রঙ্গনাথমের সঙ্গে আর কোন দিন কথা বলিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

রঙ্গনাথম্ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আহা, ওই চিম্‌নীর ফুটো দিয়ে গুলি ছোঁড়া······আগে ত আমিই খেলাটা দেখাতাম, তারপর ত শিখালাম শালিনীকে, আমিই বন্দুক নো'ব ; আয়, আয়, চিম্‌নীটা মাথায় নিয়ে দাঁড়াবি।

রামরাও আজ অবাধ্য হইয়া উঠিল, তেমনি জায়গায় বসিয়া থাকিয়া জবাব দিল, অন্য খেলা লাগাও, আমি চিম্‌নী মাথায় নিয়ে আজ দাঁড়াতে পার্‌ব না। রঙ্গনাথম্ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এমন ভাবের জবাব রামরাওর মুখ দিয়া তিনি কোনদিন কল্পনাও করিতে

পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার আর বিলম্ব করিবার অবসর ছিল না, অন্য যা হোক একটা কিছু খেলার এখনই তাহাকে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রামরাও জানে, কি সাহসে সে শালিনীর বন্দুকের সামনে মাথা দিয়া দাঁড়ায়। শালিনী যখন বন্দুকটী হাতে লইয়া দর্শকদিগকে অভিবাদন জানাইয়া হাসিমুখে তাহার মুখোমুখি হইয়া দাঁড়ায়, লক্ষ্য স্থির করিবার কালে কতবার তাহার সহিত একেবারে চোখাচোখি হইয়া যায়, রামরাওর চোখের সম্মুখ হইতে মৃত্যুর বিভীষিকা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, শালিনীর প্রত্যেকটি অঙ্গের সতর্ক সঞ্চালনের অপূর্ব লীলায়িত ভঙ্গির মধ্যে তাহার সৌন্দর্যপিপাসু চক্ষু দুইটি গভীরভাবে মগ্ন হইয়া যায়। তাহার মত তুচ্ছ একটা লোককে রক্ষা করিবার জন্য সে যে এত সাবধান হইতেছে, ইহা ভাবিয়া সে কৃতার্থ হয়। তারপর সহসা বন্দুকের আওয়াজ হইয়া উঠে, দর্শকদিগের করতালি ধ্বনিত হয় এবং সে আবার নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসে। দিনের মধ্যে এই মাত্র একটিবার সে তাহাকে সব চাইতে নিকটে পায়, ইহার বাহিরে সে নিতান্ত সামান্য একটা লোক, আর কুঞ্জরমন এত বড় একটা খেলোয়াড়।

কুঞ্জরমন ফিরিয়া আসিল, তাহার মুখভাব দেখিয়া রামরাও শালিনীর অবস্থা জানিবার জন্য অগ্রসর হইয়া যাইতে আর সাহস পাইল না।

রঙ্গনাথম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে, কি অবস্থায় রেখে এলে ?

কুঞ্জরমন বলিল, হোপ্‌লেস, ডাক্তার বলছে, একেবারে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার, জোড়া হাড়ই ভেঙেচে ! কোনদিন ভাল হয়েও উঠতে পারে, কিন্তু এ হাত জন্মের মত অকেজো হয়ে গেল।

রঙ্গনাথম্ মাটির দিকে একবার চাহিয়া কি ভাবিলেন, তারপর সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন, নাও, তোমার শোগুলো আজকের মত দেখিয়ে নাও ; বুঝেচি, এখান থেকে তাঁবু তুলতে হচ্ছে।

পরদিন সকালে দলের বড় বড় সকলেই শালিনীকে হাসপাতালে দেখিতে গেল। রঙ্গনাথম্ বলিলেন, তোমার কোন ভয় নেই, আমরা

যেখানেই থাকি, তোমার সংবাদ নেব ; তুমি সেরে ওঠ, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।

শালিনী ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, মালিনী!

কুঞ্জরমন বলিল, সে আমাদের সঙ্গেই যাবে, তার কাছে চিঠি লিখো।

মালিনী ভগিনীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। এতকাল সুখে দুঃখে, দেশে বিদেশে এই অনাথা ভগ্নী দুইটি পরস্পরের সহায়তায় একত্র বাস করিয়াছে, আজ কি এক নির্মম পরিণতির ভিতর দিয়া উভয়ের বিচ্ছেদ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে! মালিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, কোন জবাব দিতে পারিল না।

রঙ্গনাথম বলিলেন, তা হলে আসি, শালিনী ; এদিকে তোমার সব ব্যবস্থা ঠিক করে গেলাম।

কুঞ্জরমন বলিল, হ্যা, হ্যা, এদিকে আবার আমাদের সব গুছোতে হবে। 'আচ্ছা'—বলিয়া ডান হাতটি একটু উপরের দিকে তুলিয়া কুঞ্জরমন অভিবাদনের ভঙ্গি করিল। তারপর মালিনীর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজ চার পাঁচদিন হইল সার্কাসের দল চলিয়া গিয়াছে। যে জায়গায় জানোয়ারের খাঁচাগুলি ছিল, সেই জায়গাটা বিশ্রী নোংরা হইয়া রহিয়াছে ; সহরের ভবঘুরে ছেলেগুলি সেই জায়গাটায়ই ঘুরিয়া বেড়াইয়া কি সব মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।

হাসপাতালে শালিনীর খাটের পাশে যেন কে একজন অত্যন্ত সন্তর্পণে আসিয়া দাঁড়াইল। শালিনী মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, দেখিল, রামরাও।

শালিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল, কিরে, তুই যাস্‌নি?

রামরাও বলিল, না।

শালিনী একটু বিস্মিত হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

রামরাও বলিল, ম্যানেজার জবাব দিয়ে দিলে !

শালিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল, তা তুই এখানে কি চাস্ ?

রামরাও বলিল, কিছু না, শুধু তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি।

কথাটা বলিয়া নিজেই যেন নিজের কাছে অপরাধী হইয়া পড়িল।

শালিনী জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমাকে দিয়ে তোদের ত আর কোন দরকার নেই ! দেখ্‌চিস্ ত আমার হাতখানা !—বলিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ডান হাতখানির দিকে নিজেই তাকাইল।

রামরাও বলিল, আমিও ত আর ওদের কেউ নই ! আমাকেও ত তা'দের কোন দরকার নেই।

শালিনী কথাটি হয় ত বুঝিল না, কিন্তু যে লোকটাকে এতকাল সে একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে নাই, আজ নিজে এতখানি বিপদের মধ্যে পড়িয়া তাহারও মহিমা যেন অন্তর দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

মাস দুই পরে হাসপাতালের ঠিকানায় শালিনীর নামে একখানি চিঠি আসিল। চিঠিখানি পড়িয়া শালিনী বলিল, দেখ্‌লে রামু ! যা ভেবেছিলাম তাই, কুঞ্জর সঙ্গে মালিনীর বিয়ে, এই দেখ,—বলিয়া চিঠিখানি তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

রামরাও চিঠিখানির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে, আমাদের খবরটাও ওদের জানাতে হয়। এ যে রেঙ্গুন থেকে লিখ্‌চে, এরি মধ্যে দল রেঙ্গুন চলে গেছে, দেখ্‌ছি।

শালিনী কোন উত্তর দিল না, দেয়ালের দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

রামরাও বলিল, এতে তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে ! আজ কুঞ্জর সঙ্গে বিয়ে হত তোমার, কিন্তু তা না হয়ে আজ তোমার বিয়ে হচ্ছে গিয়ে একটা ক্লাউনের সঙ্গে।

শালিনী আহত হইল। সে এই নিঃসঙ্গ রোগ-শয্যায় পড়িয়া এই লোকটার নিকট হইতে যে সেবা ও যত্ন লাভ করিয়াছে এবং

তাহার উপর সে-ই নিজ হইতে যাচিয়া যে তাহাকে বিবাহ পর্যন্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহার চিরজীবনের ভার লইতে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহার প্রতিদান ত সে কোনদিনই দিতে পারিবে না।

সে শুধু তেমনি উদাসভাবে বলিল, 'আ মাই পুওর সিস্‌টার'! তবু আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও; কিন্তু ওটা ত একটা স্কাউণ্ড্রেল।

তারপব রামরাওর দিকে তাকাইয়া কহিল, আমি ত সেরেই উঠেছি, চল, এখান থেকে সরে পড়া যাক্।

রামরাও বলিল, হ্যা, সেই ভাল, বাড়ীতেও ত কবে চিঠি লিখে দিয়েছি, তাঁরা হয়ত এ্যাদ্দিন আমাদের আস্‌তে না দেখে ভাব্‌চেন্।

কীর্তিনাশা

স্টীমার কি একটা স্টেসনে ভিড়িবার উপক্রম করিয়া ঘন ঘন বাঁশী বাজাইতে লাগিল। কিরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, কহিল, না, এ'বার কেবিনের বাইরে চল, আমার বাপের বাড়ীর যে দেশটা নদীতে ভেঙ্গে নিয়েছে, তা এখান থেকে এখনও কিছুটা দেখা যা'বে, তোমাকে দেখাব, চল।

প্রেমের কাহিনীটা বড় জমিয়া উঠিতেছিল। বইয়ের পাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিলাম, যাও, কাজের সময় বিরক্ত করো না। তোমার সাধ যায়, এই শীতের সন্ধ্যায় যতক্ষণ ইচ্ছা খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌তে পার, কিন্তু আমার সেই অবসর নেই। বলিয়া উপন্যাসের ঘটনা-স্রোতে পুনরায় গা' ভাসাইয়া দিলাম।

এই রূঢ় উক্তিতে কিরণ কতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর সহসা আমার হাতের বই কাড়িয়া লইয়া সজোরে মেঝের উপর ছুঁড়িয়া মারিল। কহিল, ইস্‌, ভারী ত কাজের লোক হ'য়ে পড়্‌লে দেখ্‌ছি! তোমাকে আমার সঙ্গে গিয়ে সামনের ডেকে এখন বস্‌তেই হ'বে!

উপন্যাসের কল্পিত নায়ক নায়িকাকে লইয়া উড়ো জাহাজে করিয়া আফ্রিকার নীলনদের উপত্যকার ঘন পেপিরাস বনের উপর দিয়া দক্ষিণ-উপকূলের এক হীরার কারখানাতে চলিয়াছিল। নীচের দিকে চাহিলে দেখা যায়, নদীর জলে হীপোর পাল ডুবিতেছে, ভাসিতেছে; ঘন সবুজ পেপিরাস বনের মাথার উপর দিয়া সাদা সারসের ঝাঁক পাখা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে। আমার মনও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উড়িয়া চলিয়াছিল। সহসা এমন সময় আমাকে কে যেন কল্পনার ঊর্ধ্বলোক হইতে ধূলি-ধূসর নিত্য-সংসারের মাঝখানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

আমি একটু বিরক্ত হইয়াই কহিলাম, এ’ তুমি কি আরম্ভ করেছ, কিরণ? আজ আবার মাথায় ভূত চেপেছে বুঝি!

মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সর্বনাশ হইয়াছে; গ্রহণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পাত্‌লা ঠোঁট দুইখানি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; নাকের ডগা টগ্‌বগ্‌ করিয়া কাঁপিতেছে! চোখের দুইটী কালো তারা যেন অশ্রুর অতলে কূল হারাইয়াছে। আমি মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম; ভাবিলাম, যাহা কপালে আছে, তাহা আজি আর ফিরাইতে পারিব না।

ষ্টীমার এক স্টেসনে আসিয়া ভিড়িল। ইজার-পরা খালাসির দল কাছি বাঁধা-ছাদা লইয়া বিপুল সোর হাঙ্গামা বাঁধাইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কিরণের সঙ্গে এই আচরণটা ভাল করিলাম না। বেচারী কিরণ! তাহার বড় সাধের চৌদ্দ পুরুষের ভিটি নদীতে ভাঙ্গিয়া নিয়াছে! এতকাল পর তাহার এত নিকট দিয়া সে যাইতেছে। তাহার কি আর তাহা দেখিবার সাধ যায় না? আমার নিকট একটা তুচ্ছ নদীতীরের আর মূল্য কি? কিন্তু তাই বলিয়া তাহার আশৈশব পল্লীমাতাকে আমি উপেক্ষা করিতে গেলাম কেন?

কত রাত্রে ঘুমের চোখে কিরণের মুখে তাহাদের গ্রামখানির কত গল্প শুনিয়াছি। পদ্মার তীরে দীর্ঘ বালুচরের কিনারায় তাহাদের গ্রাম। কত দেশ বিদেশের গুণ-টানা নেয়ে সেই বালুচরের উপর দিয়া তাহাদের পায়ের চিহ্ন আঁকিয়া যাইত। কত ঝড়ের রাত্রে দূরে নদীর গর্জন শুনিতে শুনিতে তাহারা মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। সেই পদ্মা, তাহার বড় সাধের পদ্মা—শৈশবের স্বপ্নভরা, বাল্যের স্মৃতিবিজড়িত পদ্মা, এতকাল কি আনন্দ সন্দেশই জানি তাহার জন্য গোপন করিয়া রাখিয়াছে।

সে আমাকে বড় আগ্রহ করিয়া কতদিন বলিয়াছে যে, এই পথে যদি কোনদিন একত্র যাতায়াত করিবার সুযোগ হয়, তবে তাহার বাপের বাড়ীর লুপ্তপ্রায় দেশ গাঁ’র সঙ্গে আমাকেও পরিচয় করাইয়া দিবে। আমি

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার কথা স্বীকার করিয়াছি। মনে করিয়াছি, তাহার আজন্মপূজিত শৈশবের লুপ্ত পল্লীভূমির উদ্দেশ্যে দুইজনে অশ্রু মোচন করিয়া কীর্তিনাশার জলে তর্পণ করিব। এই অবস্থায় কিরণের প্রতি আমার নিজের এই রূঢ় আচরণ এখন আমাকেই অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল।

এমন সময় কিরণই আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কহিল, আজ তুমি আমার উপর অনর্থক যত আক্রোশই কর, তার জবাবে আমি একটি কথাও বল্‌ব না। তবু তোমাকে এমন দিনে কেবিনের বদ্ধ হাওয়ায় বসে থাক্‌তে দেব না। সম্মুখের ডেকে চল। রেলিংএর ধারে গিয়ে দাঁড়াই! বলিয়া আমাকে একরূপ টানিয়াই কেবিনের বাহিরে লইয়া চলিল।

গ্রহণ এত সহজে কাটিল দেখিয়া আমি মনে মনে খুশি হইয়াই কহিলাম, বেশ, বেশ, আমি নিজেই যাচ্ছি। তুমি অমন বিশ্রী টানাটানি করো না। দেখ্‌ছ না, ঐ দিকের ডেকের যাত্রীরা তোমার কাণ্ড দেখে হেসে খুন হচ্ছে?

কিরণ আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, হোক্ গে! তুমি না গেলে আমি আরও লোক হাসা'ব!

তাহার প্রাণে আজ খুশির শেষ নাই। যদি ইহার অংশ অন্ততঃ একজনকেও বাঁটিয়া দিতে না পারিল, তবে সে যে ইহার ভার আর একলা বহিতে পারে না! তাহার আজিকার এই স্থির আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবির উপর দিয়া যেন কোন আক্রোশ ও অভিমানের রেখাই দাগ কাটিয়া যাইতে পারিতেছে না। অন্তরের আনন্দ দিয়া আজ সে বাহিরের সমস্ত আঘাতকেই জয় করিয়াছে।

কিরণের পিছনে আসিয়া আমি সম্মুখ-ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। কিরণ কহিল, এইটি আমাদের গাঁয়ের স্টেসন ছিল। আজ আট বছর হবে, একদিন এইখানে বাপমা'র সঙ্গে স্টীমারে চড়ে জন্মের মত দেশের ভিটা ছেড়ে এ'সেছি।

অনুভব করিলাম, কথা কহিতে কিরণের গলার স্বর আট্‌কাইয়া আসিতেছে। তাহার একখানি হাত সস্নেহে টানিয়া লইয়া একটু সহানুভূতির সুরে কহিলাম, তোমাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম, কিরণ! সে'জন্য তুমি আনাকে ক্ষমা করো!

কিরণ কথা কহিল না। হাতখানি নিঃশব্দে মুক্ত করিয়া লইয়া সম্মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। স্টীমারে এতক্ষণে শিঁড়ি পড়িয়াছে। একখানি সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া অসংখ্য যাত্রীর ওঠানামার পালা সুরু হইয়াছে; দোতলার ডেক হইতে জাহাজ ভরা লোকের চোখ গিয়া তাহাদের উপর পড়িয়াছে। আমি মুখ না ফিরাইয়াই কিরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ষ্টেসনের চেহারা দেখ্‌লে ত এ'কে খুব বড় বলে' মনে হয় না, অথচ এত যাত্রী রোজ কোথা থেকে আসে?

কিরণের কোন সাড়া পাইলাম না। মুখ ফিরাইয়া দেখি, কিরণ আগের জায়গায় দাঁড়াইয়া নাই। একটু বিস্মিত হইয়াই ডেকের চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিলাম; কোথাও তাহার ছায়াটুকু পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া গেল না। বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া উঠিল। দ্রুত কেবিনের দিকে ছুটিয়া আসিলাম। দেখি, একটা র‍্যাপারে আপাদ-মস্তক মুড়িয়া কিবণ বার্থের উপর পড়িয়া আছে। আমি কাছে আসিয়া একটু ব্যগ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, একি? কখন চুপ ক'রে চলে এলে? তোমার কি কোন অসুখ-বিসুখ কর্‌ল?

বলিয়া র‍্যাপার সরাইয়া তাহার ললাটের উত্তাপ অনুভব করিতে গেলাম।

কিরণ আমার হাত ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আহা! বিরক্ত করো না। আমাকে একটু ঘুমোতে দাও!

আমি তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া পড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি কোন অসুখ কর্‌ল, কিরণ?

কিরণ সংক্ষেপে উত্তর দিল, না! আমি একটু ঘুমোতে চাই!

আমার আশঙ্কা দূর হইল না। কিন্তু তবু তাহাকে আর বিরক্ত করিতে সাহস পাইলাম না। ইংরেজি উপন্যাসখানি কুড়াইয়া লইয়া অগত্যা তাহাতেই আবার মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিলাম।

সন্ধ্যা তখন ঘনাইয়া গিয়াছে। স্টীমারে আলো জ্বলিয়াছে। বাহিরের কালো আকাশে একটি দুইটি করিয়া সোনার বুটি ফুটিয়া উঠিতেছে।

এমন সময় এক ভদ্রলোক কেবিনের দরজার গোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ম'শায়ের সঙ্গে কি স্ত্রীলোক আছে? আসবাব পত্র ও পোশাক পরিচ্ছদের ঐশ্বর্য দেখিয়া মনে হইল, ভদ্রলোক প্রথম শ্রেণীরই যাত্রী বটেন! বয়স বোধ হয় পঁয়ত্রিশের অনধিক। ইতিমধ্যেই মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে। মুখেও কাঁচা পাকা ছুঁচ্‌লো দাড়ি। ছিপ্‌ছিপে একহারা গড়ন। গায়ে একটা লম্বা সার্জের কোট—পাশের একটা পকেট হইতে স্টেথিস্কোপের সাদা টিপটুকু উঁকি দিতেছে। পিছনে চাপরাশি ও দুই তিনটা কুলির মাথায় ছোট বড় কতকগুলি চামড়ার স্যুট্‌কেস, বেডিং, টিফিন কেরিয়ার ইত্যাদি।

ভদ্রলোকের প্রশ্নটী আমার নিকট কিছু অদ্ভুত ঠেকিল। যে সব যাত্রী সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্টীমারে চলাফেরা করিয়া থাকেন, তাহাদের ত স্ত্রীপুরুষ-নির্বিচারে একই কামরায় চড়িতে হয়। আর বিশেষ করিয়া ইংরেজি শিক্ষিত এই বয়সের পুরুষের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ কেবল অস্বাভাবিক বলিয়াই অসম্ভব।

কিছুক্ষণ ভদ্রলোকের এমন প্রশ্নের তাৎপর্য চিন্তা করিয়া কহিলাম, আজ্ঞে হাঁ, সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন।

বলিয়া আপাদ-মস্তক আচ্ছাদিতা কিরণকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া দিলাম। ভদ্রলোক ফিরিয়া চাপ্‌রাশিকে কহিলেন, সেকেণ্ড ক্লাসেও একই অবস্থা। নে, তবে ডেকেই জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে রাখ। আর ঐদিকটাতে, হাঁ, হাঁ, ঐদিকটা, ঐদিকটাতে আমার বেডিংটা

বিছিয়ে দে। বলিয়া দরজার গোড় হইতেই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

আমি উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, সে কি ? না, না, আপনি অনর্থক কষ্ট করবেন কেন ? এই যে আমাদের সামনের বার্থ টাই ত খালি পড়ে আছে। তা ছাড়া কুশানগুলিও ত…

ভদ্রলোক ফিরিয়াও চাহিলেন না ; কেবল কহিলেন, না, না, এখানেই বেশ হ'বে। তা ছাড়া আমার আর কতক্ষণেরই বা জার্ণি। কয়েকটা স্টেশন বাদেই নেমে যা'ব।

ষ্টীমার মাঝনদীতে আসিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে পশ্চিমমুখী হইল, তারপর আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। কঠিন বায়ুস্তর নিস্তরঙ্গ নদীর বুক পর্যন্ত ছুঁইয়া আছে। সেই দুরন্ত গতিতে স্থির বায়ুস্তরে তুমুল তরঙ্গ জাগিল। এমন সময় সম্মুখের খোলা ডেকে মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিলে গায়ের রক্ত হিম হইয়া যায়। আমিই ভদ্রলোকের এই অসুবিধার কারণ হইলাম ভাবিয়া মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইলাম।

তারপর বাহিরে আসিয়া সহানুভূতির সুরে কহিলাম, এই শীতের সন্ধ্যায় ডেকের উপর মিছামিছি নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় কষ্ট পা'বেন কেন ? কেবিনের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে দিই, আপনি দিব্যি আরামে আমাদের সাম্‌নের বার্থ টা দখল করে বসুন। আমি বড় একা, বরং দু'জনে একটু গল্প করা যা'বে। আমার স্ত্রী এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বলিয়া আমি নিজেই ভদ্রলোকের সুট্‌কেস্‌ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিলাম। ভদ্রলোক কতক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, না, আমি আর কিছুর জন্য ভাব্‌ছি না। যদি আপনাদেরই কোন অসুবিধা হয়।

আমি হাসিয়া কহিলাম, আমাদের আবার অসুবিধা কি ? একজন ত ঘুমিয়েই পড়েছেন। এমন অসময়ে পুরুষদের হ'লে ঘুম আসতো না। বরং সময়টা একটু গল্প করে কাটাতে পার্‌লে মন্দ লাগ্‌বে না।

বলিয়া ভদ্রলোককে এক রকম জোর করিয়াই ভিতরে আনিয়া আমাদের সম্মুখের বার্থে বিছানা পাতিয়া বসাইলাম।

কিরণ একবার নড়িয়া চড়িয়া আমাদিগকে পিছন করিয়া শুইল। আমি তাহার শিয়রের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ভদ্রলোক তাঁহার লম্বা কোটের পকেটে হাত পূরিয়া দিয়া রূপার একটা সিগারেট কেস্ বাহির করিলেন। তারপর একটা খুব অস্বাভাবিক রকম মোটা সিগার আমার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, অভ্যাস আছে ?

অভ্যাস যে একেবারে ছিল না, এমন নহে। একটু অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর উপদ্রবে অন্যান্য আরও দু'একটি বদ অভ্যাসের সহিত ইহাকেও বিসর্জন দিতে হইয়াছে। কিরণকে শুনাইবার উদ্দেশ্যেই একটু অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কহিলাম, আজ্ঞে না, আমার কোনকালেই এ সমস্ত অভ্যাস নাই। বলিয়া নিজের চরিত্রগর্বে উন্মুক্ত জানালা দিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

কৃষ্ণপক্ষের কি একটা তিথি ছিল। রাত্রির নদীজলে আকাশের ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছিল। কেবল কতকগুলি তারা—ঝক্‌ঝকে পরিপাটি তারা—বহুদূর আকাশ হইতে নিম্নে নিস্তরঙ্গ নদীর কালো জলে নামিয়া আসিয়া আগুন লইয়া খেলা করিতে লাগিল। জানালার উপর ঝুঁকিয়া সম্মুখের দিকে চাহিলে দেখা যায়, স্টীমার হইতে সার্চ-লাইটের বহুদূরবিসর্পী তীক্ষ্ণ আলোক তীর-তরুরাজির সর্বাঙ্গ একেবারে বিঁধিয়া দিতেছে।

আমি মুখ ফিরাইয়া ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই নদীর নামই কি কীর্তিনাশা ?

ভদ্রলোকের মুখে সিগারটী প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। একটা ভোট্‌কা গন্ধে কেবিনটা ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি মুখ হইতে সিগারটী না সরাইয়াই জবাব দিলেন, হুঁ !

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার বাড়ী বুঝি এ'দিকেই ?

ভদ্রলোক এইবার মুখ হইতে দুর্গন্ধ সিগারটা সরাইয়া লইয়া কহিলেন, হাঁ, এদিকেই ছিল। অনেক দিন হয় নদীতে ভেঙ্গে নিয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তা'হলে কোথা থেকে এ'লেন ?

ভদ্রলোক বলিলেন, আমি ফরিদপুরে ডাক্তারি করি। এদিকে একটা রোগী দেখ্‌তে এসেছিলাম। আজ তিন চার দিন পর ফরিদপুর ফিরে যাচ্ছি। সাম্‌নের কয়েকটা ষ্টেশন পরেই নেমে যাব।

বলিয়া ভদ্রলোক এইবার দ্বিতীয় সিগারে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

আমি বলিলাম, এই পথে আমি সম্পূর্ণ নূতন যাত্রী। পদ্মার কত কীর্তিনাশা কাহিনী আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি। শুনে আমার আর বিস্ময়ের অবধি থাক্‌ত না। আজ নদীর সেই সব ভাঙ্গনের দৃশ্য চোখে দেখ্‌বার আগ্রহ আর কোনমতেই দমন কর্‌তে পার্‌ছি না।

ভদ্রলোক একটু মুচ্‌কিয়া হাসিলেন—হাসিটুকুর মধ্যে গর্ব কি বিদ্রূপের ঝাঁঝ ছিল, তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তারপর অঙ্গুলি-নির্দেশে বাহিরের অন্ধকারের দিকে লক্ষ্য করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

কিন্তু আমি মুখ ফিরাইয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ঘন কুয়াসায় আকাশের তারাগুলি পর্যন্ত মুছিয়া যাইতেছে। উপরের আকাশ আর সম্মুখের বালুচর একই আঁধারে ডুবিয়া রহিয়াছে।

আমি অগত্যা ফিরিয়া কহিলাম, কই, কিছুই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি নে !

ভদ্রলোক উঠিয়া আসিয়া আমাদের জানালায় ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর সম্মুখের সার্চ-লাইটের আলোর দিকে তাকাইয়া দেখিতে বলিলেন।

আমি বলিলাম, কই, কেবল কুয়াসা ছাড়া ত কিছুই দেখছি না।

ভদ্রলোক বলিলেন, কুয়াসা কোথায় দেখ্‌ছেন ? সম্মুখে দেখছে্‌ন না, কত উঁচু খাড়া পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়্‌ছে ?

খাড়া পাড় ? ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ? চমকিয়া উঠিলাম। উদ্‌গ্রীব হইয়া কহিলাম, কোথায় ? কোন্ দিকে ? ঐ যে বায়ুস্তরে স্থির সাদা

কুয়াসার মত? সার্চ-লাইটের আলোকে চক্ চক্ করছে? ঐ বুঝি ভাঙ্গা খাড়া পাড়?

ভদ্রলোক আগের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া কহিলেন, হাঁ, রাত্রি বলে ঠাহর করতে পারছেন না। কুয়াসা আর বালি এক দেখ্‌ছেন, দিনে হ'লে স্পষ্ট দেখতেন।

এতক্ষণে দেখিলাম, স্পষ্টই দেখিলাম, যেন নীলাম্বরী পদ্মার স্থির বসন-ভাগের দুই প্রান্তরেখা ধরিয়া দুইখানি সাদা রাংতার পাড় কে দুইটী সরল রেখার মত কেবল টানিয়া টানিয়া গিয়াছে। আমি মুগ্ধ-বিস্ময়ে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজের অজ্ঞাতেই যেন বলিয়া গেলাম, না জানি কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই নদী কত লোকের কত খ্যাত আখ্যাত কীর্তি গ্রাস করিয়া লইতেছে। তবু তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই। পরের কীর্তি নাশ করিয়া কি অক্ষয় কীর্তিই জানি সে নিজের জন্য সঞ্চয় করিতেছে।

ভদ্রলোক আমার কথায় অনাবশ্যক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; তারপর মুখ হইতে জ্বলন্ত সিগারটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, পদ্মার দু'একটা অখ্যাত কীর্তি নাশের কথাও আপনি জানেন দেখ্‌ছি!

আমি উচ্ছ্বসিত হইয়া একটু বক্তৃতার সুরে কহিতে লাগিলাম, না, তা একটাও জানি না! আমার জান্‌বার কথাও নয়। তাই বলে কি অনুমান করতে পারি নে যে, পদ্মার দুই তীর জুড়ে শুধু চাঁদ রায় কেদার রায়েরই বাস ছিল না? কেবল তাদেরই পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ইমারতগুলো গ্রাস করেই পদ্মা কীর্তিনাশার দুর্নাম সঞ্চার করে নাই। বরং হাজার হাজার গৃহসুখ-বঞ্চিত হতভাগ্য পল্লীসন্তানের অভিশাপো-চ্চারিত নিদারুণ আক্ষেপের সার্থক নামকরণই এই কীর্তিনাশা!

ভদ্রলোক যেন বড় তৃপ্তির সহিত আর একটা সিগার ধরাইলেন তারপর বলিলেন, কি কারণে জানি না, আপনি পদ্মাতীরের অখ্যাত কীর্তিগুলির উপর বড় জোর দিয়ে কথা বল্‌ছেন। আপনার কথা শুনে

মনে হচ্ছে যে, আপনি অন্ততঃ সরকারের পুলিশ বিভাগে চাকুরি করেন না। সেইজন্যই আপনাকে আমার ব্যক্তিগত জীবনের এই প্রকার একটা নিতান্ত অখ্যাত নষ্টকীর্তির কাহিনী শুনাতে সাহস পাচ্ছি। সংসারে এই কাহিনী আমার পর আর একজন ছাড়া কোন তৃতীয় ব্যক্তি জানে না, আর আজ আপনি শুন্‌বেন। বলিয়া ভদ্রলোক আরম্ভ করিলেন—

পিছনে ঐ যে একটা স্টেশন গেল, ঐ ছিল আমাদের গাঁয়ের স্টেশন। এখন সেই গ্রামের কোন চিহ্নই নেই, আর কেবল পুরাণো সাইন বোর্ডটি ছাড়া স্টেসনেরও কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। তখন কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দিয়ে মাত্র বাড়ী এসেছি। শুন্‌লাম, আমার বিয়ের বড় জল্পনা-কল্পনা চল্‌ছে ! মা'কে একদিন জিজ্ঞাস করলাম, এত তাড়াতাড়ি কেন ? আর একটা বছর সবুর সয় না ? আমি শেষ পরীক্ষাটা দিয়ে একেবারে পাশটা করে বার হতে পারি ?

মা বড় অনুনয়ের সুরে বল্‌লেন, তুই আর আপত্তি করিস্‌ নে, বাপ ! আমিও অনেক বলে তবে কর্তাকে রাজি করিয়েছি। আমার বড় সাধ এই শ্বশুরের ভিটাতেই তোরও কাজটা সেরে যাই। নদীর ভাঙ্গনটা ত নিজেব চোখে দেখ্‌ছিস্‌ ? বলিয়া আচল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

আমি তাঁহাকে একটু খুশি করবার জন্য বললাম, বেশ, বেশ, তাই না হয় হবে। তবে মেয়েটি কোথাকার শুনতে পাই কি ?

মা হেসে বল্‌লেন, ইস্‌, তোর যেন আর তা অজানা আছে ? ঐ দক্ষিণ-পাড়ারই ত মুখুজ্যেদের—

পদ্মা ? কথাটা যেন আমার অলক্ষ্যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল !

মা বললেন, হুঁ, তুই ত তাকে এই নামেই আদর করে ডাকিস্‌। আমায় বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। জিজ্ঞাস কর্‌লাম, এ কেমন করে সম্ভব হ'ল ?

মা বল্‌লেন, সে অনেক কথা। দক্ষিণ পাড়ার চরটা নিয়ে মুখুজ্যেদের সঙ্গে আমাদের যে একটা মাম্‌লা বেঁধেছিল, তাহা বোধ হয় জানিস্‌। মামলাটা যখন আমরা একেবারে হারবার পথে, তখন কোলকাতার ব্যারিস্টার কর্তাকে আপোস করে ফেলতে বল্‌লেন। কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে কি আর আপোস অমনিতে হয়? অনেক দিন ধরেই তাঁদের মেয়েটিকে আমাদের ঘরে বিয়ে দিতে চাইছিলেন। বিপদে পড়ে লোকের পরামর্শে অবশেষে কর্তা লোক দিয়ে এই প্রস্তাব করেই আপোস করতে চাইলেন। তাঁরাও অমত করলেন না।

আমি হেসে বল্‌লাম, ছেলেবেলায় ইতিহাসে পড়েছি, দুই রাজার যুদ্ধে যে রাজা হেরে যেতেন, তিনি অপর রাজার সহিত নিজের কন্যার বিয়ে দিয়ে সন্ধি করতেন। এই ভাবে কত গ্রীক্‌ ও ভারতবাসী এক হয়ে গেল, আর ভারি ত মুখুজ্যে-চাটুজ্যের দুটো এক গাঁয়েরই স্বজাতি বংশ। কিন্তু কাজটা ভাল কর নি, মা! শত্রুর মেয়েকে ঘরে তুলে তোমার আবার কি হাঙ্গামা পোয়াতে হয়, কে জানে!

মা বল্‌লেন, ছি, অমন কথা বল্‌তে নেই। মেয়েটিকে ত আমরা ছেলেবেলা থেকেই ভাল করে জানি। রূপে গুণে এমন লক্ষ্মী-চরিত্রের মেয়ে হাজার গাঁ খুঁজলে বার করা যাবে না। বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে অবধি লজ্জায় এই পাড়ামুখো আর হচ্ছে না। নইলে তুই বাড়ী এসেছিস্‌ শুনে এতদিন কতবার ছুটে আস্‌ত।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, দোহাই তোমার মা, তোমাদের যা ইচ্ছে, তাই কর; তাই বলে আমার নিকট এই সব ভূমিকার কথা আর তুলো না। মা হাসলেন—আমার মনের কথা বুঝতে পেরে মনে মনে হাস্‌লেন।

মেয়েকে তার শৈশব থেকেই চিন্‌তাম। যখন তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখনকার কথা আজ আর ভাল করে স্মরণ কর্‌তে পার্‌ব না; তাতে আজ বিশেষ কারোও প্রয়োজন নেই। কেবল

কোঁকড়ান ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া মাথার তামাটে রংএর চুলগুলি দুলিয়ে পায়ের বড় বড় বেখাপ্পা রূপোর আড়্খেম্টা দুটো বাজিয়ে সর্বদা যে সে আমার পিছনে লেগে থাক্ত, এই টুকুই মনে করতে পারি, আর না। তারপর ক্রমে হয়ত তার পা হতে আড়খেম্টা খসেছে, কানে একজোড়া দুল উঠেছে, ঝাঁক্ড়া চুলে দুটি ছোট্ট কানবেণী বাঁধা হয়েছে। কোনদিন সোহাগ করে তার বেণী ধরে টেনে দিতাম ; সে ঘাড় বাঁকিয়ে অভিমানের সুরে বল্ত, তুমি আমাকে মারলে? তারপর ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে যেত। কিন্তু অন্তরের উদ্বেল ক্রন্দনাবেগ আর গোপন করে রাখ্তে পারত না : ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্ত। সে চলে গেলে আমার বুকে বড় ব্যথা লাগ্ত। কেন তাকে কাঁদালাম? সে আমাকে বই যে আর কিছু জানে না। রাত্রে মায়ের কোলে তারই মুখখানিই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তাম। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেছে ; শুনেছি, দূরে নদীর শব্দ, ঝপাৎ ঝপাৎ পাড় ভেঙ্গে পড়্ছে। ভয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরেছি; কিছুতে আর ঘুম আস্ত না। ভোর হতে না হতেই তাদের বাড়ী ছুটে গিয়েছি ; তাকে ডেকে জিজ্ঞাস করেছি, কিরে, কালরাত্রে শুনেছিস্? নদীর ডাক? আর পাড় ভাঙ্গার শব্দ?

সে আগের দিনের কথা ভুলে গিয়ে বল্ত, ও মা, তা' আর শুনি নি? নদী ত আমাদের বাড়ীর কত কাছে! কাল সারারাত মা আর আমি, বুঝলে, একটুও চোখ বুজি নি। ইঃ কি যে শব্দ! চল গিয়ে দেখে আসি! হরি কপালীর নারকেল বাগটা বুঝি ভেঙ্গেছে। বলে ঊর্ধ্ব শ্বাসে দু'জনে নদীতীরের দিকে ছুটে যেতাম।

সাধ ক'রে তার আমি নাম রেখেছিলাম পদ্মা। কারণ, একমাত্র পদ্মার সঙ্গেই তার রূপের তুলনা হোত। মানব চক্ষুর দৃষ্টি-সীমানা সেই রূপতরঙ্গের লীলাময় আবর্তোচ্ছ্বাসে অনবরত ভেঙ্গে চুরে যেত। তার চিরসুন্দর রূপ শিশুর মতই চির অস্থির। চোখে দেখার মূল্যকে

সে ক্রমাগতই অস্বীকার করে চলেছে। এই রূপের আর কোন সহজ বর্ণনা চল্‌তে পারে বলে জানি না।

আর কীর্তিনাশা নদীকেও আমি তেমনি ভালবাসতাম। দেখেছি তাকে নিয়ে অনেকে পদ্য লেখেন! কিন্তু আমার ভালবাসা তেমন নয়! তিন-তলা বাড়ীর চিল কোঠায় বসে ইলেক্‌ট্রিক পাখার হাওয়া খেয়ে পদ্মাকে প্রিয়া বলে কবিতা লেখার মত আমার ভালবাসা নয়;—আমার নাড়ীতে যে রক্ত বইছে, তার মধ্যে পদ্মার তরঙ্গের স্পন্দন অনুভব করি। আমি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে কামনা করি, যে যদি কখনও পুনর্জন্ম হয়, তবে যেন এই ভাঙ্গন-ধরা নদীর বালুচরেই একখানি সদা-জাগ্রত শঙ্কিত পল্লীভবনেই আমার জন্ম হয়;—জননী-জঠরের অজাত ভ্রূণ-শয়নে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন পদ্মার অবিশ্রাম কলগান শুন্‌তে শুন্‌তে একদিন ধরণীর ধূলি-মাটিতে জেগে উঠি।

বলিতে বলিতে ভদ্রলোকের চোখের কোণে বিদ্যুতের মত এক ফোঁটা অশ্রু চমকাইয়া উঠিল। মুখের আধপোড়া সিগারটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি আর একটা নূতন সিগার ধরাইলেন। মনে হইল, কাহার পরোক্ষ ইঙ্গিতে তিনি আজ এত মুখর হইয়া বকিয়া যাইতেছেন। সমস্ত কথারই যে একটা খুব স্পষ্ট অর্থও হইতেছে, এমনও নহে। তথাপি তাঁহার উচ্ছ্বাসের মূল তাৎপর্যটুকু খুঁজিয়া লইতেও বিলম্ব হইতেছে না। ভদ্রলোক একটু থামিয়া আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—

তাহার সঙ্গে আমার এই অনায়াস মিলনের সম্ভাবনায় আমি আনন্দে বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম। আমার চিরজন্মের স্বপ্ন যে এমনভাবে সার্থক হবে, তা কল্পনা করতেও আশঙ্কায় আমার বুক্‌ কেঁপে উঠ্‌ত। ভাব্‌লাম, যত সত্বর বিয়ে হয়, ততই মঙ্গল। নইলে কখন কি হ'য়ে যায়, কে বল্‌বে? কারণ, অদৃষ্টও বুঝি তেমন নয়।...... একমাসের মধ্যে বিয়ের দিন স্থির হলো।

সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে। আসন্ন উৎসবের আয়োজনে বাড়া আত্মীয়-স্বজনে ভরে উঠেছে। এমন সময় একদিন শেষ রাত্রিতে লোক-জনের কোলাহলে জেগে উঠলাম। শুন্‌লাম সর্বনাশ হয়েছে—আজ দুপুর রাত্রে গাঁয়ের দক্ষিণ-পাড়ার পাড় ঘেঁসে স্টীমার গিয়েছে। রাতারাতিই লোকজন গিয়ে মেপে দেখেছে যে, পাড়ের নীচেই অগাধ জল। নদী এই দিক দিয়ে সহসা ভাঙ্গন ধরেছে। দুই তিন দিনের মধ্যে দক্ষিণ পাড়া ধ্বসে পড়্‌বে। আমাদের পাড়াও আর সপ্তাহ খানেক টিকতে পারে। মুখুজ্যেরা কালই বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছেন।

বাড়ীতে কান্নার রোল উঠ্‌ল। উৎসবের আনন্দ পণ্ড হলো বলে নয়—পুরুষানুক্রমিক বাস্তুভিটার আসন্ন বিনাশের আশঙ্কায়। মা এসে বাবার নিকট কেঁদে পড়্‌লেন, এখন কি হ'বে?

বাবা বল্‌লেন, এত লোকের যা হলো, আমাদেরও তাই হ'বে। তাই বলে নদীর মুখ ফিরাব কি ক'রে? দুই একদিনের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। কালই ফরিদপুর তার করে দিই। ফরিদপুরে আমার দাদা ওকালতি কর্‌তেন।

মা বল্‌লেন, তবে বিয়ের কি হবে?

বাবা বল্‌লেন, আর কেন? মামলার জমিটা যদি নদীতেই গ্রাস করল, তবে চিরশত্রুর সঙ্গে আত্মীয়তা কেন? আমাকে বড় কৌশলে ফেলে কথা আদায় করেছিল। ভগবান তার বিচার করেছেন। মৃত্যুর সময় বাবা বলেছিলেন, বেঁচে থাক্‌তে দক্ষিণ পাড়ার মুখুজ্যে বাড়ীতে পাত পেতো না। এরা আমাদের সাত পুরুষের শত্রু। মরা বাপের কথা অগ্রাহ্য ক'রে তুচ্ছ এক টুক্‌রা চরের জমির লোভে আমি কি-ই না কর্‌তে গিয়েছিলাম!

আর আমি? যে আশাকে দুঃস্বপ্নের মত পরিত্যাগ করতে গিয়েও সফলতার মুহূর্ত সম্ভাবনায় পুনরুজ্জীবিত করে নিয়েছিলাম, তাকে আর কোন্ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মিথ্যা প্রবোধে বঞ্চিত কর্‌তে যাব?

ভাবলাম, এই মিলন সম্ভব হ'তে পারে না। আমাদের আশৈশব প্রেমবন্ধনকে বাহ্য-সংস্কারের রূঢ় আড়ম্বরে আর উপহাস করতে যাব না। আমাদের মিলনের মাঝখানে চিরন্তনী কীর্তিনাশার বিরহ-ইঙ্গিত এসে গিয়েছে। তবে কীর্তিনাশারই জয় হোক্; আমাদের আশৈশব রচিত প্রেম-কীর্তি ধ্বংস ক'রে সে-ই আমাদের উভয়ের মনোমন্দিরে অক্ষয় কীর্তির বেদী আরোহণ করুক।

বাকি রাতটুকু আর কাহারও ঘুম হলো না। গ্রাম শুদ্ধ লোক নদীর পাড়ে ভেঙ্গে পড়ল। বাবা, মা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলেই দক্ষিণ পাড়ার আত্মীয়-স্বজনের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে আস্তে গেলেন। একা আমি আমার পড়বার ঘরের বিছানার উপর চুপ ক'রে প'ড়ে রইলাম।

এমন সময় বাইরের আঙ্গিনায় কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠ্লাম। কেন জানি না, তৎক্ষণাৎ আমার মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আমি যাকে ভালবাসি, যার কথা কয়দিন কেবলি ভাব্ছি, এ' সে না হয়েই যায় না। এক ভাঙ্গন-ধরা গাঙের বালুচরে আমরা প্রেমের খেলাঘর বিছিয়ে বসেছিলাম, আজ জোয়ারের জলে ভেসে যা'বার আগে নিজের হাতেই তা ভেঙ্গে দিয়ে যেতে আমরা একত্র মিলেছি। প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে এক রকম স্থির হয়েও তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কে, পদ্মা ?

পদ্মা শাড়ীর একপ্রান্ত খুঁট্তে খুঁট্তে এসে মাঝঘরে দাঁড়াল। বলল, আমি শুনেছি, তুমি বাড়ী এসেছ, কিন্তু এতদিন এসে দেখা করতে পারি নি—

অনন্ত জীবন ধরে আমি যেন এই মুহূর্তটীর জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। আমি জান্তাম, পদ্মা গ্রাম ছেড়ে যাবার আগে একবার আস্বে—আমার একান্ত নিকটে আসবে; আমাদের বালুচরের খেলাঘর ভেঙ্গে যাবার জন্য হলেও সে আসবে। আর আমি জীবনের একটি মুহূর্তকে অক্ষয় করে রাখ্তে পার্ব।

পদ্মা মুখ নত করে জবাব দিল, আমি শুনেছি, তুমি বাড়ী এসেছ।

আমি কৌতুক করে বলতে গেলাম, আর কিছু শুনেছ? পদ্মা বলল, হাঁ, কিন্তু সে আর সম্ভব হবে না। সেইজন্যই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করে যেতে এসেছি। আমরা আজই বিকালের ষ্টীমারে ঢাকা রওয়ানা হয়ে যাব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আজই?

পদ্মা বলিল, হাঁ, আজই—ঢাকায় আমাদের নূতন বাড়ী তৈরী হয়েছে।

কতক্ষণ দু'জনে আর কিছু কথা খুঁজে পেলাম না। তারপর ধীরে ধীরে ডাক্‌লাম, পদ্মা! পদ্মা মুখ তুলে আমার দিকে চাইল। সেই দুটি চোখের মায়া-ভরা দৃষ্টি আমি এই আট বৎসরের মধ্যে মূহূর্তের জন্য ভুল্‌তে পারি নি। সেই দুটি চোখ আমার বুকের মধ্যে কেবলি আগুনের মত জ্বল্‌ছে। নিঃসঙ্গ জীবনে কতকাল আর এই জ্বালায় জ্বলে মরব, কে জানে?

আমি জিজ্ঞাস কর্‌লাম, পদ্মা, তুমি আনাকে ভুলে যাবে?

পদ্মা বল্‌ল, এই ঘরের নীচে দাঁড়িয়ে বলছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, যদি কোনদিন আমি আমার পদ্মার কথা ভুলে যাই, বাপের বাড়ীর ভিটাটুকুর কথা ভুলে যাই, তবে তোমাকেও ভুলব। কিন্তু সেদিন জীবনে যেন আমার না আসে। তোমার নিকট আজ আমার একটি ভিক্ষা,—তুমি আর আমার সামনে কোনদিন এসো না।

বলে আমার বিছানার উপর উপুর হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। আমি সস্নেহে তাহার মুখখানি তুলে ধর্‌লাম। সেই বিপন্ন ও বড় অসহায় দৃষ্টি-ভরা চোখ দুটি আমার চোখে এক অপূর্ব সম্মোহন জাগিয়ে তুল্‌ল। মুখখানি তুলে ধরে নিবিড় চুম্বনে তা মুহূর্তের জন্য মুদ্রিত করে দিলাম।

ভদ্রলোক থামিলেন। নীচে তিন শত ঘোড়ার শক্তিতে বয়্‌লারের

ইঞ্জিন গর্জাইতেছে। চাকার আঘাতে ঘুমন্ত পদ্মা চকিতে জাগিয়া উঠিয়া একবার মাত্র পাশ ফিরিয়াই যেন আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছে।

চাপরাসি আসিয়া খবর দিল, স্টীমার আসিয়া ভিড়িয়াছে। ভদ্রলোক যেন চমকিয়া উঠিলেন। তারপর দ্রুতপদে কেবিন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না।

কিরণ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। চোখ দুইটি জবাফুলের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে! কপালের শিরা ফুলিয়া ফুলিয়া লাফাইতেছে। আমি ব্যস্ত হইয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া উত্তাপ অনুভব করিতে গেলাম। সে আমার হাত নিঃশব্দে ঠেলিয়া দিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। আমি উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলাম, তোমার নিশ্চয়ই কোন অসুখ করেছে; চেঁচামেচিতে বুঝি এতক্ষণ একটুও ঘুমোতে পার নি! লোকটা একটা আস্ত পাগল!

কিরণ উত্তর দিল না। কেবল স্তব্ধ হইয়া বাহিরের ধূসর আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। স্টীমার আবার ছাড়িয়া দিল। স্টেশনের লাল নীল আলোগুলি ক্রমে পিছনের অস্পষ্ট কুয়াসায় মুছিয়া যাইতে লাগিল। বালুচরের উপর ঢালু আকাশটায় কেবল মিটি মিটি ঘোলাটে তারা—যেন আকাশটা জুড়িয়া জোনাকির ঝাঁক পাখা মেলিয়া উড়িতেছে। পূবের আকাশটা দেখিতে দেখিতে যেন একটু ফিকা হইয়া উঠিল, বুঝি বা এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি ভাঙ্গা চাঁদ উঁকি দিতেছে।

দৃষ্টিহারা

খাদের দুর্ঘটনায় শিবে বাউরী প্রাণে বাঁচিল সত্য, কিন্তু তাহার চক্ষু দুইটি জন্মের মত নষ্ট হইয়া গেল। সকলে মনে করিয়াছিল, শিবের স্ত্রী তাহাকে ছাড়িয়া গিয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে এবং এমন কি, তাহার পাণিপ্রার্থীও কয়েকজন জুটিয়া গেল, কিন্তু বিলির মুখের কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

শিবের স্ত্রী বিলি বলিল, একবার যার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েচি, বেঁচে থাক্‌তে তাকে ছেড়ে অন্যের ঘর কর্‌তে যেতে পার্‌ব না; সুখের দিনে যার ঘর করেছি, আজ তার দুঃখের দিনে তাকে ছেড়ে যাওয়ার অধর্ম সইবে না।

সকলে মনে করিল, ইহা ছুঁড়ীর মনের কথা নহে। ছোট জাতের আবার এত ধর্মাধর্ম জ্ঞান কিসের? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে কি, তাহা ধাওরার সমস্ত বাউরী ও সাঁওতাল কুলির সমবেত চিন্তার ফলেও প্রকাশ পাইল না। এক আধজন বলিল, দুর্ঘটনার জন্য শিবে কোম্পানি হইতে যে কয়টি টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইয়াছে, সেই টাকা কয়টির উপরই বিলির লোভ। একদিন হয়ত এমন দেখা যাইবে যে, অন্ধটাকে শূন্য ঘরে ফেলিয়া তাহার টাকা কয়টি লইয়া অন্য কাহারও সঙ্গে বিলি নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দিন যাইতে লাগিল, তাহারও কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

এমন কি, শিবে নিজে পর্যন্ত বিলির কাছ হইতে এমন ব্যবহার আশা করিতে পারে নাই। যেদিন সে দুইটি চক্ষু হারাইয়া কোম্পানির

হাসপাতাল হইতে পথে বাহির হইয়া আসিল, সেইদিন সে মনে করিয়াছিল যে, এই পথই এখন হইতে তাহার আমরণ অবলম্বন হইল, পূর্বের সংসারের দ্বার চিরদিনের জন্য তাহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; সেইজন্য সে হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া বিলিরও খোঁজ পর্যন্ত লইতে সাহস পাইল না। কিন্তু এমন সময় বিলিই আসিয়া তাহার হাত ধরিল, বলিল, চল্ শিবে ঘরে চল্।

সেদিন বিলির প্রতি কৃতজ্ঞতায় শিবের দুইটি দৃষ্টিহীন চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিয়াছিল। বিলির কথার উত্তরে শিবে কিছুই বলিতে পারে নাই, কেবল তাহার অসহায় হাত দুইটি বিলির উদ্দেশ্যে বাড়াইয়া দিয়া তাহারই প্রদর্শিত পথে তাহাদের পূর্বের সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিলির যত্নে ও শুশ্রূষায় শিবের দেহে পুনরায় অল্পদিনের মধ্যেই পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। দৃষ্টি হারাইয়া প্রথমে সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইয়াছিল এবং নিজেকে বিলির জীবনের উপর অকারণ দুর্ভার মনে করিয়াছিল ; অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সেই সমস্ত সঙ্কোচও কাটিয়া গেল। দৃষ্টিহীনতাও তাহার ক্রমে অভ্যাসের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল এবং নিজে সে সর্বদা অন্ধকার ধাওরার ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও, অতীত জীবনের তাহার সমস্ত স্মৃতি ও অনুভূতি দিয়া নিজের অন্তঃকরণ-খানি সর্বদা আলোকিত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ভোর ছয়টায় বিলি ঘুম হইতে উঠে, সাতটার ভোঁ পড়িতে না পড়িতেই তাহাকে মাথায় ঝুড়ি লইয়া খাদে বাহির হইয়া যাইতে হয়। সে নিজে প্রত্যহ আগের রাত্রের কয়টি বাসি ভাত মুখে দিয়াই বাহির হইয়া যায়। শিবের জন্য জ্বলন্ত উনুনের উপর ভাতের হাঁড়িটা বসাইয়া রাখিয়া যায়। ভাত সিদ্ধ হইলে শিবে ঠাহর করিয়া হাঁড়িটা নামাইয়া লইয়া উনুনটা কাত করিয়া তাহা হইতে জ্বলন্ত কয়লাগুলি ঢালিয়া রাখে। তারপর

নিজেই একেবার ভাত কয়টি হাঁড়ি হইতে বাড়িয়া লইয়া কোনমতে খাওয়াটা সারিয়া লয় এবং সারা দুপুরটা দাওয়ায় বসিয়া মাদলটা লইয়া নিজের মনে মৃদুতালে বাজাইতে থাকে।

একদিন সাঁওতালদিগের কি একটা উৎসব উপলক্ষে কয়লা খাদের কুলিদিগের ছুটি ছিল; শিবে ছুটির কথা জানিত না, সে অভ্যাস মত সকালে ঘুম হইতে বিলিকেও জাগাইয়া দিল। বিলি হাসিয়া বলিল, আজ যে খাদের ছুটি! জানিস্‌নে, আজ ত সেই হিজলগোড়ার মেলার দিন! মনে নেই, গেলবার যে তুই আর আমি গিইছিলাম!

শিবে সহসা যেন কিসের একটা গুরুতর ঘা খাইল। সে ইহার কোনও জবাব দিতে পারিল না, মুহূর্তেই অনুভব করিয়া লইল, গেল বারের এই দিনটি ও এই বারের এই দিনটি এই উভয়ের মধ্যে কি কি এক দুরপনেয় ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। হয়ত বিলি তাহাকে লইয়া মেলায় যাইতে চাহিবে, কিন্তু সে কেমন করিয়া এক হাট লোকের সম্মুখে বিলির হাত ধরিয়া মেলার জনারণ্যের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে? সে অন্ধ, পথ চলিতে গিয়া কাহারও ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িবে, এইজন্য বিলিকেই হয়ত কত অপমানের কথা শুনিতে হইবে! সে প্রাণ থাকিতে ইহা সহ্য করিবে কি করিয়া?

শিবের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া বিলি বলিল, ও, তোর মনে নেই বুঝি, তা না থাক্। আমারও ওসব ভাল লাগে না! তার চেয়ে বরং চল, আজ সারাটা দিন, তোর সঙ্গে বসে বসে একটু গল্প করি। তোকে একটি দিন দুটি ভাত রেঁধে খাওয়াতে পারিনে, আজ নিজের হাতে রেঁধে ভাত বেড়ে তোকে খাওয়াব!

শিবে যেন পরম কৃতার্থ হইল, মেলার প্রসঙ্গটা আর না উঠে, ইহাই সে কামনা করিতেছিল, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই হউক, কিংবা নিজের মনের খেয়াল হইতেই হউক, বিলি ঐ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিল না দেখিয়া শিবে মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া

বাঁচিল। বলিল, কেন, তুই বুঝি মনে করিস্, আমি উনুন থেকে ভাত ক'টি নামিয়ে খেতে পারিনে, অম্‌নি নিত্যি না খেয়েই আছি, না ?

বিলি উঠিয়া বসিল, বলিল, না তুই সব পারিস্, তা কি আর আমি বুঝিনে ? নইলে জ্বলন্ত উনুনের সাম্‌নে তোকে বসিয়ে রেখে যাই আমি কোন সাহসে ?

বিলি যে তাহাকে একেবারে অপদার্থ বিবেচনা করে না, ইহা জানিতে পারিয়া শিবে মনে মনে গর্বিত হইল। হাত দুইটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সম্মুখের দিকে আন্দোলিত করিয়া কহিল, জানিস্, একদিন আমি গিয়ে খাদে নেমে কয়লাও কাট্‌তে পার্‌ব, দেখ্‌বি।

বিলি বলিল, খাদে নেমে তোর আর কাজ নেই, এতেই যথেষ্ট হয়েছে। আর কিছুদিন পর, বুঝ্‌লি, আমিও আর খাদে নাম্‌ব না, তোকে নিয়ে গাঁয়ে চলে যাব ; সেখানে আমাদের জায়গা-জমি চাষবাস আছে, মিছেই এই পোড়ার কয়লা খাদে পড়ে রয়েছি !

ধাওরার সর্দারের ছেলের নাম পান্ত। তাহার বয়স পঁচিশের কাছাকাছি, কিন্তু কাজকর্ম বিশেষ একটা কিছুই করে না, সকাল-বিকাল কেবল একটি বাঁশের বাঁশী হাতে লইয়া নিষ্কর্মার মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সে আসিয়া বিলির ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি লা বিলি, মেলায় যাবিনে ? গেলে আমার সঙ্গে যাস ! বলিয়া শিবের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিল, কিরে তুইও যাবি নাকি ? বলিয়াই একটা অশ্লীল গ্রাম্য প্রবাদ আবৃত্তি করিয়া নিজে নিজেই হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

ধাওরার মধ্যে শিবে এই লোকটাকেই সর্বাপেক্ষা অপছন্দ করিত। আজ এই সময়ে তাহাকেই এই অবস্থায় পাইয়া তাহার আর বিরক্তির অবধি রহিল না, কিন্তু কাহারও সহিত বিবাদ করিতেও সহসা তাহার মনে প্রবৃত্তি জন্মিত না। সে তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি নীচের দিকে নিবদ্ধ করিয়া নীরবে এই অপমান সহ্য করিতে লাগিল।

বিলি বলিল, আমি মেলায় যাব না, তোদের সখ হয় তোরা যা। এই ছুটির দিনটাতেও দুপুর রদ্দুরে মাঠ ভেঙ্গে ছুট্‌তে পারিনে। পান্তু এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইল না, সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল, 'মজেছি সই কালার প্রেমে, গোরাতে আর মন সরে না।'

ইহার কিছুদিন পরে বিলি একদিন সন্ধ্যায় একটু দেরী করিয়া খাদ হইতে ধাওরায় ফিরিল। ইঞ্জিনের কি একটা গোলমালে খাদের মুখে ডুলি কতক্ষণের জন্য ওঠানামা বন্ধ ছিল, সেইজন্যই বিলির নীচ হইতে উপরে উঠিতে বিলম্ব হইয়াছিল। শিবে এত কথা জানে না, সে জিজ্ঞাসা করিল, কিরে, তোর আজ এত দেরী যে?

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বিলির শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহার উপর পথে আসিতে দুই নম্বর ধাওরার মাঞ্ঝির সঙ্গে কি একটা বিষয় লইয়া একটু বচসাও হইয়া গিয়াছিল, নানা কারণেই বিলির মনটা সেদিন ভাল ছিল না, সে একটু রুক্ষভাবেই জবাব দিল, প্রত্যেক কাজে অত জবাব আমি কারুর কাছে দিতে পার্‌ব না।

শিবে বিলির নিকট হইতে এমন জবাব পাইবে, আশা করে নাই। সে তাহার এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহার উত্তরে একটি কথাও সেদিন বলিতে পারিল না।

পরদিন সকালবেলা বিলি কাজে বাহির হইয়া যাইবার পর শিবে তাহার নিত্য অভ্যাস মত বারান্দায় আসিয়া বসিল, পথে পান্তুর গলা শুনিতে পাইয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যারে, পান্তু, তুই সেদিন যে বলেছিলি, কি একটা কাজে আমাকে লাগিয়ে দিতে পারবি, তা যদি পারিস, তবে দেনা, একটা কিছুতে লাগিয়ে। এম্‌নি করে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে যে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল।

শিবের মুখে এই কথা শুনিয়া পান্তু প্রথমটায় মনে মনে একটু প্রফুল্ল হইল। তারপর অত্যন্ত বিজ্ঞের মত বলিল, ঘরের কোণে বসে কি

আর কাজ কর্ম হয় রে, কাণা! কাজ কর্ম কর্‌তে হ'লে এই জোয়ান ছুঁড়ীর আঁচল তোর ছাড়্‌তে হবে।

এই জন্যই সে পান্তকে পছন্দ করে না, কিন্তু তবু আজ নিতান্তই দায়ে ঠেকিয়া নিজেরই একটা কোন ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে ভাবিয়া সে তাহারই শরণাপন্ন হইল। সে মিনতির সুরে বলিল, আমি কানা মানুষ; বিলি দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিয়েচে, তাই ত প্রাণে বেঁচে আছি, তা নয়ত এ্যদ্দিন রাস্তায় পড়ে কবে মরে থাক্‌তাম।

পান্ত জিজ্ঞাসা করিল, তবে আর কাজকর্ম করতে চাস্‌ কেন? দিব্যি ত বৌ খেটে এনে তোকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্চে! শিবে বলিল, নারে না, সে জন্যে নয়, ওর খাটুনির উপর বসে বসে খাওয়াটা বড় অধর্ম হয়, তবু যদি একটা কিছু কর্‌তে পার্‌তাম! এই ত দেখ না, অনেকে ত ঘরে বসে বসে ঠোঙ্গা বানিয়ে দু'পয়সা পায়, আমিও ঠাহর করে করে দু'চারদিন অভ্যেস কর্‌লে কাগজের না হোক্‌ পাতার ঠোঙ্গা তৈরী কর্‌তে পার্‌ব। দিবি আমায একটা যোগাড় করে, কিঁরে পান্ত; দেখ, এই কানা মানুষটার একটা উপকার তুই করে দে, তোর এতে ধর্ম হবে!

পান্তর মন একটু নরম হইল। সে বলিল, পারিস্‌ সে ত ভাল কথা। তা নয়ত, কাণাই হোস্‌, আর যাই হোস্‌, বৌএর রোজকারের উপর বসে বসে খাওয়াটা কি ভাল দেখায়? আমি রেধো মুদিকে বলে আজই সব ঠিক করে দেব।

উৎসাহে শিবে একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল, না, না, তুই আমাকে রেধোর কাছে এক্ষুণি নিয়ে চল, আজই কথা পাকাপাকি হয়ে যাক্‌, দেখ ভাই, তুই আমার একটা উপকার করে দে।

পান্ত অগত্যা শিবের হাত ধরিয়া মুদির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল, পথ চলিতে চলিতে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাহিতে লাগিল, 'ফোটা ফুলে ঘুণ ধরেছে, ভমরের আর বুক ভরে না।'

সেদিন বিলি সন্ধ্যাস খাদ হইতে ফিরিয়া শিবের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। দেখিল, একরাশ কাগজের মধ্যে সে বসিয়া অত্যন্ত দ্রুত ছোট ছোট কাগজের কতকগুলি টুক্‌রা হাত দিয়া চাপিয়া চাপিয়া ভাঁজ করিতেছে, আর ঘরময় সমস্ত কাগজ ছড়াইতেছে।

বিলি স্তম্ভিত হইয়া ঘরের চৌকাঠের উপরই দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মাথা হইতে শূন্য ঝুড়িটা নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে, ব্যাপার কি? ঘরে কাঁচা কয়লার আগুন রেখে যাই, কোন্‌-দিন কাগজে আগুন ধরিয়ে যে পুড়ে মরবি।

শিবে যেন সেই কথায় কর্ণপাতই করিল না, মাথা গুঁজিয়া আপন মনে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

বিলি শিবেকে গিয়া অগত্যা হাত দিয়া ঠেলা দিয়া কহিল, কি রে, কি? কথা কইচিস্‌ না যে!

শিবে একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া কহিল, দেখ, কাজের সময় তুই আমাকে এমন বিরক্ত করিস নি'।

বিলি এইবার হাসিয়া ফেলিল, আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। বলিল, ইস, ভারি যে কাজের লোক হয়ে পড়েচিস, দেখ্‌চি! নে রাখ, আমার কাজের আর দরকার নেই। তবু যদি চোখ দুটো থাকত! বলিয়া তাহার হাতের কাগজগুলি কাড়িয়া লইয়া সমস্ত কাগজের স্তূপ দুই হাতে লইয়া বারান্দায় আনিয়া রাখিল। বলিল, নে নে আমি মরে গেলে তুই তারপর এই কানা চোখ নিয়ে খেটে মরতে যাস। আমি বেঁচে থাকতে নয়।

শিবে কতক্ষণ আর কোন কথা কহিতে পারিল না, তাহার দৃষ্টিহীন দুই চক্ষু দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পরের দিন দুপুর বেলা পান্তু শিবের কাজের তত্ত্ব লইতে আসিল। শিবের সব কথা শুনিয়া বলিল, ইস, বৌএর সোহাগে যে আর বাঁচিনে! নিজে খেটে মরবে, তবু সোয়ামীর গায়ে আঁচড়টি লাগ্‌তে দেবে না। কিন্তু

দিন কি এম্‌নি যাবে ? নিজের ভাল চাস ত সরে পড় ! বলিয়া মনে মনে কি বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গেল।

পান্তুর বাপকে সকলেই বিলেত সর্দার বলিয়া ডাকে। খাদের কোন এক বড় সাহেবের সঙ্গে একবার বিলাত রওয়ানা হইয়া নাকি সে বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, ইহার পর হইতেই তাহার এই নামকরণ হইয়াছে। সে লোক মন্দ নয়, তবে যেখানে নিজের স্বার্থের সঙ্গে যোগ আছে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে সে একটু নীচতাও দেখাইয়া থাকে। সে সমস্ত ধাওরাটার মোড়ল, দুই তিন শত বাউরী ও সাঁওতাল কুলি তাহারই ইঙ্গিতে ওঠে বসে।

একদিন দুপুর বেলা সে শিবের ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, শিবেকে বারান্দায় দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। বলিল, কি রে শিবে, এ তোর কি আক্কেল রে ? বসে বসে বৌটার ঘাড় ভাঙচিস্। তুই পুরুষ মানুষ হয়ে একটা মেয়ে মানুষের রোজকারের উপর খেতে তোর লজ্জা করে না ?

শিবে তাহার এই কথায় রাগ করিল না। বরং হাসিয়া বলিল, লজ্জা করত, যদি চোখ দুটো থাকত ! কাণার আবার লজ্জা সরম কি রে ?

সর্দার তাহার এই রসিকতা উপভোগ করিল না। একটু উগ্র হইয়াই কহিল, না, না, শিবে, হাসির কথা নয় ! দে না তুই মেয়েটাকে ছেড়ে, ও আর একটা বিয়ে থা করে দু'জনে মিলে রোজকার করুক ! আর তোর ভাবনা কি ? রেলের ইষ্টিশনটার পেছনে আঁচলটা পেতে যদি দু'দণ্ড বসে থাকিস্, তাহলে তোর দিনের রোজকার হয়ে যাবে।

শিবে প্রথমে তাহার কথাটা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু অর্থোপার্জনের এমন কি একটা সহজ সরল উপায় আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিয়া লইবার তাহার লোভ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি, কি বলচিস ? দিনের রোজকার ?

সর্দার বলিল, হ্যারে, চিন্‌তিস্‌ ত পাঁচ নম্বরের ভীমা মাঝিকে, সেই যে সে'বার খাদের নীচে একটা চোট খেয়ে যার দুটো পা-ই উড়ে গেল, কিন্তু উঠল সে বেঁচে! তারপর থেকেই ত ও এ ব্যবসাই নিয়েছে! দেখবি ত একদিন গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করে, নিত্যি সে কত পয়সা রোজগার করে?

শিবে জানে ভীমা স্টেশনের পথে একটা গাছের নীচে বসিয়া ভিক্ষা করে। তাহার কথা মনে হইতেই শিবের মনটা সহসা শিহরিয়া উঠিল। নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি হইতে যেন অগ্নির জ্যোতি ঠিকরিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার এই দুর্ঘটনার কিছুদিন আগে সে একবার বিলিকে লইয়া স্টেসনের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহারা ভীমাকে সেদিন দেখিয়া আসিয়াছিল,—গাছের নীচে ধূলার উপর সে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, উরুর মাঝখান হইতেই পা দুইটি কাটা, এই পর্যন্ত পা দুইটি সে নগ্ন করিয়া আকাশের দিকে তুলিয়া রাখিয়াছে। হামাগুড়ি দিয়া তাহার হাঁটিতে হয়, সেই জন্য সেই কাটা পায়ের অগ্রভাগে ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের পটি বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অনবরত এই ভাবে চলিতে চলিতে হয়ত তাহার ঐ স্থানে ঘা হইয়া পাঁচিয়া উঠিয়াছে, তিন চারটা মাছি তাহার চারদিকে ভন্‌ ভন্‌ করিরা উড়িয়া বেড়াইতেছে। পথিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য সে তাহার মাথাটি অনবরত ডান হইতে বামে ও বাম হইতে ডানে একটি দম দেওয়া পুতুলের মত দ্রুতবেগে নাড়াইতেছে। চিৎকার করিতে করিতে তাহার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শিবেকে দেখিতে পাইয়া একবার ঘাড় বাঁকাইয়া সে যে কি বলিতে গেল, তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারা গেল না। বিলি ঘৃণায় তাহার দিকে তাকায় নাই, বলিয়াছিল, চল্‌ শিবে, ঘরে চল্‌, ওদিকে যাস্‌নি', ঐ পথের মড়াটার সঙ্গে আবার তোর কি? ভীমাকে একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিতে দেয় নাই, টানিয়া তাহাকে ধাওরায় লইয়া আসিয়াছে।

শিবে কোন কথা বলিতেছে না দেখিয়া সর্দার নিজেই বলিল, ভেবে

দেখ, ভাল যা বুঝিস, তা কর, কিন্তু তোর নিজের ভালর জন্য জোয়ান ছুড়ীটার বয়সটা খাস্ না। দু'টি দিন বাদে ওকে আর কেউ বিয়েও কর্‌তে চাইবে না। বলিয়া সর্দার নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সেদিন বিলি খাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে শিবে তাহাকে বলিল, তুই যে আমাকে কোন কাজকর্ম কর্‌তে দিবিনে, আমি যে অম্‌নি বসে থাক্‌লে আর ক'দিন বাদে বেতো রুগী হয়ে উঠব।

বিলি হাসিয়া বলিল, হলে ত ভালই হবে, আমি রাত্তিরে কাজ থেকে ফিরে তোর গায়ে বাঘের তেল মালিশ কর্‌ব।

বিলির ঐ স্বভাব। কোন জিনিসটাকে সে তলাইয়া দেখিবে না। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথাও সে তাহার লঘু হাস্যে উড়াইয়া দূর করিয়া দিবে। তাহার সঙ্গে শিবে কোন কাজের কথা বলিয়া পারিয়া উঠে না, সেইজন্যই প্রায়ই বলিতে যায়ও না। কিন্তু যে সময় একান্তই না বলিলেই নয়, তখনও বলিয়া ফেলিয়া এইভাবে অপ্রস্তুত হইয়া যায়।

শিবে তাহার কথার ভঙ্গিতে একটু গুরুত্ব আরোপ করিয়া কহিল, না, না, তামাসা নয়, বিলি, তামাসা নয়। আমি সত্যি বল্‌ছি, আমার অম্‌নি কুঁড়ের মত বসে থাক্‌তে ভাল লাগে না, আমি পাগল হয়ে যাব।

বিলি উনুনে কাঁচা কয়লা দিতে দিতে বলিল, তবে যা না, ভীমার পাশে বসে গিয়ে ভিক্ষে কর!

শিবে এইবার আঘাত পাইল, সে জানে তাহার কাজের কথায় বিলি রাগ করে, কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা তুলিয়া তাহাকে খোঁটা দিবে, ইহা সে কোনদিন আশা করিতে পারে নাই। সে সেদিন আর কোন কথা কহিল না সত্য, কিন্তু তাহার মনটা বিলির এই কথাটাকে উপহাস বলিয়াও মনে করিয়া লইতে পারিল না।

তিন চার দিন পর বিলেত সর্দার আবার আসিল। শিবেকে

একেলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরে, কথাটা ভেবে দেখেছিলি? তুই হয়ত মনে করিস, বিলি কিছু মনে করবে, না? তা তুই এক কাজ করলেই ত পারিস, বিলি কাজে বেরিয়ে গেলে, আমি তোকে না হয় হাত ধরে গিয়ে স্টেশনের পথে ভীমার পাশেই দাঁড় করে রেখে আসব, তারপর বিকেল বেলায় বিলি ফেরবার আগেই গিয়ে নিয়ে আস্ব। আমায় কিন্তু আদ্দেক বখ্রা দিতে হবে, বুঝলি? বলিয়া নিজের মনে হাসিতে লাগিল। তারপর হাসিতে হাসিতেই বলিল, কিন্তু তুইও ওরকম করবি নাকি? চিনিস্ ত তুই নম্বরের হেঁছুকে, ওর ডান হাত আর ডান পা'টা যখন নোলা হয়ে গেল, তখন আমিই তাকে পরামর্শ দিয়ে ভিক্ষেতে পাঠাই। আমিই তাকে হাত ধরে নিয়ে স্টেশনের কাছে দাড় করিয়ে দিয়ে আস্তাম, তার সঙ্গেও এই আধাআধি বখরার কথাই ছিল। বজ্জাতের বেটা একদিন কি করলে জানিস্? পাছে আমাকে ভাগ দিতে হয়, তাই একটা একআনি রাখল মুখের ভেতর পূরে; সেদিন পয়সা কম হল বলেই আমার সন্দ হল। বল্লাম, খোল দিকি তোর মুখ। দেখি তোর জিভের নীচটা। কিন্তু সে বজ্জাত মুখই খোলে না। মার্লাম গালে ঠাস্ করে এক ঘা, অম্নি আনিটা মুখ থেকে ঠিক্‌বে বেরিয়ে পড়ল গিয়ে ধূলোর উপর। বলিয়া নিজের হাসিতে নিজেই ভাঙ্গিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সর্দারের এই সমস্ত কথার জবাবে শিবে একটি কথাও বলিল না। সর্দার সেদিন ক্ষুণ্ণ হইল, বলিল, দেখ, তোর ভালর জন্যেই বলেছিলাম, আর শুধু তোরও নয়. আচ্ছা বল দিকিন, কেন এই ছুঁড়ীটার ঘাড়ের উপর বসে বসে খাচ্চিস্? ওর ভবিষ্যৎটা তুই এম্নি ভাবে নিজের সুখের জন্য নষ্ট করে দিচ্চিস্? দে ওর হাতের নোয়া খুলে, ও গিয়ে আর একটা বিয়ে করে সুখী হোক্।

কোন স্থির জবাব না পাইয়া সর্দার সেদিনও চলিয়া গেল। কিন্তু অভিসন্ধিটাকে সে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারিল না।

সেদিন কাজ হইতে ফিরিয়া বিলি দেখিল, শিবে হাড়ি হইতে ভাত কয়টি নামাইয়া খায় নাই, মাড়শুদ্ধ ভাত হাঁড়িতে শুষ্ক কাদার মত শক্ত হইয়া রহিয়াছে।

বিলি আশ্চর্য হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরে শিবে, তোর কি কোন অসুখ বিসুখ করেছে, ভাত খাস্‌নি যে?

শিবে বলিল, তোর রোজগারের ভাত আর আমি খাব না, আমি না খেয়ে খেয়ে পচে গলে মর্‌ব, তবু না! বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভাসিয়া উঠিল।

বিলি অপরাধিনীর মত তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া তাহার পিঠ খানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, কেন, আমিত তোকে সে জন্যে কিছু বলিনি!

শিবে বলিল, তুই বলিস্ নি, কিন্তু গোটা ধাওরাটার লোকে বলে, আমি বসে বসে তোর রোজকার খাচ্চি, তুই আর একটা বে কত্তে পাত্তিস, তোকে কত্তে দিচ্চিনে, এসব আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না, বলে দিচ্চি কিন্তু তোকে!

বিলি এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ও, এই কথা! তা ওরা বলুক না, ওদের কথায় কি আসে যায়? ভেবে দেখ দিকিন্, আমি যখন ছোট ছিলাম, খাদে যখন নাম্‌তে পেতাম না, তখন তুইই ত আমায় একা রোজকার করে খাওয়াতিস্। সেজন্যে লোকের কাথায় কি আর আমি উপোস করে থাক্‌তে পাত্তাম।

ইহার কিছুদিন পর কুলিদিগের মধ্যে এক সরকারী ইস্তাহার জারি হইল যে, খাদের নীচে আর কোন স্ত্রীলোক নামিতে পারিবে না, তবে যাহারা স্বামী স্ত্রীতে কাজ করিবে তাহাদের স্বামীরা নীচে নামিয়া কাজ করিবে এবং তাহাদের স্ত্রীরা খাদের উপরেই সামান্য দু'চারটি কাজ করিলেই তাহাদের পুরা হাজিরা পাইবে।

সন্ধ্যার সময় কাজ হইতে ফিরিতেই ধাওরার সর্দার আসিয়া বিলিকে

এই সংবাদ জানাইয়া গেল এবং মৌখিক উপদেশও দিয়া গেল, এখনও একটা কিছু ব্যবস্থা কর বিলি, এই কানাটার পেছনে থেকে আর তোর জীবনটা নষ্ট করিস্ নি'।

বিলি কি করিবে কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না, একটা ছেলেপিলেও যদি থাকিত, তবুও সাহেবকে বলিয়া কহিয়া মায়ে-ছেলেতে কাজের এইভাবে ভাগাভাগি করিয়া লইতে পারিত। অথচ এই নিয়মই যদি চালু হয়, তবে হয়ত ধাওরা হইতে তাহাকে শিবেকে লইয়া বাহিরই হইয়া যাইতে হইবে। একটা অন্ধকে লইয়া সে দাঁড়াইবারই বা স্থান পাইবে কোথায় ?

শিবেও কথাটা শুনিল। কিন্তু এই বিষয়ে সে বিলিকে যে একটা পরামর্শ দিয়া সাহায্যও করিবে, এমন শক্তিও তাহার ছিল না। সে দুই হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া মাটীর দিকে তাহার নিষ্পলক চক্ষু দুইটি স্থির করিয়া রাখিল।

শিবে বিলির মনের কথা বুঝিতে পারিল। সে জানে, বিলি তাহাকে ছাড়িতে চাহে না, অথচ তাহার মত একটা অন্ধকে লইয়া বাহির হইয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে চিন্তার অতীত। আর সে নিজের দিক হইতে ইহাই ভাবিতে লাগিল যে, বিলিকে লইয়া সে গৃহে বাস করিতে পারে, কিন্তু পথে বাহির হইতে পারে না। পথে দশজন অপরিচিত লোকের সম্মুখে বিলি একটা অন্ধকে লইয়া হাত ধরিয়া বেড়াইবে, অন্ধ হইয়াও শিবে তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। বিলির ইহাতে অপমান আছে, দুঃখ আছে, নিজের দিক হইতে অনেকখানি ত্যাগ আছে। শিবে সামান্য অন্ধলোক, সমাজের আবর্জনা, মানবের পাপ,—সে'ত মরিয়াই গিয়াছিল, শুধু গিয়াছিল কেন, সেত মরিয়াই আছে, তাহার আবার সুখ কি ? তাহার সহিত কি আর একটা স্বচ্ছন্দ জীবনকে আনিয়া জড়িত করা কোন দিক দিয়া সঙ্গত হয় ? শিবে মনে মনে এক সঙ্কল্প স্থির করিল,— তাহার কথা চিন্তা করিয়া সে যতই নিজের দিক হইতে ভয়ে অসাড় হইয়া

যায়, বিলির দিক হইতে চিন্তা করিয়া ততই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

রাত্রে এই প্রসঙ্গে বিলি শিবের সঙ্গে কোন কথাই বলিল না, নিয়মিত রান্নাবান্না করিয়া ভাত বাড়িয়া তাহাকে খাওয়াইয়া মাদুরটা বিছাইয়া দু'জনে শুইয়া পড়িল।

খাদে বারটার ভোঁ অনেকক্ষণ হয় পড়িয়া গিয়াছে। শিবের চোখে সেদিন কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। সে বুঝিতে পারিল, বিলি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, প্রত্যহই তাহার শুইবা মাত্রই ঘুম আসিয়া যায়। শিবে সারাদিন নিষ্কর্মার মত ধাওরায় পড়িয়া থাকে, সেই জন্য প্রত্যহই ঘুম আসিতে তাহার বিলম্ব হয়।

কিছুক্ষণ এ' পাশ ও' পাশ করিয়া শিবে বসিল, সে ইহা নিশ্চিত জানে যে, দু'চারদিনের মধ্যেই তাহাকে ধাওরা হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে, এতদিন বিলি তাহার পথ আগলাইয়া রাখিয়াছে, এখন বিলিরও স্থান নাই, শুধু তাহারই জন্য বিলিকেও আজ আশ্রয়হীন হইতে হইবে। শিবে দুঃখী হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিযা এতখানি স্বার্থপর সে কিছুতেই নহে। যাহাকে সে এতদিন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার মত একটা অপদার্থের সামান্য সুখের জন্য তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের পথে সে কাঁটা হইতে পারে না। সে নিজে চিরদিন দুঃখে পচিলেও, ইহা শুনিয়াও সে সুখী হইবে যে, যাহাকে সে ভালবাসিত, সে সুখে আছে। এই ত তাহার সুখ!

শিবে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া ঠাহর করিয়া বিলির পাশে বসিল। বিলির যৌবন-পুষ্ট দেহে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য ভরা ভাদ্রের কলহাস্য উচ্ছ্বসিত নদীর মত পরিপূর্ণ আনন্দে অবিরত দোলা খাইয়া ফিরিতেছে। অন্ধ শিবে কল্পনার চক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিল। তাহার গায়ে হাত পড়িতেই শিবে একবার চমকিয়া উঠিল, কি

শীতল শ্রান্তি অপহারী সেই স্পর্শ! তাহার বিবাহিত জীবনের এই দীর্ঘ দশ বৎসর সে এই স্পর্শের মধ্যে নিজের জীবনের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়াছে। আজ সে এই স্পর্শ হইতেই স্বেচ্ছায় নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া জীবনের তীব্রতম জ্বালার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

শিবে ধীরে ধীরে নিদ্রিতা বিলির হাত দুইখানি খুঁজিতে লাগিল। দশ বৎসর পূর্বে বিবাহের রাত্রে যে নোয়া দুইগাছি সে বিলির হাতে পরাইয়া দিয়াছিল, একটি একটি করিয়া সেই নোয়া দুইগাছি সে বিলির হাত হইতে খুলিয়া দিল। তারপর দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটি তাহার নিদ্রিত মুখের দিকটা ঠাহর করিয়া লইয়া তাহার দিকে স্থির করিয়া রাখিল; আজ তাহার সমস্ত জীবনী শক্তি দিয়া যেন সে তাহার লুপ্ত দৃষ্টি শক্তিকে ফিরাইয়া আনিতে চায়। তাহার দেহের সমস্ত সক্রিয় শিরা উপশিরা ও স্নায়ুমণ্ডলী যেন তড়িৎবেগে তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু-কোটর দুইটিতে তাহাদের সমগ্র শক্তি প্রেরণ করিতে লাগিল, তাহার মনে হইল, তাহার সমস্ত দেহখানি অসাড় হইয়া কেবল তাহার চক্ষু দুইটি মুহূর্তের জন্য দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠুক, তারপর চির অন্ধকারকেও আর সে ভয় করে না।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিল, তারপর শিবে উঠিযা দাঁড়াইল, কোনমতে তাহার লাঠিগাছি খুঁজিয়া লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের ঘরের পাঁচ ছয়খানি ঘর পরেই পান্তুদের ঘর। সে কোনমতে পান্তুর ঘরের সম্মুখটা ঠাহর করিয়া লইয়া পান্তুকে ডাকিয়া তুলিল।

পান্তু তাহাকে এত রাত্রে ঘরের বাহিরে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে, তুই এত রাত্রে এখানে যে?

শিবে তাহার হাত দুইটি পান্তুর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,

পান্তু, ভাই, তুই আমার একটা উপকার কর। তুই আমাকে হাত ধ'রে কোনমতে ইস্টিশনে নিয়ে একটা কোলকাতার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়। শুনেচি, সেখানে কাণা খোঁড়ারা দু'পয়সা ভিক্ষে পায়! আর কাণা খোঁড়ার ত গাড়ীরও ভাড়া লাগে না!

পান্তু স্তম্ভিত হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর বিলি? সে তোকে যেতে দিলে?

শিবে অনুচ্চস্বরে কহিল, না রে, সে আমায় যেতে দেয় না, তাই ত পালিয়ে যাচ্ছি, সে ঘুমিয়ে আছে।

পান্তু মনে মনে কি একটা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, বলিল, তা'হলে চল, আর দেরী করিস্ নি'। এখনি একটা গাড়ী আসবার সময়।

পথ চলিতে চলিতে শিবে সহসা একবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মাঝপথে বসিয়া পড়িল। দুই হাতে কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, আমার একটা কথা রাখবি, পান্তু! দেখ আমি কাণা মানুষ, আমার আশীর্বাদে তোর ভাল হ'বে।

পান্তু জিজ্ঞাসা করিল, বল, কি কথা? শিবে বলিল, তুই বিলিকে বিয়ে করিস্। আমি নিজের হাতে তা'র হাতের নোয়া খুলে দিয়ে গেছি।

পান্তুর চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, তা' হ'লে তুই সুখী হবি রে, শিবে?

শিবে বলিল, হ্যা, আমি সত্যি বল্‌ছি, তা'হলেই আমি সুখী হ'ব; ও সুখে আছে, একথা ভেবেও আমি সুখে থাক্‌ব।

পান্তু বলিল, তুই যদি সুখী হ'স, তা' হ'লে আমি তাই কর্‌ব। শিবেকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া পান্তু যখন ধাওরায় ফিরিল, তখনও অনেক রাত্রি।

অখ্যাতি

পীরপুর গাঁয়ে একঘর চোর বাস করিত। চোরেরা দুই ভাই। জ্যেষ্ঠের নাম সাধুচরণ,—গোপনে তাহাকে সকলে সাধুচোরা বলিয়া ডাকে; কনিষ্ঠের নাম মোক্ষদা। সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠের নামের সহিত মিল রক্ষা করিয়া তাহারও নাম রাখা হইয়াছিল মোক্ষদাচরণ, কিন্তু তাহার পূর্ণ নামটি এখন সকলে বিস্মৃত হইয়াছে; সেও গোপনে মোক্ষদা চোরা বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু তাহার চিরদিনই এমন ছিল না; তাহাদের চৌর্য-জীবনের একটু ইতিহাস আছে—তাহা আজ খুলিয়া বলিতে কোন আপত্তি দেখিনা।

সাধুচরণের পিতা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। গলায় কণ্ঠি, অঙ্গে ফোঁটা, হাতে হরিনামের ঝোলা লইয়া যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামোচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যধামে গমন করেন, তখন তাঁহার পুত্র দুইটি নিতান্ত শিশু। মোক্ষদার জন্ম দিয়া জননী সূতিকাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তদবধি তাহাদের এক দূর সম্পর্কীয়া পিসিমা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছিলেন। এই পিসিমাও আজ জীবিত নাই, তাহাদের পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর তিনিও একবার গ্রামের কয়েকজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রা করেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই; ফিরিয়া না আসিবার জন্য তিনি বাড়ী হইতে বাহির হন নাই, কিন্তু কি একটা অপঘাত ঘটিয়া পথিমধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। সাধুচরণের বয়স তখন দশ বৎসর কি এগার বৎসর, মোক্ষদার বয়স সেই অনুপাতেই কিছু কম। তাহাদের দেখাশুনা করিবার সংসারে আর কেহ রহিল না।

সংসারে কিছুরই অভাব ছিল না। বিঘা কয়েক জমিতে সম্বৎসরে যে ফসল ফলিত, তাহাতে তাহাদের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। বাড়ীর ভিতর আঙ্গিনায় একটি পুঁইমাচা, ঘরের চালে গুটিকতক কুমড়া, বাখারির বেড়ার মধ্যে গুটিকতক বেগুনের চারা তাহাদের বৎসরের অভাব দূর করিত। বাহির আঙ্গিনায় একটি দোলমঞ্চ ও একটি তুলসীমঞ্চ নানারকম উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামের দশজনের আকর্ষণের স্থান হইয়া পড়িত।

পিসিমার মৃত্যুর পর দশ এগার বৎসর বয়সেই যখন সাধুচরণ কনিষ্ঠকে লইয়া সংসারে একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল, তখন সে অনন্যোপায় হইয়া গ্রামের এক স্বজাতি-কন্যার পাণিপীড়ন করিল। কন্যার বয়স ছয় বৎসর। এই সূত্রে তাহার শ্বশুর পরিবারের লোক তাহাদিগকে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। কিন্তু কন্যার বয়স যখন দশ বৎসর, তখনই সে কন্যা পেড়ে শাড়ী পরিয়া সিঁথিতে সিঁদুর লইয়া চিতা-শয্যায় শয়ন করিল। সেই হইতে সাধুচরণ পৈতৃক হরিনামের ঝোলা হাতে লইল, গলায় তুলসীর মালা পরিল এবং নিজের গৃহ হইতে তাহার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কিত সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া সেখানে হরিসভার আসন পাতিল। সকলে পরামর্শ দিল; সাধু, আবার বিবাহ কর; সাধু বলিল, ঐ কথা মুখে আনিও না, কপালে সুখ থাকিলে কাহারও দুইবার বিবাহ করিতে হয় না, করিলেও সুখ হয় না। ষোল বৎসর বয়সের বালকের মুখে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সকলে হাসিল, কিন্তু সেদিন কেহই বুঝিতে পারিল না যে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে তাহার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।

সাধুচরণ কনিষ্ঠকে লইয়া নিজের বিষয় আশয় দেখাশোনা করে এবং বাড়ীতে বসিয়া অবসর মত হরিনাম করে, কাহারও দুয়ার মাড়ায় না। কিন্তু গ্রামবাসীর ইহা ভাল লাগে না। তাহারা কেন নানা রকম অসুবিধার কথা লইয়া তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া সর্বদা গুন্‌গুন্ করে না, জ্যেষ্ঠ আসিয়া কনিষ্ঠের নামে, কনিষ্ঠ আসিয়া জ্যেষ্ঠের নামে নানারকম অভিযোগ তুলিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য তাহাদের

সুচিন্তিত পরামর্শ প্রার্থনা করে না, ইহা তাহাদের একেবারেই ভাল লাগে না। যখন কোন বিষয়ে তাহাদের পরামর্শ কেহ চাহিল না, তখন তাহারা নিজেরাই তাহাদের নানা রকম পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইল। তাহারা এখন ইচ্ছা করিলে দুইজনেই বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারে, সাধু কেন বিবাহ করে না, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না, সাধু বিবাহ না করিলে মোক্ষদার বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না। সাধু নিজেও এ বিষয়ে কিছু বলে না। চারিদিককার কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকের দল ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের কোন পরামর্শই তাহারা কানে তুলিল না।

সাধুচরণ মনে প্রাণে বৈষ্ণব; কিন্তু মোক্ষদা একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। ছেলেবেলা হইতেই তাহার গায়ে অসুরের মত শক্তি; বছিরদ্দি মোড়ল আড়াই শত টাকা দিয়া একটা এঁড়ে কিনিয়াছিল, একদিন মোক্ষদা দেখিল, ছয়জন লোক ইহার নাকে, শিঙে ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া ইহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মোক্ষদা গিয়া কহিল, দে দিকিন আমার হাতে, আমি একাই নিতে পার্‌ব।

বছিরদ্দি তামাসা দেখিবার জন্য সকলকে বলিল, দে দড়িগুলো ওর হাতে, দেখুক মজাটা।

মোক্ষদা ছয়জনের ছয়টা দড়ি একা নিজের হাতের মুঠোতে লইল। শিং বাগাইয়া এঁড়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। টানে টানে মোক্ষদার দুই বাহুর পেশী ফুলিয়া উঠিল। বুক ফুলিয়া ঢালের মত প্রশস্ত হইল। বছিরদ্দির সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল দেখিয়া একবার সে এঁড়ের পেছন দিকটায় হাতের পাচন দিয়া খোঁচা মারিল, এঁড়ে পুচ্ছ তুলিয়া শিঙ বাগাইয়া ডুকরাইতে ডুকরাইতে সম্মুখের দিকে ছুটিল, মোক্ষদা ছয়গাছি দড়ি চক্ষের পলকে নিজের কোমরে জড়াইয়া লইল; তারপর বুক টান করিয়া পেছনের দিকে একটু হেলিয়া যে দাঁড়াইয়া রহিল, এঁড়ে একতিলও অগ্রসর হইতে পারিল না, নিষ্ফল আক্রোশে ঠাঁয়

দাঁড়াইয়া শিঙ্ ও খুর দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া কেবল ডুকরাইতে লাগিল। বছিরদ্দি তাহার কোমর হইতে দড়ি কয়গাছি খুলিয়া তাহার সঙ্গীদের হাতে দিল, মোক্ষদার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, সাবাস্ জোয়ান, বাপ্ কা বেটা!

মোক্ষদা তাহার পিতার কথা ভাল করিয়া স্মরণ করিতে পারে না, তথাপি বছিরদ্দির মুখে তাহার পিতার উল্লেখ শুনিয়া তাহার বুকটা আরো ফুলিয়া গেল, মাথাটা একটা ঝাকুনি দিয়া যে চুলগুলি আসিয়া কপালে ও চোখে মুখে পড়িয়াছিল, তাহা পেছনে সরাইয়া লইল, তারপর কপাল হইতে হাত দিয়া ঘাম মুছিয়া ফেলিল।

সাধুচরণকেও শক্তিমান পুরুষই বলা যায়। মাথার বাব্‌রি কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বলিষ্ঠ পেশল বাহু, উন্নত লোমস বক্ষ ও ক্ষীণ কটি। সর্বদা কঠোর পরিশ্রমে দেহ লাবণ্যহীন, মার্জিত লৌহস্তম্ভের মত দৃঢ় ও কঠিন।

ইতিমধ্যে নিকটবর্তী গ্রামে একটা বড় রকমের ডাকাতি হইয়া গেল। ডাকাতেরা সংখ্যায় বেশী ছিল না, কিন্তু তথাপি অনেক নগদ টাকা লুটিয়া লইল। গৃহস্থের সেগুন কাঠের মজবুত দরজা ভাঙ্গিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল, ঘরের লোকজনকে পিঠমোড়া বাঁধিয়া সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা ও কিছু গহনা লইয়া পলাইয়া গেল। কোন খুন জখম হইল না সত্য, কিন্তু এই রকম ঘটনা ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে আর কোনদিন ঘটে নাই বলিয়া সাধারণের মধ্যে ইহা লইয়া বড় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সহর হইতে পুলিশ সাহেব তদন্তে আসিলেন। আশে পাশের গ্রামের সমস্ত দাগী চোরদিগের তলব পড়িল। তাহারা সকলে করজোড়ে জানাইল, এমন দুঃসাহসিক কাজ তাহারা কখনও করিতে পারে না।

পুলিশ সাহেব ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোরা পারিস্‌নে, ত কে পারে, বল! শহর থেকে ডাকাত এসে এ কাজ ক'রেছে?

দাগীরা পুনরায় জোড়হাত করিয়া জানাইল, এই বিষয়ে তাহারা কিছুই জানে না। গ্রাম্য চৌকিদারও তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া জানাইল, ঘটনার দিন রাত্রে প্রত্যেক দাগী তাহাদের নিজ নিজ ঘরে হাজির ছিল।

পুলিশ সাহেব এইবার চৌকিদারকে ধমকাইয়া উঠিলেন, তা'হলে তুই-ই বল, কার উপর সন্দেহ হয়?

চৌকিদার বিনীতভাবে বলিল, হুজুর, যদি ভরসা দেন, তা'হলে বলি, এসব নোতুন হাতের কাজ।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম?

চৌকিদার জবাবে যাহা জানাইল, তাহার সারমর্ম এইঃ যাহারা সিঁদকাঠি মাত্র সম্বল করিয়া চিরদিন কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা কখনও দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লইতে পারে না; অতএব ইহাদের তলব দেওয়া বৃথা। নোতুন লোকে এ কাজ করিয়াছে, যাহারা সন্দেহের অতীত, তাহাদের মধ্যেই দোষীর সন্ধান করিতে হইবে। একজন বৃদ্ধ দাগী সাহসে ভর করিয়া বলিল, হুজুর, আপনাদের ঐ ত দোষ, একবার যার পিঠে ছাপ পড়ল, তাদেরে আপনারা ভুল্‌তি পারেন না। জোয়ান বয়সে একবার কি করেছি—এখন নাতি নাৎনী নিয়ে ঘর করি—সে কথা মনেও করিনে, কেবল আপনারাই ডাকাডাকি হাঁকাহাকি ক'রে, তা' মনে করিয়ে দেন! আমরা যা' ভুলতি চাই, আপনাগোর লোক তা' ভুলতি দেবে না! ইদিকে নোতুন লোক যে কত মাথা তুলে উঠেছে, তার খোঁজ খবরও নিবেন না।

পুলিশ সাহেব ধমকাইয়া উঠিলেন, যা' তোর আর ওকালতি করতে হবে না; যা, তোরা বিদায় হ'। দাগীরা একে একে সেলাম করিয়া বিদায় লইল।

পুলিশ সাহেব পথের ধারেই তদন্তের অপিশ খুলিয়াছিলেন।

দাগীরা বিদায় হইলে তিনি সহসা পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ লোকটা কে যায় রে ?

চৌকিদার বলিল, মোক্ষদা।

পুলিশ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, মোক্ষদা, মোক্ষদা কে ?

চৌকিদার বলিল, পীরপুর গাঁয়ের সাধুচরণের ভাই !

সাধুচরণ লোকটা কে ?

চৌকিদার কি বলিয়া তাহার পরিচয় দিবে ? অবশেষে বলিল, এই মোক্ষদারই দাদা।

পুলিশ সাহেব বলিলেন, হু, লোকটাকে ডাক দিকিন !

মোক্ষদা কি একটা কাজে কোথায় যাইতেছিল। সহসা চৌকিদারের ডাক শুনিয়া থতমত খাইয়া গেল ; অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত আসিয়া পুলিশ সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল।

চৌকিদার ধমকাইয়া বলিল, সাহেবকে সেলাম করতে পারলি নে ?

মোক্ষদা গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও বড় যায় নাই। সাহেব সুবাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিতে হয়, তাহা সে জানে না ; অন্য কেহ হইলে পায়ের ধূলি লইত, কিন্তু পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যে জুতা মোজা পেণ্ট সার্ট টুপীতে নিশ্ছিদ্র তাহার পায়ের ধূলির কোন সন্ধানও সে পাইল না। কেবল আয়ত দুইটি চক্ষু মেলিয়া একবার চৌকিদার ও একবার সাহেবের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল।

ব্যাপারটা সাহেবের ভাল লাগিল না, এইমাত্র দাগীরা তাহাকে অজস্র সেলাম বিতরণ করিয়া গিয়াছে। দাগীরা বার বার দাগা পাইয়া নানাভাবে সেলাম করিতে শিখিয়াছে, জেলখানার মধ্যেও দৈনিক কতবার তাহাদিগকে 'সরকার সেলাম' ঠুকিতে হইয়াছে ; কিন্তু মোক্ষদা এখনও এই বিষয়ে শিশু। চৌকিদারের কথা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, সাহেবের সম্মুখে তাহার একটা অভিবাদন জ্ঞাপনের

দায়িত্ব আছে, কিন্তু তাহার প্রক্রিয়াটা সে কিছুতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না।

সাহেব মোক্ষদার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গলায় তুলসীর মালাটী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বেটা বোষ্টম!

মোক্ষদার মুখ হইতে সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিল, আজ্ঞে হাঁ।

পুলিশ সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজীর কি করা হয়?

মোক্ষদা এই ব্যঙ্গ বুঝিতে পারিল না এবং তাহাকেই যে বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও ঠাহর করিয়া উঠিতে না পারিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

সাহেব বুঝিয়া লইলেন, সে নিষ্কর্ম্মা, তাই জবাব দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। পুনরায় আগের সুরেই বলিলেন, ও, বাবাজীর সংসারের কাজকর্ম কিছুই করা হয় না! কেবল বোষ্টমী জুটিয়ে বেড়ানো হয়! কয়টি জুটেছে এ'রি মধ্যে?

মোক্ষদা এইবার সাহেবের কথার মর্ম বুঝিল। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না, কেবল দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিতে লাগিল।

চৌকিদার মধ্যস্থ হইয়া বলিল, না হুজুর, এ'রা বিয়ে থা' করে নি।

সাহেব বলিলেন, ও' তাই নাকি? তা' হ'লে সংসারের কোন দায়ই নেই!

এ'দিকে পীরপুর গাঁয়ে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে যে, ডাকাতির তদন্তে আসিয়া পুলিশ সাহেব প্রথমেই মোক্ষদাকে তলব করিয়াছেন, অনেকক্ষণ যাবৎ তাহার জবানবন্দী চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পীরপুর গাঁয়ের কৌতূহলী জনতায় সে জায়গা ভরিয়া গেল। দূরে দাঁড়াইয়া সকলে সত্যই দেখিতে পাইল যে, মোক্ষদা পুলিশ সাহেবের সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

সাধুচরণ মাঠে গিয়াছিল। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সেও কথাটা শুনিল। কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে যখন

দেখিতে পাইল, গ্রামশুদ্ধ লোক তদন্তস্থলে দৌড়াইয়া যাইতেছে, তখন সে আর কথাটা উড়াইয়া দিতে পারিল না। সেও কাঁধে একটা গামছা ফেলিয়া সেদিকে দৌড়াইল।

সাধুচরণ জনতার নিকটবর্তী হইল, কিন্তু নিতান্ত পরিচিত জনতার মধ্য হইতেও তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, সকলে নীরবে পথ ছাড়িয়া দিল; সাধুচরণও ব্যগ্রতায় কাহারও মুখের দিকে তাকাইল না, যেখানে মোক্ষদা পুলিশ সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

সাধুচরণকে দেখিয়া চৌকিদার বলিল, এই যে···

পুলিশ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

চৌকিদার বলিল, সাধুচরণ, মোক্ষদার দাদা···

সাধুচরণ কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মোক্ষদার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে রে মোক্ষদা, তুই এখানে কেন? এতবড় যে একজন লোক তাহার চোখের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল,—পুলিশ সাহেবকে কোন অভিবাদনও জানাইল না।

জনতার মধ্য হইতে সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, সাধুচরণেরও তলব পড়িয়াছে! আবার কখন কাহার তলব পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় জনতা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। কেহ আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেও সাহস পাইল না।

সাধুচরণের কোন প্রশ্নের উত্তরে মোক্ষদা কিছু বলিবার আগেই পুলিশ সাহেব একটু বিরক্তির সুরেই বলিলেন, যা', যা', এখানে আর মিছে গোল করিস্ নে, যা'; তারপর চৌকিদারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন' এ'গুলোকে তাড়া এখান থেকে;

চৌকিদার বলিল, যা' সাধু বাড়ী যা, যা' মোক্ষদা যা, কোথায় যাচ্ছিলি!

সাধুচরণ ও মোক্ষদা চলিয়া আসিল—আর অপেক্ষা করিল না।

সাধুচরণ ও মোক্ষদার নামে গ্রামে নানা কথা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া গেল। ডাকাতি করিয়া যে সব টাকা তাহারা লুটিয়াছে, তাহার অর্ধেক পুলিশ সাহেবকে ঘুষ দিয়া যে কি করিয়া জেলের হাত হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তাহাও মুখে মুখে প্রচারিত হইল।

কিন্তু বিষয়টা লইয়া গ্রামের লোক বাহিরে যতই আলোচনা করুক না কেন, অন্তরে তাহাদের একটা ভীষণ ভয় জন্মিয়া গেল। তাহারা এতখানি বড় হইয়াছে, কোনদিন ডাকাত দেখে নাই। চোর অনেক দেখিয়াছে, পীরপুর গ্রামেও পাঁচ ছয় ঘর দাগী আছে; একজন সিঁদের মুখে একদিন ধরাও পড়িয়াছিল, তাহাকেও সকলে গিয়া দেখিয়া একদিন চক্ষু সার্থক করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহারা কোনদিন ডাকাত দেখে নাই। ডাকাতের অনেক দুঃসাহসিক গল্প তাহারা ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়াও আসিতেছে, কিন্তু সেই ডাকাতই তাহাদের ঘরের কোনেই যে কোনদিন জন্মগ্রহণ করিবে, সে' কথা তাহারা কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। সেই জন্য চোখের আড়ালে তাহাদের সম্বন্ধে যে যাহাই বলুক না কেন, চোখের সাম্‌নে সকলেই তাহাদের প্রতি আগের মতই ব্যবহার করিতে লাগিল। এমন কি, তাহাদের প্রতি ভয়ে দুই চারিজন আগের চাইতেও অধিক সামাদর দেখাইতে লাগিল এবং ইহাদের সংখ্যাই গ্রামে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কথাটা ক্রমে সাধুচরণেরও কানে উঠিল। কিন্তু সে ইহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। তথাপি সে মোক্ষদার সঙ্গে এই বিষয়ে কোনদিন কোন আলাপ করিল না।

ক্রমে বিষয়টা মোক্ষদার কানে কিছু কিছু করিয়া আসিতে লাগিল। তাহার উপর একদিন একটা ছোটখাটো ঘটনাও ঘটিয়া গেল। একদিন পুকুর ঘাটে মোক্ষদা আবক্ষ জলে নামিয়া স্নান করিতেছিল। ঘাটে আরও অনেক লোকজন ছিল। সহসা মোক্ষদা একটি পাঁচ ছয় বছরের

বালকের উচ্চ চীৎকার শুনিয়া পিছনের দিকে তাকাইল। দেখিল, হরি মোদকের বছর ছয়েকের ছেলেটাকে তাহার মা স্নান করাইবার জন্য হাতে ধরিয়া ঘাটের দিকে টানিতেছে, সে কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না! মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে খুড়ি, ও' কাঁদছে কেন?

হরিমোদকের স্ত্রী বলিয়া ফেলিল, তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে গো!

মোক্ষদা বিস্মিত হইয়া বলিল, আমাকে ভয়? কেন?

হরির স্ত্রী বলিল, এই যে লোকে কি বলাবলি করে, আমরা ত আর চোখে দেখিনি! মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, কি বলাবলি করে?

মোক্ষদার মুখের কথা শুনিয়া বালকের কান্না থামিল; সে আঙ্গুল দিয়া মোক্ষদাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল, উই, উই, ডাকাত, বাবা গো, ধর্‌লে গো!

ঘাটে মুরুব্বি স্থানীয় যে কয়জন লোক ছিল, তাহারা ছেলেটাকে ধম্‌কাইয়া উঠিল, বলিল, থাম, এতটুকুন ছেলের মুখে এত বড় কথা!

একটা অত্যন্ত অপ্রিয় প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ঘাটের অনেকেই ইতিমধ্যে স্নান অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেল, কেহ একটু দূরে দাঁড়াইয়া ঘাটের দিকে পিছন ফিরিয়া অনাবশ্যক দন্তমার্জনা করিয়া যাইতে লাগিল; ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তাহাও জানিবার জন্য কান পাতিয়া রাখিল।

মোক্ষদা সকলই বুঝিল, কিন্তু কিছুই বলিল না; কেবল স্নান শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় হরি মোদকের ছেলের দিকে একটিবার তাকাইল; ছেলেটা ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়া মায়ের পিছনে লুকাইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গগনভেদী চীৎকারে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রকম্পিত করিতে লাগিল।

কে একজন বলিল, ছেলেটা ভয় পেয়েছে, খুড়ি! ও'কে আজ আর জলে নাবিও না, কি জানি জ্বর টর হতে পারে। হরি মোদকের স্ত্রী ছেলেটাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে স্নানের ঘাটে যে কয়জন লোক উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই একে একে সন্ধ্যার পূর্বেই আসিয়া মোক্ষদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জানাইল, ঐ সব কথা তাহারা বলে না, কিংবা কোনদিন কাহাকেও বলিতে শুনেও নাই ; অতএব তাহারা ইহার মধ্যে আছে, এমন কথা সে যেন মনে না করে। মোক্ষদা কাহাকেও কিছু বলিল না, কেবল বিষয়টা লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল।

রাত্রে সাধুচরণ মোক্ষদাকে খাইবার জন্য ডাকিল। রান্নাবান্নায় সাধুচরণের বড় সুন্দর হাত,—ছেলেবেলা হইতেই এই কাজ করিয়া আসিতেছে! সাধু মোক্ষদাকে কোনদিন হেঁসেলে ঢুকিতে দেয় না ; মোক্ষদাও এ'সব বিষয়ে কোনদিন কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। বরাবরের মত সেদিনও সাধুচরণ নিজেই রান্নাবান্না শেষ করিয়া মোক্ষদাকে খাইবার জন্য ডাকিল।

মোক্ষদা রান্নাঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সাধুচরণকে জিজ্ঞাসা করিল, কি রে দাদা, লোকে বলে, মোরা নাকি চোর! তুই চোর, মুই চোর ; মোরা চোর হতি গেল্যাম কেনে? কবে কার কি চুরি করলাম?

সাধুচরণ বলিল, লোকে বলে, বলুক না, লোকের কথায়ই মোরা চোর হয়ে গেলাম?

মোক্ষদা রাগিয়া গেল, বলিল, পথে ঘাটে হাটে মাঠে যেখানে যা'ব, সেখানেই লোকে দেখে চোখ টিপবে, হরি মোদকের দুধের ছেলেটা—তাকেও শিখিয়েছে মোরা চোর, মোরা ডাকাত! বলিয়া স্নানের ঘাটে আজ যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিল।

সাধুচরণ বলিল, ছেলে মান্ষি করিসনি তুই মোক্ষদা, লোকের মুখের কথায় কি হয় রে!

মোক্ষদা বলিল, লোকের মুখের কথা? তিন সন্ধ্যে নাম কেত্তন না করে তুই যে জল টুকুন মুখে দিস্‌নে, তোকে বল্‌বে চোর?

আর একদিন কারুর মুখে এ'কথা শুনিছি ত দেখে নেব, আমারই একদিন কি ওরই একদিন !

সাধুচরণ বলিল, দেখ মোক্ষদা; এই নিয়ে তুই লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাসনি, ঝগড়া বাঁধাসনি, বারণ কচ্ছি ! লোকে দু'দিন বলবে, দু'দিন পরে আপনিই চুপ করে যাবে।

মোক্ষদা ধমক দিয়া উঠিল, বলিল, দু'দিন বলবে, কেন দু'দিন বলবে ? আর যদি বলেই, তা হলে তোকেও বলে রাখছি, আমি সিঁদ কাঠি নিয়ে বেরুবো, দেখব, কোন ব্যাটার ঘরে কি দৌলত আছে, হুঁ হুঁ।

সাধুচরণ লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদার দিকে স্থির নেত্রে তাকাইয়া বলিল, মোক্ষদা, আয় আমার সঙ্গে আয়, ঠাকুরের আসন ছুঁয়ে দিব্যি করবি, যে কথা মুখে আন্‌লি, তা আর কোনদিন মনেও কর্‌তে পারবিনে ; আয়, ঠাকুরের আসন ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌বি, আয়। বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

মোক্ষদার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, লোক চুরি ডাকাতি করে না কেন ? লোকের কথার ভয়ে ! সেই কথাই যদি মোদের শুন্‌তি হোল, তবে চুরি ডাকাতিতে ভয় কিসের ? ধরে থানায় দেবে ? ধর্‌তে এলে পাঁচটা লোককে একাই সাবাড় কর্‌তে পারব—বলিয়া গর্বভরে নিজের বলিষ্ঠ দেহখানির দিকে তাকাইল।

সাধুচরণ চীৎকার করিয়া ধমক দিয়া বলিল, মোক্ষদা ! মোক্ষদা শৈশব হইতেই তাহার দাদাকে জানে ; আশৈশব এই দাদারই শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া সে মানুষ হইয়াছে, দাদার ধমক খাইয়া এই বার সে নরম হইল। বলিল, তোমার পায় পড়ি, দাদা, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু আমি ওদের কথার জ্বালা যে সইতে পারি না। চল, তোমার ঠাকুরের আসন ছুঁয়ে আমি দিব্যি করে আস্‌ছি, আমি ও কথা আর ভুলেও মনে কর্‌ব না।

কিছুদিনের মধ্যে পীরপুরের গাঁয়েই একটা বড় রকমের চুরি হইয়া গেল। চোর সিঁদ কাটিয়াই ঘরে ঢুকিয়া গৃহস্থের কাঠের সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া কিছু নগদ টাকা লইয়া পলাইয়া গেল, কেহ টেরও পাইল না।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব তদন্তে আসিলেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াই সাধুচরণের বাড়ী পুলিশ দিয়া ঘেরিয়া ফেলিলেন; তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া খানাতালাস হইল। সাধুচরণের ঘরের বাক্স পেঁটরা হাঁড়িকুড়ি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেখা হইল; কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। অবশেষে ইন্‌সপেক্টব সাহেব সাধুচরণের দোলমঞ্চটা কোদাল দিয়া কাটিয়া তাহার মধ্যে মালের খোঁজ করিতে বলিলেন; দোল মঞ্চ কাটিয়া সমান করিয়া ফেলা হইল, কিছুই পাওয়া গেল না; তুলসীমঞ্চের নীচেও সন্ধান করা হইল, ফল একই রকম দাঁড়াইল।

ইন্‌সপেক্টর সাহেব বলিলেন, ধর্মের নাম ক'রে বেটা বজ্জাতের ধাড়ী! ঠাকুরের বেদীটার নীচে তোর কি আছে, দেখি?

সাধুচরণ কাঁদিয়া ইন্‌স্‌পেক্টরের পায় পড়িল, বলিল, ও'তে কিছু নেই, ওটা ছুঁবেন না, ও আমার তিন পুরুষের ঠাকুর বেদী; আমি নিজে চান না করে ও বেদী ছুঁই না!

ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেবের রোখ চড়িয়া গেল, বলিলেন, তা হলে ঠিক ধরেছি, টাকা ওখানেই পুঁতে রেখেছিস—বলিয়া তাহার সঙ্গীদের সেই বেদী খুঁড়িয়া দেখিতে বলিলেন। তাহারা ঠাকুরের আসন উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল, তারপর বেদীর উপর দমাদম্ কোদাল চালাইতে লাগিল। কিন্তু কোন ফল হইল না।

তথাপি ইন্‌স্‌পেক্টরের সন্দেহ দূর হইল না। তিনি সাধুচরণ ও মোক্ষদাকে বাঁধিতে হুকুম দিলেন। পুলিশ দুইজনকে এক হাত কড়ায় বাঁধিল, তারপর দুইজনের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া হাঁটাইয়া থানার দিকে লইয়া চলিল। গ্রামের কৌতূহলী জনতা সঙ্গে যাইতে লাগিল। গ্রাম্য বধূরা জল ভরিবার ছল করিয়া গ্রামের পুকুর

পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল; কাঁখের কলসী মাটিতে রাখিয়া দুই হাতে ঘোম্‌টা একটু ফাঁক করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল, গ্রামের ছেলের দল তখনও তাহাদের পিছে পিছে যাইতেছে; আর সাধুচরণের কুকুরটা ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কেবল লেজ দুলাইতে দুলাইতে সকলের আগে আগে চলিয়াছে। পিছনে সাধুচরণের শূন্য বাড়ীটা মধ্যাহ্ন রৌদ্রে খা খা করিতেছে। দেখিয়া দুই একজনের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। গ্রামের প্রবীণেরা বলিল, ইহাদের দ্বীপান্তর হইবে।

কিন্তু তাহাদের কিছুই হইল না। কয়েক মাস হাজত বাস করিয়াই তাহারা ফিরিয়া আসিল। প্রমাণের অভাবে পুলিশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল।

যেদিন সাধুচরণ বাড়ী ফিরিল, সেদিন গ্রামশুদ্ধ লোক তাহার বাড়ীতে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই জানাইল, তাহারা যে ফিরিয়া আসিবে, তাহা তাহারা জানিত; কারণ, ধর্মের জয় না হইয়া যায়ই না। তবে কে যে ইনস্‌পেক্টরের কানে তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল, তাহাও তাহারা জানে; কিন্তু বলিতে চাহে না। তাহাদের সকলেরই অনুরোধ তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে যেন এই বিষয়ে তাহারা কোন সন্দেহ না করে। সাধু নামেও যেমন কাজেও তেমন, মোক্ষদাও তাহাই·········ইত্যাদি।

সাধুচরণ কাহাকেও কিছু বলিল না। তবে দোলমঞ্চটি আর নূতন করিয়া গড়িল না; এমন কি, তুলসীমঞ্চটিও সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল। ঠাকুরের বেদীর উপরে নূতন এক ঠাকুরের আসন পাতিল। তিনি ত্রিনাথ। যেদিন এই ত্রিনাথের সেবা হইত, সেদিন আশেপাশের তিন চারিখানি গ্রামের দাগীরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে সারারাত্র জাগিয়া গাঁজা খাইত; চৌকিদারও তাহার ভাগ হইতে বাদ পড়িত না। তখন হইতে সাধুচরণ ও মোক্ষদাকে সামনে কিংবা পিছনে কেহ কোথাও আর চোর অপবাদ দিতে সাহস পাইত না।

দিদির সাথে আড়ি

পুরীতে গিয়া স্বর্গদ্বারেই একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া লইলাম। ইচ্ছা ছিল, জন-কোলাহল হইতে বহু দূরবর্তী নির্জন শহরের প্রান্তে একখানা বাড়ী লইয়া থাকিব। কিন্তু পাইলাম না। এখানে আসিয়া সকলেই ভিড় বাঁচাইতে চাহে, সেই জন্য দূরবর্তী বাড়ীগুলিই আগে ভাড়া হইয়া যায়।

দুই একজন পরিচিত বন্ধু সপরিবার পুরী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিলেন, একলা থাক, একা পুরো বাড়ী কেন? এমন চমৎকার হোটেল রয়েছে, তাতে গিয়েই ত উঠ্‌লে পার!

যাহারা সংসারের আনন্দটুকুও পয়সার মাপকাঠিতে ওজন করিয়া চলেন, তাহাদের সঙ্গে আমার বনে না। তাহাদের এমন চমৎকার যুক্তির প্রত্যুত্তর অবশ্য প্রকাশ্যে দিতে পারিলাম না, কিন্তু মনে মনে এইটুকু বুঝিলাম, ছুটির এই কয়টা দিনও যদি হোটেলের রুটিনবাঁধা খাওয়া দাওয়া, ঘুম-ভাঙ্গা, স্নান করার নিয়মানুবর্তী হইতে হয়, তবে অবসরের আনন্দটুকু কোথায়? আজিকার দিনেও যদি যখন খুশী তখন ঘুম হইতে না উঠি—কোনদিন ছ'টায়, কোনদিন আটটায়—যখন খুশী তখন রাত্রির খাবার না খাই, সমস্ত বাঁধা-ধরার বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া, আপিশের দিনের রুটিনটিকে গলাধাক্কা দিয়া ঘর হইতে বিদায় দিয়া না থাকি, তবে অস্থিমজ্জায় ছুটি উপভোগ করিলাম কোন দিক দিয়া? কিন্তু হোটেলে আমার এই অনাচার সহ্য করিবে কে? চা খাইবার সময় পর্যন্ত যদি আমার ঘর বন্ধ থাকে, তবে চাকর চলিয়া যাইবে। অসময়ে জাগিয়া হাঁকডাক করিলে কোনদিন চা আসিবে, কোনদিন আসিবে না। পরিপূর্ণ

জ্যোৎস্নার রাত্রিতে যেদিন সমুদ্রের জল উচ্ছল হইয়া উঠিবে, সেদিন যদি বেড়াইয়া একটু বেশী রাত্রি করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসি, তবে দেখিব, হয়ত ঘরে ঘরে সমস্ত আলো নিভিয়া গিয়াছে—সারাদিন পরিশ্রমের পর ঠাকুর চাকরগুলি বেহুঁস হইয়া ঘুমাইতেছে—তখনই ত আমার পূর্ণিমা রাত্রির সমুদ্রতীর ভ্রমণের আনন্দ ক্ষুধার বেদনায় পর্যবসিত হইবে।

আমার একটি উড়ে ঠাকুর ছিল। তাহাকে অন্যান্য ঘরগুলি গুছাইতে বলিয়া নিজে শুইবার ঘরখানি সাজাইতে লাগিলাম। মনে হইল, অতি অল্পদিন ধরিয়া একটি পরিবার এই বাড়ীটি ছাড়িয়া গিয়াছে। দেয়ালের গায়ে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতের বিচিত্র শিল্প-পরিচয় এখনও উজ্জ্বল হইয়া আছে। কোথাও বিচিত্র হস্তাক্ষর, কোথাও অপূর্ব নর-বানরের রেখা-চিত্র; অশুদ্ধ বানানে কোথাও লেখা রহিয়াছে—ভুলুর সাথে আড়ি। কোথাও বা মণি ও লীলার সাথে আড়ি, কোথাও দিদির সাথে আড়ি। সমস্ত বাড়ীর দেয়াল জুড়িয়া এই কয়টি চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কোন হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞ হইলে হয়ত বলিতেন, ইহাদের শিল্পী তিনজন—ভুলু, মণি ও লীলা। দিদির নামোল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাহার হস্তলিপির পরিচয় পাওয়া যায় না। অনুমানে মনে হয়, তাহার কিছু বয়স হইয়াছে—দেয়ালের গায়ে অনাবশ্যক রেখাঙ্কন ও কথায় কথায় আড়ি দিবার চাপল্য নিশ্চয়ই দূর হইয়াছে, নহিলে উক্ত তিন জন শিল্পীর পার্শ্বে তাহারও শিল্প-কীর্তির পরিচয় পাওয়া যাইত।

'দিদির সাথে আড়ি,' কথাটি ভাবিতে আমার বড় ভাল লাগিল। এই দিদি কে? তাহার বয়সই বা কত? দেখিতে কেমন? কেন তাহার উপর বিরক্ত হইয়া সামান্য শিশু কয়টি আড়ি করিল? কি অপরাধ সে করিয়াছিল, শিশুদের কাছে যাহা এত গুরুতর বলিয়া মনে হইল? 'দিদির সাথে আড়ি।' এই দিদিটিই বা কেমন মেয়ে?

ছোট ভাইবোনদের একটু স্নেহ করিয়া আদর আব্দার সহ্য করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না? এই দিদিটির কোথাও নামোল্লেখ নাই—সর্বত্রই কেবল দিদি বলিয়াই উল্লেখ। হস্তাক্ষর বিভিন্ন তিন রকমের, কিন্তু সর্বত্রই দিদি! অতএব দিদি তিনজনেরই দিদি—সর্বজ্যেষ্ঠা।

ভুলু বোধ হয় ছেলে। কিন্তু ছেলে হইলেও মণি ও লীলার যে ছোট, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিন বোনের মধ্যে এক ভাই, কিন্তু বোনেদের সঙ্গে সকল সময় মিলিয়া মিশিয়া মেয়েলী গুণই ছেলেটির উপরও বর্তিয়াছে। কিংবা ভুলুকে ছোটই বা বলি কেমন করিয়া? সে'ত কোন ক্ষেত্রেই মণি কিংবা লীলাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করে নাই? তবে যাহার সঙ্গে আড়ি করিতে যাইতেছে, তাহাকে আর সম্মানের পদে উল্লেখ না'ও করিতে পারে। তবু নিঃসন্দেহে ভুলুকে যেন কনিষ্ঠ বলিতে পারিতেছি না।

জিনিসপত্র গুছাইতে দুই দিন কাটিয়া গেল। এই কয়টা দিন কাটিল একটু ব্যস্ততায়ই। দেয়ালের গায়ে লেখাগুলির কথা এক-রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ইহার আরও একটি কারণ ছিল। আমার কলেজের জীবনেব এক বন্ধু কিছু দিন হইল সস্ত্রীক পুরী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। বন্ধুর গৃহেই প্রায় সকাল-সন্ধ্যায় চা'য়ের নিমন্ত্রণ থাকিত। বন্ধুর একটি শ্যালিকাও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি সেই বৎসর বি, এ পাশ করিয়া এম্, এ'তে ভর্তি হইবার আগে এক বৎসর দম লইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত সকাল-সন্ধ্যায় আলাপে ভ্রমণে আমার দিনগুলি বড় দ্রুত কাটিতে লাগিল।

একদিন রাত্রি করিয়াই বাড়ী ফিরিলাম। আসিয়া দেখি, উড়ে ঠাকুরটি তখনও জাগিয়া বসিয়া আছে। আমি সেদিনও বন্ধুর গৃহেই রাত্রির আহার শেষ করিয়া আসিয়াছিলাম। ঠাকুরটাকে বলিলাম, তুই খেয়ে দেয়ে ঘুমোগে যা, আমি আজ খা'ব না!

আমি যে'দিন বেশী রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরি, সে'দিন যে অন্যত্র রাত্রির আহার শেষ করিয়া থাকি, তাহা সে জানিত। আমার কথায় সে কোনরকম গুরুত্ব আরোপ না করিয়াই কহিল, পিয়ন একখানা চিঠি দিয়ে গিছল, আজ সকালে; সারাদিন আপনি আর এলেন না, —আমি তাহাকে বাধা দিয়া কহিলাম, দে' দেখি! সে একখামি খামের চিঠি আমার হাতে আনিয়া দিল। দেখিলাম, চিঠিখানি আমার নামে নহে, তবে এই বাড়ীরই ঠিকানায় বটে। বুঝিলাম, যে পরিবারটি আমার এই বাড়ীতে আসিবার আগে এখানে বাস করিত, তাহাদেরই কাহারও নাম হইবে। অনেক ভাবিযা চিন্তিয়া মনে কবিলাম, চিঠিখানি কাল সকালে পিয়নেব হাতে ফিরাইয়া দিব—সে তাহা লইযা যাহা ইচ্ছা করুক।

পরদিন একটু দেরী করিয়াই ঘুম হইতে উঠিয়াছিলাম। জানলা খুলিয়া দেখি সমুদ্রের ধারে বিষম ভিড়। ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করিযা জানিলাম, জেলেরা একটা বিশাল হাঙ্গর ধরিযাছে, তাহাই দেখিবার জন্য লোকের ঠেলাঠেলি। আমিও এই বিচিত্র সামুদ্রিক জীবটি দেখিবার কৌতূহল কোনমতেই দমন করিতে পারিলাম না। কোন মতে একটা জামা গায়ে দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইলাম।

একটু দূরে যাইতেই এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার দিকে আগাইযা আসিলেন। আমার বাড়ীটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিযা বলিলেন, আপনি কি এই বাড়ীটায় আছেন?

আমি বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ, কেন বলুন দিকিন্? তিনি বলিলেন, না, অম্‌নি জিজ্ঞেস্ কচ্ছি; কিছুদিন হ'ল আমরা এ বাড়ীটা ছেড়ে ঐ দিকে—ঐ দূরে—আর একটা বাড়ীতে উঠে গেছি, লোকজন অনেক কিনা, তাই বড় বাড়ী না হ'লে কুলোয় না! তা' বেশ্, আছেন, বাড়ীটা মন্দ নয়।

আমার গত রাত্রির চিঠিটার কথা মনে হইল। বলিলাম, আপনার নামই কি শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়?

তিনি বলিলেন, আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, আপনার একখানি চিঠি পিয়ন আমার কাছে ফেলে গেছে। যদি দয়া ক'রে একটু সঙ্গে আসেন, তবে এখনই দিয়ে দিই।

ভদ্রলোক পিছন ফিরিয়া একবার তাকাইলেন; তারপর বলিলেন, চলুন। আমার ছেলেমেয়েগুলো আবার ঐ ভিড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

ভদ্রলোক চিঠিখানা লইয়া মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না, আমার শুইবার ঘরের দেয়ালের গায়ে যে কয়টি চরিত্রের নাম বিচিত্র বানানে লিখিত আছে, ইনিই তাহাদের অভিভাবক। ভাবিয়া আমার অত্যন্ত হাসি পাইল। মনে হইল, এই ঢিলা আস্তিনের জামা পরা পক্ককেশ ভদ্রলোকের কয়েকটি দুরন্ত ছেলে মেয়ে আমার একটি দিনের কল্পনার রাজ্য কেমন করিয়া জুড়িয়া ছিল!

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নামগুলি আবার পড়িলাম। 'দিদির সাথে আড়ি।' দিদিটী তাহা হইলে এখনও পুরীতেই আছেন। কোনদিন সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়া হয়ত দুইজনের দেখাও হইয়াছে, হয়ত কোনদিন তাহার নিতান্ত পাশ কাটাইয়াও চলিয়া গিয়াছি, কোনদিন শাড়ীর আঁচলের একটু কোণ আমার গায়ে আসিয়াও লাগিয়াছে। হয়ত আমি যাহা ভাবিতেছি, তাহা সমস্তই মিথ্যা, তাহার সঙ্গে কোনদিনই দেখা হয় নাই।

চা'য়ের টেবিলে বসিয়া লেখাগুলি বারবার আওড়াইতে লাগিলাম।

ভুলুর সাথে আড়ি।
আড়ি আড়ি আড়ি।
চ'লে যাই বাড়ী॥
তুই চল্ ঘর।
কি কর্‌বি কর॥

হনুমানের লেজ ধরি
টানাটানি কর ॥

লেখকের বর্ণজ্ঞানের বৈচিত্র্য দেখিয়া আমি একলা বসিয়াই হাসিতে লাগিলাম। 'দিদির সাথে আড়ি। আড়ি আড়ি আড়ি'। ইত্যাদি। চা-পান শেষ হইয়া গেল। বসিয়া বসিয়াই সিগারেট্ ধরাইলাম, আর মনে মনে সেই অপরিচিত শিশুরাজ্যে একাকী পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

এমন সময় বন্ধুপত্নী তাঁহার ভগ্নীকে লইয়া একেবারে আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি অপ্রস্তুত ভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, আজ আপনারা একা যে? নীতীশ কোথায়? নীতীশ আমার বন্ধুর নাম।

বন্ধুপত্নী বলিলেন, তিনি গেছেন স্টেশনে, কে তাঁর বন্ধু একজন আস্‌ছেন, মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার; সদ্য বিলেত ফেরৎ। সকালের এক্সপ্রেস্‌টায় আস্‌বেন, কিন্তু ট্রেণটা বোধ হয় লেট্। তাই ফির্‌তে দেরী হচ্ছে।

বন্ধুপত্নীর ভগ্নী ইরা বলিলেন, আপনি চেনেন না তাঁকে? মিষ্টার বি, মুখার্জি। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। তিনি এলে আপনার সঙ্গে পরিচয় হবে।

আমার বুকের উপর কে যেন একখানি পাথর চাপাইয়া দিল। মিষ্টার বি, মুখার্জি—মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, বিলেত ফেরৎ! আমি বলিলাম, তা বেশ, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বেশ খুশী হওয়া যাবে। কিন্তু আপনারা এখানে, ওঁরা হয়ত এতক্ষণে ফিরে হাঁক ডাক কচ্ছেন!

বন্ধুপত্নী বলিলেন, হাঁ, যাচ্ছি, আপনার আজ দুপুরে আমাদের ওখানে নেমন্তন্ন থাক্‌ল কিন্তু!

আমি হাসিয়া বলিলাম, নিত্য খেয়ে খেয়ে নেমন্তন্নের মর্যাদা নষ্ট করে ফেলেছি। এই কথাটা শুন্‌লে এখন নিতান্তই লজ্জা হয়।

বন্ধুপত্নী বলিলেন, তা যা হোক্, দুপুরে ঠিক যাবেন। বলিয়া উভয়েই দ্রুতপদে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সিগারেটটা ধরাইয়া লইয়া আমি বিছানার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। মাথার ভিতরটায় কেবলি এই কথা কয়টা পাক খাইয়া ফিরিতে লাগিল, 'মিষ্টার বি, মুখার্জি, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।' কোথাকার কে বি, মুখার্জি বিলাতের কোন লোহা-লক্করের কারখানা হইতে দুই একটা সস্তা খেতাব লইয়া আসিয়া দেশের মধ্যে একেবারে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া দিল! আর ইরা? সেত শিক্ষিতা মেয়ে! এই সমস্ত বিলাতি ডিগ্রীগুলির যে কতদূর মূল্য আছে, তাহা কি সে বুঝিত পারে না? কি আশ্চর্য! কিছুদিন ধরিয়া মনে মনে ইরাকে লইয়া যে আনন্দ কল্পনায় মত্ত ছিলাম, তাহা নিমিষে যেন কোথায অন্তর্হিত হইয়া গেল। 'নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই'! কি ধৃষ্টতা! কোথাকার কে, বিলাতের কোন কারখানায আগুনের চুল্লীর ধারে দিন কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে নিশ্চয়ই চিনিতে হইবে আমার? ইরার ঐ লোকটার প্রতিষ্ঠায় এতখানি বিশ্বাস থাকিবার কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে হইল, ইরা শিক্ষিতা মেয়ে।

এইবার মনে মনে বন্ধু নীতীশের উপর আমার অত্যন্ত রাগ হইল। ভাবিলাম, সে যদি ব্যাপারটা আগে হইতে স্পষ্ট করিয়া দিত, তাহা হইলে আমি কদাচ তাহার বাড়ীর চৌ-সীমানা মাড়াইতাম না। তাহার ও তাহার স্ত্রীর কথাবার্তায় ত সে ইরার উপর আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ পাইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা পূর্ব হইতেই যদি সমস্ত স্থির হইয়া আছে, তবে তাহাকে লইয়া এই প্রবঞ্চনার কি প্রয়োজন ছিল? 'মিষ্টার বি, মুখার্জির নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।' কে বলিবে মেয়েটাকে শিক্ষিতা? কোথাকার কে একটা লোক তাহার নাম দেশের সকলেই জানিয়া বসিয়া আছে আর কি! এমন মূর্খের মত কথা যে বলিতে পারে, সে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বহন করিয়া বেড়াইবার অধিকার রাখে কি

করিয়া ? আর এইত চেহারা ! মনে হয়, যেন একটি জ্যামিতির সরল-রেখা মাটির উপর খাড়া হইয়া আছে। পড়িতে পড়িতে চোখের মাথাটিও পর্যন্ত খাইয়া বসিয়া আছেন, একজোড়া চশ্‌মা পরিয়াছেন। তাহাতে যা মানাইয়াছে, আরও চমৎকার। তাইত এই দেশের শিক্ষিতা মেয়েগুলির দিকে ফিরিয়া তাকান যায় না।

আমি দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইলাম। 'দিদির সাথে আড়ি।' কি চমৎকার! দিদি হয়ত কোন কারণে তাহার কোন আব্দার রক্ষা করিতে পারে নাই ;—অমনি, 'দিদির সাথে আড়ি।' কিন্তু এই আড়ি কতক্ষণ ? হয়ত দুই এক মিনিট, তারপর নিজেই যাচিয়া গিয়া গায়ে পড়িয়া দিদির সঙ্গে আবার ভাব করিয়া লইয়াছে। দিদিই কি তাহার ছোট ভাইভগিনীগুলির বিরক্তির কারণ হইয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারিয়াছিল ? না অভিমানী শিশুগুলিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুমা খাইয়া নানা রকমে সোহাগ করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিয়া দিয়াছিল ?

পাঁচকড়িবাবু বেশ ভাল লোক বলিয়াই মনে হইল। চেহারাটি দেখিয়া ভদ্রলোককে নিতান্ত সরলপ্রাণ বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়। বয়স হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের ছাপ এখনও ভগ্ন দেহখানিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ; মাথার চুল একেবারে তুলার মত সাদা ; মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে। কি সুন্দর কথাবার্তা, কি সুন্দর আলাপ করিবার ভঙ্গি ভদ্রলোকের। সমুদ্রতীরে নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে প্রত্যহ দেখা হইবে। কিংবা তিনি নিজেও কোনদিন চিঠির খোঁজে এখানে আসিয়া উঠিতে পারেন। হাঙ্গরের তামাসা ত আর নিত্য থাকিবে না। কোনদিন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আমার বাড়ীতেও আসিয়া উঠিতে পারেন।

আমার ভাবিতে বড় ভাল লাগিল। ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ, কুলীন। ভাল করিয়া পরিচয় হইলে আত্মীয়তার সূত্রও বাহির হইয়া পড়িতে

পারে। মনে মনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি নিশ্চয়ই সুখী হইব।

দেয়ালের দিকে তাকাইয়া আবার পড়িতে লাগিলাম।

দিদির সাথে আড়ি,
আড়ি আড়ি আড়ি।
চ'লে যাব বাড়ী ॥
তুই চল্ ঘর।
কি কর্‌বি কর ॥
হনুমানের লেজ ধ'রে
টানাটানি কর ॥

শিশু-চিত্তের কয়েকটি অসঙ্গত ও অর্থহীন অভিমানের অভিব্যক্তি! কি সুন্দর এই শিশুর জগৎ! অকারণ সুখে দুঃখে আনন্দে অভিমানে পরিপূর্ণ। এই স্বর্গ হইতে যে বঞ্চিত, তাহার জীবনই নরক! সমগ্র জীবনের নিঃসঙ্গতা আজ আমাকে যেন অস্থির করিয়া তুলিল। একবার ভাবিয়া দেখিলাম, জীবনের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। একক জীবনের নির্জনতা আমার বুকের উপর বোঝা হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে। চারিদিকে আনন্দ অভিমানের লীলা চলিতেছে, আর আমি তাহা হইতে বহুদূরে নির্জন আশ্রমের নিঃসঙ্গতায় নিজের সংস্থান খুঁজিয়া ফিরিতেছি। আমার মত আত্মপ্রবঞ্চিত আর কে আছে?

আমি যতই ভাবিতে লাগিলাম, ভুলু, মণি, লীলা ও দিদি আমার যেন নিত্য সঙ্গী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনে হইল, এই ভুলুকে আমি কতদিন ধরিয়া যেন জানি; মণি ও লীলা আমার বহুদিনের পরিচিতা, আর তাহাদের দিদি, সে'ত আমার নিত্য-কল্পনার আনন্দ-সঙ্গিনী। তাহাদিগের নিকট হইতে আমি একদিনের জন্যও সঙ্গচ্যুত হই নাই; তাহারাও স্নেহ-দৃষ্টিতে আমার চারিদিক ঘিরিয়া

আছে। দেয়ালের গায়ের লেখা এই নাম কয়টি যেন সজীব হইয়া আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তাহাদের অদৃশ্য স্নেহ-স্পর্শে আমার জীবনের একটা অনাস্বাদিত পর্ব খুলিয়া গেল।

কতক্ষণ তন্ময় হইয়াছিলাম জানি না; নীতীশের বাড়ী হইতে আমাকে ডাকিবার জন্য লোক আসিল। মনটা আবার বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল, এইত আবার কৃত্রিম ভদ্রতা-বিনিময়ের অভিনয় আরম্ভ হইবে! 'মিষ্টার বি, মুখার্জি—নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই,…তা'র সঙ্গে আপনার আলাপ হ'বে'; ইস্, আমার তাহাতে যেন কি স্বর্গই না লাভ হইবে! কোথাকার কে, তাহার সঙ্গে আমার এত আলাপ-পরিচয়ের প্রয়োজনই বা কি?

কিন্তু মনে যতই বিরক্তি অনুভব করিলাম, মুখে ততই তাহার বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, এ' লৌকিক ভদ্রতা বৈ ত নয়! নিমন্ত্রণ করিয়াছে, খাইয়া দাইয়া চলিয়া আসিব। নীতীশের সঙ্গে আমার কি-ই বা সম্পর্ক? সেখানে বসিয়া যা'র তা'র সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার আমার অবসর নাই।

স্নান করিয়া বাহির হইতে একটু দেরীই হইয়া গেল। নীতীশের দরজায় পা দিতেই ইরা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, এই যে আপনি এ'সেছেন; কিন্তু বড্ড দেরী ক'রে ফেলেছেন। আপনার জন্যে আমরা ব'সে আছি।

আমি কোন জবাব দিলাম না। এমন কি, তাহার দিকে মুখ তুলিয়াও তাকাইলাম না। নিঃশব্দে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, খাবার টেবিলে নিত্যকারের মত নীতীশ ও তাহার স্ত্রী বসিয়া আছেন। তাহার পাশে ইরাও আসিয়া বসিল।

আমি একটা চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, মিষ্টার মুখার্জি কোথায়? তিনি আসেন নি' বুঝি? নীতীশ বলিল, সে আজ মাত্র এ'ল; আজই আমার কাছে আসবে কি হে! এখানে

তঁার মস্ত বড়লোক শ্বশুর র'য়েছেন, তাঁর কাছে সে উঠেছে। আমি স্টেসনে তা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম!

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্বশুর? তা'র শ্বশুর?

নীতীশ বলিল, হাঁ, পাঁচকড়ি বাবুই যে তাঁ'র শ্বশুর।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন পাঁচকড়ি বাবু?

নীতীশ বলিল, তিনি তোমার বাড়ীটাতেই ত আগে ছিলেন ব'লে বল্লেন। তিনিও ছেলেমেয়েদের নিযে স্টেসনে গিয়েছিলেন। তাঁ'র সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। বেশ লোক।

আমার আর কোন বাক্যস্ফূর্তি হইল না। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

নীতীশ বলিল, নাও, হাত চালাও! আর বসে থাকা যায় না। বলিয়া নিজেই আহারে প্রবৃত্ত হইল।

আমিও তাহাতে নিঃশব্দে যোগ দিলাম।

নীতীশ বলিল, চল, কাল সকলে কণারক থেকে বেড়িয়ে আসি!

ইরা উৎসাহিত হইয়া বলিল, হাঁ, সেখানে অনেক দেখ্‌বার জিনিস আছে।

আমি ইরার দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিলাম, আচ্ছা, চল, আমার কোন আপত্তি নেই।

আমার চোখের উপর চোখ পড়িতেই ইরা মুখ নত করিয়া লইল।

বোবা

শহরের মূক-বধির বিদ্যালয়ের পাশের বাড়ীটা অনেক দিন ধরিয়া খালি পড়িয়াছিল; এই সুযোগে সকাল-সন্ধ্যা বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সেই বাড়ীটাতেই খেলাইয়া বেড়াইয়া কাটাইত। এমন সময় একজন নূতন সরকারী চাকুরে এই সহরে বদলী হইয়া আসিয়া এই বাড়ীটাই দখল করিয়া বসিলেন। নবাগত ভদ্রলোকের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও গতিবিধির আভিজাত্য দেখিয়া ছেলেরা বিস্মিত হইল এবং তাহাদের এতদিনের অধিকারটুকু ছাড়িয়া আসিতে এতটুকুও দ্বিধা কি সঙ্কোচ বোধ করিল না। ভদ্রলোক সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। কি একটা সরকারি কাজে নূতন বহাল হইয়াছেন; সেইজন্য কোথাও স্থায়িভাবে চাকুরি করিতে পারিতেছেন না। এই সহরে তিনি নূতন আসিয়াছেন। বয়স অনুমান ত্রিশের অধিক হইবে না, স্ত্রীর বয়সও কুড়ির মত; কিন্তু নিঃসন্তান।

মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা তাহাদের পূর্বাধিকৃত স্থানটুকু ছাড়িয়াও অধিক দূর যাইতে পারিল না; বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শাসনে তাহারা তাহাদের চারিদিক ঘেরা দেয়ালটুকুর ঐ পাশে যাইতে পারে না; কিন্তু তবু দেয়ালের মধ্যেই খোলা জায়গায় তাহাদের একটি উত্তম খেলিবার স্থান জুটিল।

যে দিকের বাড়ীটা নূতন ভাড়া হইয়া গেল, সেই দিকের দেয়াল ঘেঁসিয়া দুই তিনটা পাম গাছ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই নীচটায় দুপুর বেলা চমৎকার ছায়া পড়ে। তাহারা তাহাদের খেলার সরঞ্জাম লইয়া সেইখানটায় আসিয়া জুটিল এবং নীরব ঝগ্ড়া-ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়া তাহাদের নিত্য-ক্রীড়া সম্পন্ন করিতে লাগিল।

বোবা

পাশের বাড়ীতে নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরগুলি যখন চারুর কাছে কেবলি দীর্ঘ হইয়া আসিত, তখন সে দোতলার জানালা খুলিয়া এই অদ্ভুত প্রকৃতির মানব সন্তানগুলির ক্রীড়া-কৌতুক অপূর্ব বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিত। এই কয়েকটি ছেলেকে সে নিত্য লক্ষ্য করিতেছে। মেয়েও আছে কয়েকটি; তাহারা ছেলেদের খেলায় বড় একটা আসিয়া মিশে না। নিজেরাই বাড়ীটার ঐ পাশে কোথাও একটা যেন স্বতন্ত্র খেলার স্থান বাছিয়া লইয়াছে।

ছেলেগুলি খেলিতে খেলিতে মধ্যে মধ্যে চোখমুখের এমনি বিকৃত ভঙ্গি করিয়া উঠে যে, দেখিলে মনে হয়, খুব রাগিয়াছে। চোখ দুইটা কেমন যেন অস্বাভাবিক বড় ও গোল হইয়া উঠে। ঘাড় বাঁকাইয়া, দুই ঠোঁটে তরঙ্গ তুলিয়া দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ করিতে থাকে, তারপর তর্জনী তুলিয়া শাসাইবার ইঙ্গিত করে। কিন্তু ক্রমে সমস্ত ভুলিয়া আবার শান্ত হইয়া খেলায় মন দেয়। খুব রাগিলেও পরস্পর মারামারি করিতে দেখা যায় না। এই সমস্ত দেখিয়া দেখিয়া চারুর নির্জন স্তব্ধ মধ্যাহ্নগুলি শুধু ইঙ্গিতের মুখরতায় ভরিয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক যতীশবাবু পিতার মৃত্যুর পর এইবার দেশ হইতে ফিরিবার কালে তাঁহার ছয় সাত বৎসরের বৈমাত্রেয় ভাইটীকে সঙ্গে করিয়া কর্মস্থানে লইয়া আসিয়াছিলেন। বিমাতা এই সন্তানটিকে সূতিকাগৃহে রাখিয়াই পরলোক প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধ পিতাই এতদিন যাবৎ ইহার মাতাপিতার স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনিও গত হইয়াছেন। যতীশবাবু আজও অবিবাহিত এবং বাড়ীতেও এই অপরিণত বয়সের শিশুটিকে রাখিবার কেহ ছিল না। অগত্যা যতীশবাবুকে বাধ্য হইয়া এই ব্যবস্থাই করিতে হইল।

সরকার হইতে দ্বিতীয় শিক্ষকের বাসের জন্য বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যেই দুইটি কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল। যতীশবাবু ভাইকে লইয়া সেই বাড়ীতেই বাস্ করিতে লাগিলেন।

ছয় বৎসরের বালক দাদার শাসনের ভয়ে প্রথম প্রথম কিছু দিন ঘরের কোণে ঝাঁপর হইয়া কাটাইল; কিন্তু বেশি দিন এইভাবে থাকা তাহার শিশুশক্তিতে কুলাইল না। সে ফাঁক পাইলেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সঙ্গে মিশিয়া যায়; কিন্তু যাহারা কথা কহিতে পারে না, কানেও শোনে না, তাহাদের সঙ্গে এই সাধারণ বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ও শ্রবণশক্তিপ্রখর বালকটির সহজে মিশ্ খাইতে চাহিল না। বয়স অল্প হইলেও বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বুঝিত যে, সাধারণ জগৎ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের জন্য বিদ্যাশিক্ষারও এই অভিনব ও পৃথক্ আয়োজন হইয়াছে। এই স্কুলের চারিধার ঘিরিয়া যে দেয়ালটি উচাইয়া আছে, ইহাই যেন তাহাদিগকে বাহিবের সজাগ মুখর সাধারণ পৃথিবী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতেছে—তাহাদের এই ব্যবধান আর কোন কালেই ঘুচিবে না। সেইজন্য যাহারা কথা কহিতে পারিত, তাহাদিগকে এই শিশুরা অত্যন্ত ভয় করিত। কিন্তু তাহারাই যদি ইহাদিগের আকার ইঙ্গিত ও ভঙ্গির অনুকরণ করিয়া ইহাদিগের সহিত আলাপ জমাইয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে ইহারাও তাহাদেব অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে বিলম্ব করিত না।

যতীশবাবু যে সময় স্কুলের কাজে কোথাও বাহির হইয়া যাইতেন, কিংবা দুপুর বেলা কোনদিন অভ্যাস মত পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেন, সেইদিন খোকা অবরুদ্ধ গৃহকোণ হইতে বাহির হইয়া বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিত। প্রাণটা যেন তাহার হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিত। বাড়ীতে পিতাও তাহাকে এমনই করিয়া শাসন করিতেন। বাড়ীর চতুঃসীমা ডিঙ্গাইয়া গেলেই বেতের পর বেত তাহার পিঠে ভাঙ্গিয়াছে। অথচ যেখানে খোলা মাঠ, সকল-দুপুর গো-পাট বাহিয়া পালের পাল গরু বাছুর যে দিকে যায়, যে দিকে চাহিলে দেখা যায় যে, মাথার উপরের আকাশটা যেন মাটিতে নামিয়া বুক ঘষিতেছে, সেইখানটায় যাওয়াই তাহার বারণ ছিল। পিতা এত

বড় নিষ্ঠুরও ছিলেন! পাড়ার ছেলেমেয়েরা ডিঙ্গি লইয়া নিত্য মাঝ-নদীতে গিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে। সেই কালো কুচ্‌কুচে জাতি সাপের খোলসের মত রংএর জল। কি ঠাণ্ডা! একটা ডুব দিলে বুঝি শরীরটা হিম হইয়া যায়! সেই জলে নামিয়া একদিনও সে স্নান করিতে পারে নাই। সেইজন্য পিতার মৃত্যুর দিন সে মনে করিয়াছিল, তাহার পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি তাহার এই তুঃসহ কারাজীবনের সমাপ্তি হইল। কিন্তু দাদা যে তাহার কোথা হইতে কোনদিক দিয়া এত দিন থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল, তাহা সে আগে কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

এতখানি বড় হইয়াছে, কেহ তাহাকে স্নেহ করে নাই,—আর দশজন নিজেদের ছেলেমেয়েকে লইয়া যেমন করে। বারুণী স্নানের দিন লাঙ্গলবন্ধের ঘাটে বচ্ছর বচ্ছর মেলা বসে। একদিন মাত্র সে—তা'ও পিতা কোন এক গাঁয়ে পূজা করাইতে গিয়াছিলেন বলিয়া—পাড়ার বিরজা পিসির সঙ্গে তাহা দেখিতে গিয়াছিল। রং বেরং-এর ফর্‌ফরি, কত নমুনার বাঁশী, কাগজের ফুল, কত সে দেখিয়া আসিয়াছিল; সঙ্গে তুইটি পয়সা থাকিলে তুইটি কিনিয়া আনিতে পারিত। বিরজা পিসি এক পয়সা দিয়া একটা চিনির মঠ কিনিয়া দিয়াছিলেন; তাহার সারা জীবনে, তা'ও পাড়ার একজন গায়ে পড়িয়া এই সোহাগের সামগ্রীটুকু দিয়া আদর করিয়াছিল। সেই বিরজা পিসিও আজ তুই বৎসর হয় মরিয়াছে।

কয়েকদিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ছেলেদের খেলা মনোযোগ দিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছে। কি সব খেলা! এই সব খেলা সে গাঁয়ে কখনও কাহারও সঙ্গে খেলে নাই; আর কাহার সঙ্গেই বা খেলিবে! কেহ ত তাহাদের বাড়ী আসিত না, সেও যাইতে পাইত না।

টুনটুনির ডিমের মত ছোট গোল গোল এইগুলি কি সব? বেশ শক্তও ত বটে। এত জোরে লাগে, তবু ভাঙ্গে না! বাঁ' হাতের

একটা আঙ্গুলের মাথায় বসাইয়া ডান হাতে কি জোরে মারে! এত দূরে ঐ গুটিটার গায়ে কি করিয়া লাগিয়া যায়! ওস্তাদিও ত কম নয়!

কথা কহিতে পারে না, কানে শোনে না, এমন ছেলে খোকা আগে কখনও দেখে নাই! তবে বাড়ী থাকিতে পাড়ার লোকজনের কাছে শুনিত যে, তাহার দাদা এমনি সব ছেলেপিলের মাস্টার। এতদিন পরে তাহাদিগকে আজ নিজচক্ষে দেখিয়া তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। চোখ মুখের কেমন সব ভঙ্গি করে, সহসা দেখিলে ভয় পাইতে হয়। বুকের সমস্ত ভাষ যেন মুখটার উপর মূহূর্ভে মুহূর্তেই লিখিয়া দিতেছে; তারপর সেই মূহূর্তেই আবার তাহা মুছিয়া লইতেছে। সর্বাঙ্গে আর ত ইহাদের কিছুরই অভাব নাই!

খোকা অবশেষে বুঝিল, ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া খেলিতে হইলে তাহার নিজের প্রবৃতি সম্পূর্ণ ভুলিতে হইবে—তাহাকেও তাহাদের একজন হইতে হইবে। কয়েকদিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রত্যেক ইঙ্গিতটির অর্থ সে শিখিযাছে। তারপর যে দিন নিজের প্রকৃতি ভুলিয়া ইঙ্গিতে তাহাদের খেলায় সাহায্য-যাচ্ঞা করিয়াছে, সেই দিনই পাশের বাড়ীতে এই নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়া স্থান লইয়াছে। তাহার পরদিন হইতেই পাম্ গাছের ছায়ায় নিয়মিত ভাবে সে তাহাদের ক্রীড়াসহচর হইয়াছে। ভাষা ও শ্রবণের ব্যবধান ঘুচাইয়া যে আসিয়া তাহাদের সহিত অভিন্ন-প্রকৃতি হইয়া মিশিল, তাহারা তাহাকে অন্তরেব সহিত ববণ করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিল না।

স্বামী কোনদিন সকালে আফিস হইতে ফিরিলে চারু তাহাকে লইয়া টানিয়া জানালার কাছে গিয়া ইহাদেরে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলে, তুমি এদের ডেকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি ওদের আদর কর্‌ব!

গোপালবাবু গলার টাই খুলিতে খুলিতে বিরক্ত হইয়া বলেন,—তা হবে 'খন; অত তাড়া কিসের? শুধু ওদের কেন? আমি সহর শুদ্ধ ছেলেমেয়ে তোমার দোরে ডেকে আন্‌ব—যত ইচ্ছে আদর করো!

তারপর মনে মনে ভাবেন, কি বিপদ! বাসাটা দেখ্‌ছি তা হলে উঠাতে হচ্ছে!

চারু নিত্য দ্বিপ্রহরে জানালা খুলিয়া চাহিয়া দেখে; ওই যে ছেলেটি, যেন দুধে-আল্‌তা গায়ের রংটী, চোখ দুটি বড় টানা টানা, ভাসা ভাসা; ঠোঁটের নীচেকার তিলটি, কি নীল, উজ্জ্বল! আহা, যদি সে কথা কহিতে পারিত!

একদিন এমনি ভাবিতে ভাবিতে মনে করে চাকরটাকে বলিয়া দুই একটি ছেলেকে ডাকিয়া আনে; কিছু খাবার কিনিয়া আনিয়া নিজে হাতে আদর করিয়া খাওয়াইয়া দেয়! আহা ছেলে মানুষ! এখানে ইহাদেরে আদর করিবার কেই বা আছে! মা বাপ বড় দুঃখে ইহাদেরে কোল-ছাড়া করিয়া দিয়াছেন। যদি কোনদিন মা বলিয়া ডাকিতে পারে, বাবাকে বাবা বলিতে পারে; এই আশায় তাঁহারা কতদূর হইতে জানি পথ চাহিয়া আছেন'

স্বামী আপিস হইতে আসিলে কাছে বসিয়া পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে চারু জিজ্ঞাসা করে,—হ্যাঁ গা, কতদিনে এরা এক-আধটু কথা বল্‌তে পারবে? এদের কি চিকিৎসা বা লেখাপড়া শেষ না হলে, মা'র কাছে যেতে দেওয়া হবে না?

গোপালবাবু অন্যমনস্ক ভাবে কহেন,—সে'জন্য ভাবনা কি? তা' আমি স্কুলের মাস্টারের কাছ থেকে আজ এক্ষুণি জেনে আস্‌ব। তারপর নীচে নামিয়া গোপালবাবু চাকরকে অনুচ্চস্বরে বলেন, ওরে, আপিসের চাপরাসিকে বলে দেখিস্ ত, সহরের আর কোথাও একটা ভাল বাড়ী পাওয়া যায় কি না!

চারুর অসহ্য হইয়া উঠিল! তাহার নিঃসন্তান নারী-হৃদয় এই অসহায় মূক-বধির মানব-সন্তানগুলিকে দেখিয়া বড় কাতর হইয়া উঠিল। একটু কাছে ডাকিয়া আদর করিবার জন্য প্রাণ তাহার চঞ্চল হইয়া পড়িল। পরে একদিন সত্য সত্যই চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল,—ওই

ছেলেগুলিকে ডেকে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বি? তোকে বখ্‌শিস্‌ দোবো!

কিষ্টদাস খুশি হইয়া চলিয়া গেল এবং কতক্ষণের মধ্যেই তিন চারিজনকে দুই হাতে ধরিয়া এক রকম টানিতে টানিতেই আনিয়া তাহার সম্মুখে হাজির করিল। ছেলেগুলি নির্বাক্‌ বিস্ময়ে চারুর দিকে চাহিয়া রহিল।

কি করিয়া ইহাদেরে সম্বোধন করিতে হইবে, কি ভাষায়ই বা ইহাদেরে আদর করিতে হইবে, চারু তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। সেও বিমূঢ়ের ন্যায় কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। একটি ছেলে ভয় পাইযাই যেন ছুটিয়া পালাইতে চাহিল। কিষ্টদাস তাহার পথ রোধ করিল। সে নিতান্ত অসহায়ের মত কেবল চক্ষুর জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। চোখে এত জল আসিতে ত চারু কাহাকেও কখনও দেখে নাই; উঃ কি জল! বৃষ্টির ফোঁটাব মত টস্‌ টস্‌ করিয়া অনবরত কেবল পড়িতেছেই। চারু তাহাকে হাত ধরিয়া টানিযা গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে চাহিল; অন্য ছেলেগুলিও পিছন পিছন গৃহের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

চারু দেরাজ খুলিয়া কিষ্টদাসের হাতে দুইটি টাকা দিযা কহিল, কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে নে' আয়!

চাকর টাকা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

চারু এতক্ষণে চাহিয়া দেখিল, হ্যাঁ, এই ছেলেটিকেই সে বরাবর লক্ষ্য করিত। কি সুন্দর টুকটুকে ছেলেটা! কোন্‌ মাব কোল খালি করিয়া এই বিভূঁই বিদেশে পড়িয়া আছে! বয়স ছয় কি ঊর্ধ্বে সাত; উজ্জ্বল কৃষ্ণতার চক্ষু দুইটিতে কি যেন এক স্নিগ্ধ শান্তি ঘুমাইয়া আছে! চারু ছেলেটিকে কাছে টানিয়া লইল; তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া মাথার চুলে হাত বুলাইতে লাগিল। অন্য ছেলেগুলি মুখ বিকৃত করিয়া একসঙ্গে হাসির মতই যেন কি একটা ইঙ্গিত করিল। চারু

তাহার অর্থ বুঝিল না। সে সকলকেই স্থির হইয়া বিছানার উপর বসিতে বলিল, কিন্তু কেহই বসিল না।

এ কি অপূর্ব এক মুখর নীরবতা! চোখ মুখের উপর দিয়া ভাষার বন্যা বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু তবু কণ্ঠের স্বরে তাহা ধরা দিতেছে না মাত্র। কেবল দুইটি চক্ষু দিয়া তাহারা দুইটি কান ও কণ্ঠস্বরের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেছে। কিন্তু কি সার্থক অভিনয়! মনে হয়, ভগবান্ ইহাদেরে যতটুকু ক্ষমতা একদিক দিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছেন, ততটুকু আর একদিক দিয়া আবার পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

চারু অস্থির হইয়া উঠিল; কি করিয়া ইহাদের যোগ্য সম্বর্ধনা করিবে, ভাবিয়া আকুল হইল। কি করিয়াই বা দুই একটা সুখ দুঃখের কথা ইহাদেরে জিজ্ঞাসা করে!

ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। সে দেরাজ খুলিয়া একটা নোট্খাতা ও পেন্সিল বাহির করিল। তাহাতে বড় বড় করিয়া লিখিল, তোমার নাম? ইহাতে লিখিয়া দাও!

তারপর খাতাটি সেই ফর্সা ছেলের হাতে তুলিয়া দিয়া ব্যগ্র হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অন্য ছেলেগুলি আবার পূর্বের মত হাসিতে লাগিল। তারপর কি ভাবিয়া সকলে সহসা একসঙ্গে ছুটিয়া একেবারে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। চারু ইহাদের অঙ্গভঙ্গির কোন অর্থই বুঝিল না। যে ছেলেটি রহিল, সে বড় স্থির! দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে যে মূকবধির বিদ্যালয়ের ঐ ছেলেগুলির সতীর্থ এ-ও একজন?

ছেলেটি চারুর মুখের দিকে করুণভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। চারু তাহাকে সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ইঙ্গিতে নোট্ বইটী দেখাইয়া দিল!

অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া অতি সন্তর্পণে পেন্সিলটি লইয়া ছেলেটী খাতার উপর বড় বড় করিয়া লিখিল, 'খোকা।'

চারু সশব্দে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর নিজে তাহার হাত হইতে খাতাটী লইয়া আবার লিখিয়া দিল, তোমার ভাল নামটী কি?

খোকা এবার অনেকক্ষণ ধরিয়া কি যেন চিন্তা করিল, তারপর অত্যন্ত করুণভাবে খাতাটী হাতে লইয়া এবার বানান ভুল করিয়া লিখিল, "যানি না।"

চারু তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আপন মনেই যেন বলিতে লাগিল, না জান্লে! তোমার ডাক নাম খোকা বলেই তোমাকে ডাক্‌ব।

খোকা কথা কহিতে পারিল না, কারণ, কথা কহিতে কেহ তাহাকে বলে নাই। সে শুধু নির্বাক্ বিস্ময়ে অপরাধীর মত মুখ তুলিয়া চারুর দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিষ্টদাস খাবার কিনিয়া লইয়া আসিয়া যখন দেখিল যে, এক জন ছাড়া আর বাকি সব পলাইয়া গেছে, তখন জিজ্ঞাসা করিল, ওদের ধরে আন্‌ব মা ঠাক্‌রুণ?

চারু বলিল, না, ওরা বড় দুষ্ট।

তারপর খোকার চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, এই ছেলেটি বেশ! কেমন নরম স্বভাব! আহা! ভগবান মিছেই ওর মুখ থেকে কথাখানি কেড়ে নিয়েছেন।

সহসা খোকার দুই চক্ষু ছাপিয়া জল আসিল। চারু আচল দিয়া চোখ দুইটি মুছাইতে মুছাইতে কহিল, এই ত এক রত্তির ছেলে, সংসারের কিই বা বুঝে; কিন্তু জীবনে যে এর কি দুঃখ, কিসের অভাব, বঝতে ত আর বাকি নেই! শুধু চোখ দুটির দিকে তাকালেই বুকের দুঃখের কথা জানা যায়।

চারু পরিপাটি করিয়া আসন পাতিয়া একটি ঠাই করিল; একখানি রূপার রেকাবীতে খাবার সাজাইয়া খোকাকে টানিয়া লইয়া আসনে বসাইল ও খাইতে ইঙ্গিত করিল।

চারু সম্মুখে বসিয়া আপন মনেই বকিয়া যাইতে লাগিল। এই টুকু জিনিস মুখে দিতে অমন বাবে বারে জল খেতে হয়? নাও, এইটুকু আর বাকী রেখো না; লক্ষ্মী ছেলে তুমি; আমার বিশ্বাস, শীগ্‌গিরই তুমি কথা বল্‌তে পারবে! ইস্কুলে মাষ্টারদের বলে দেব; যত টাকা লাগে আমি দোব! তবু তোমার মুখে একদিন হলেও আমি কথা শুনে যাব।

খোকা স্থির হইয়া শুনিল,—যেন কি একটা কত বড় অন্যায় করিতেছে; এখন পলাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়—এমনই ভাবের একটা আকুল দৃষ্টি ভরা দুইটি চোখ তুলিয়া সে অত্যন্ত করুণভাবে চারুর দিকে চাহিল। চারু তাহার খাওয়া শেষ হইয়াছে দেখিয়া হাত ধরিয়া আসন হইতে তুলিল, তারপর টানিয়া বিছানার কাছে আনিয়া নিজের কাছে বসাইল। একটি চিরুণী লইয়া তাহার অযত্ন-বর্ধিত লম্বা লম্বা চুলগুলি আচ্‌ড়াইয়া একটি পরিপাটি সিঁথি কাটিয়া দিল, তারপর একটি রুমাল লইয়া মুখখানি মছাইয়া দিল; সুন্দর মুখখানি যেন রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

চারু মনে করিল, ইহাকে অধিক কাল আর এখানে আট্‌কাইয়া রাখা সমীচীন হইবে না, তাই তাহাকে ইঙ্গিতে বুঝাইল, -আজ তবে যাও, মাষ্টারেরা হয়ত এতক্ষণ তোমাকে খুঁজ্‌তে [illegible], মিছামিছি যদি [illegible] খাও, [illegible] আমার কথা ব'লো, কেউ কিছু বল্‌বে না। আর বারবার তাহাকে বুঝাইয়া দিল, নিত্য তাহার এখানে আসিতে হইবে; নিত্য একবার, যখন সময় পায়, না আসিলে চলিবে না; চাকর দিয়া আজিকার মত ধরিয়া আনিবে। বুঝাইয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত আনিয়া দিয়া গেল। খোকা উদ্‌গত অশ্রু গোপন করিয়া সদর দরজা দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

চারু উপরে ফিরিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরেই গোপালবাবু আপিস হইতে ফিরিলেন। চারু আর আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না; ব্যগ্রভাবে কহিল,—আজ যা' আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল! ইস্কুলের কয়েকটি

ছেলেকে ডাকিয়ে এনেছিলুম; একটি ছেলে যা' চমৎকার! কাল আস্‌বে, তোমায় দেখাব।

গোপালবাবু অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন, তাই ত, ভারী আশ্চর্য ত! বলিয়া অনাবশ্যক একটু উচ্চহাস্য করিয়া দৈনিক ইংরাজি খবরের কাগজটা লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইযা গেলেন।

ফটকের বাহিরে আসিয়া খোকা ভাবিল, এ' আমি কি করিলাম? একজনের নিকট মিথ্যা ভঙ্গি করিয়া কেন এ' খাবার আদায় করিলাম? যদি কখনও তিনি জানিতে পারেন যে, খোকা মিথ্যা কপটতা করিযাছে! প্রথম হইতে সে কথা কহিলেই ত পারিত! তাহার ইচ্ছা হইত, তিনি আদর করিতেন, ইচ্ছা না হইত, খেদাইয়া দিতেন। কিন্তু এ' সে কি করিল, নিজেই বুঝিয়া পাইল না।

ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইতেই যতীশবাবু গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাহাকে ধম্‌কাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হারামজাদা, দিব্যি মাথায় টেরি কেটে তুপুর রোদে কোথায় বেরিয়েছিলি?

খোকা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া দাদার গালি কেবল তুই কান দিযা শুনিয়া যাইতে লাগিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া যতীশবাবু দ্বিগুণ ক্ষেপিয়া গিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহার গালে তুই তিনটি চড় কসাইয়া দিলেন; খোকা তথাপি নিরুত্তর; কেবল নীরবে চক্ষুজল ফেলিয়া কাঁদিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তুই তিন দিন হইয়া গেল, খোকা আর আসিতেছে না দেখিয়া চারু অগত্যা কিষ্টদাসকে পাঠাইল। খোকা ভাবিয়াছিল, সে আর ঐ বাড়ীতে যাইবে না। দাদার ভয়ে নহে, সে মিথ্যাবাদী হইতে পারিবে না, এই জন্য। কিন্তু কিষ্টদাস যখন তাহাকে তাহার নিয়মিত খেলার জায়গাটি হইতে আজিও সেদিনের মত ধরিয়া লইয়া চলিল, তখন সে আর মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না।

চারু তাহাকে দেখিয়া খুশি হইল। ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া কহিল, খোকা, তুমি বড় দুষ্ট হ'য়েচ; দু'দিন এ'লে না কেন? বলিয়া কৃত্রিম রাগভরে ভ্রূভঙ্গি করিল। তারপর ব্রাকেট হইতে একটি নূতন সিল্কের জামা লইয়া তাহাকে পরাইল; তাহার আধ-ময়লা পরিধানের কাপড়খানি ছাড়াইয়া একটি নূতন কালাপেড়ে সিমলাই পরাইল; খোকা নির্বাক হইয়া কেবল চাহিয়া রহিল, ইঙ্গিতে নিষেধ-টুকুও করিতে পারিল না।

চারু সেদিনের মত আবার পরিপাটি করিয়া তাহার মাথায় একটি সিঁথি কাটিয়া দিল; মুখে পাফ্ দিয়া একটু পাউডার মাখাইয়া দিল, চিবুকে ধরিয়া সস্নেহে ললাটে একটিবার চুম্বন করিল। তারপর সেদিনের নোটখাতাটি বাহির করিয়া লিখিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার মা বাপ কোথায়?

খোকা চারুর মুখের দিকে করুণভাবে একবার চাহিল; একবার বুঝি মনে হইল, যে তাহাকে এত স্নেহ করে, এতখানি যত্ন করে, তাহার নিকট সে কি এ কপট অভিনয় করিতেছে? তাহার সবল শিশু-প্রকৃতি যেন ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই পেন্সিল তুলিয়া লইয়া উত্তর লিখিল, 'কেউ বাঁচিয়া নাই।'

চারুর বুকের ভিতরটা যেন ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এক রত্তির এই শিশু; তায় আবার মুখ ফুটিয়া কথাটি কহিতে পারে না, সে কবে তাহার বাপ মাকেও খোয়াইয়া বসিল? চারু বুঝিল, এই অনাথ নিরাশ্রয় মূক ও বধির ছেলেটিকে কেহ হয় ত কোথাও কুড়াইয়া পাইয়া সরকারের আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই ইহার সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার শিশু-চিত্তকে ব্যথিত করিতে চাহিল না। কতক্ষণ নীরব থাকিয়া চারু কি ভাবিল, তারপর সহসা নোট বইটা হইতে একটুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া লিখিতে লাগিল,—খোকাকে সখ করিয়া নিজের হাতে কাপড় জামা পরাইলাম, কেহ অন্য কিছু ভাবিবেন না—চারুশশী দেবী।

লেখা শেষ হইলে কাগজখানা খোকাকে বুঝাইয়া দিয়া তাহার নূতন জামার পকেটে রাখিয়া দিল। খোকা কাল আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইল।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া খোকা দেখিল, তাহার দাদা সেই দ্বিপ্রহরের দিকে কোথায় যে বাহির হইয়া গেছেন, এখনও ফিরেন নাই। চুপি চুপি সে কাপড় জামা খুলিয়া সন্ধ্যা কালেই বিছানায় শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া সেইদিন সে ভাবিল, কি অপরাধই সে করিতেছে! তিনি তাহাকে বোবা ও কালা জানিয়াই যে দয়া করিয়া এত যত্ন ও স্নেহ করিতেছেন, এ' বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। সেইজন্য সে এখন কাহারও সহিত কথা কহিয়া নিজের সত্য পরিচয় পাইয়া যেন চম্‌কাইয়া উঠে। এই ভাবে তাহাকে এই জীবনে কেহ আদর করে নাই, তবে দৈবাৎ একজন যদি গায়ে পড়িয়া আদর করিতে লাগিল, সেও তাহার সত্যকার রূপ চিনিতে না পারিয়াই আদর করিল। হয়ত সত্য কথা জানিলে আর ডাকিয়া আদর নাও করিতে পারে। হয় ত ভাবিবে, ছেলেটা কি মিথ্যুক, কি নির্লজ্জ কপটাচারী, নিজের সত্য রূপ গোপন করিয়া, একজনের অপ্রাপ্য অধিকার আদায় করিয়া লইল! সে স্থির করিল, কাল দ্বিপ্রহরে এই সমস্ত উপহারের সামগ্রী লইয়া সে তাহার প্রকৃত পরিচয় দিতে যাইবে; তাহাকে তিনি ক্ষমা করেন ত করিলেনই, নহিলেও তাহার দুঃখ নাই; সে মিথ্যার ভাগী হইল না।

খোলা জানালা দিয়া দেখা যায়, আকাশটা ভরিয়া তারা ফুটিয়াছে; দেখিতে দেখিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে কি স্বপ্ন দেখিয়া ঠোঁট দুইটি যেন অভিমানের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, চোখের পাতা দুইটি বারে বারে নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে খোকা পাশের বাড়ীতে গিয়া দেখিল, সদর দরজা খোলা পড়িয়া আছে; ঘরের ভিতরের আসবাব পত্র কিছুই

নাই ; লোকজন বাড়ী ছাড়িয়া কখন চলিয়া গেছে। সহসা যেন তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া কাঁদে ; কিন্তু চীৎকার করিলে যদি কেহ শুনিতে পায়, তবে কি মনে করিবে ? হয়ত মনে করিবে, এই ত ছেলেটি সেদিন চুপ করিয়া থাকিয়া এই বাড়ীতে বসিয়া সন্দেশ খাইয়া গেল, কাল কথাটি না কহিয়া নূতন জামা কাপড় লইয়া গেল, আজ ত নিরিবিলিতে বেশ চেঁচাইতেও পারে ! কি যেন মূঢ়তায় অভিভূত হইয়া সে শূন্য বাড়ীটায় নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। আজ সে তাহার সমস্ত অপরাধ অকপটে স্বীকার করিতে আসিয়াছিল, ইচ্ছা হইলে ক্ষমা করিয়া তিনি আদর করিতেন, নহিলে প্রবঞ্চক ভাবিয়া খেদাইয়া দিতেন, কিন্তু এই জীবনে তাহার সুযোগ আর সে পাইল না।

ভাড়াটিয়ারা চলিয়া গেল দেখিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আবার আসিয়া তাহাদের আগেকার স্থানটুকু দখল করিল, খোকাকেও তাহারা টানাটানি করিয়া খেলায় লইতে চাহিল, সে নিরুত্তরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

সেদিন হইতেই অভিমানে সে তাহার কণ্ঠ হইতে ভাষাকে নির্বাসন দিল। যে তাহাকে ভালবাসিল, স্নেহ করিল, তাহাকে স্মরণ রাখিতে হইলে তাহার বাক্‌শক্তি বিসর্জন না দিয়া উপায় কি ? ভাষার অঞ্জলিতে তাহারই যদি পূজা করিতে না পারিল, তবে এই নিষ্ফল সম্পদ তাহার আর কি উপকারে আসিবে ? ভালবাসার পাত্রকে যাহা দিতে পারিল না, এমন কি তাঁহার কাছ হইতে সে যাহা গোপন করিয়া চলিল, তাহা সে দশজনের সস্তা হাটে বিকাইবে কোন প্রাণে ?

ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিয়া কহিল, বোধ হয় এই বিদ্যালয়ের ছেলেদের সঙ্গে সর্বদা মিশিয়া সে তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি ভুলিয়া যাইতেছে। শীঘ্র এখান হইতে সরাইয়া কোন আত্মীয়ের বাড়ী রাখিয়া দেখা যাইতে পারে। যতীশবাবু তাহার জন্য অবশেষে এই ব্যবস্থাই করিলেন।

পুনর্জন্ম

তারাকৃষ্ণবাবু দীর্ঘকাল রেলবিভাগে কার্য করিয়া অবসর লইবার প্রাক্কালে স্থির করিলেন, একবার সস্ত্রীক পশ্চিমের তীর্থ কয়টি ঘুরিয়া আসিবেন। শুনিয়া তাহার সহকর্মীরা বিস্মিত হইল ; কিন্তু যাহারা আভ্যন্তরীণ সমস্ত কথা জানিত, তাহারাই মুখ টিপিয়া হাসিল।

কৃপণ বলিয়া তারাকৃষ্ণবাবুর বড় দুর্নাম ছিল। একবার যখন তিনি মেমারি স্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার হিসাবে রাত্রে কর্তব্য সম্পাদন সম্পর্কে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে টিকেট সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন একজন পশ্চিমদেশীয় স্ত্রীলোক তাহাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তারাকৃষ্ণবাবু টিকেট চাহিলে টিকেট ত সে দেখাইতে পারিলই না, তদুপরি স্ত্রীলোকটি রাত্রির জন্য তাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিল। তারপর অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা, অনেক অনুনয় বিনয় ও অশ্রুপাতের ফলে এই স্থির হইল যে, সেই রাত্রির জন্য তিনি তাহার বাড়ীতে তাহাকে আশ্রয় দিবেন।

স্টেশনের সংলগ্ন তাহার জন্য নির্দিষ্ট সরকারি বাসগৃহ ছিল, তিনি সেখানে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের নিঃসন্তানা স্ত্রীকে লইয়া বাস করিতেন। রোরুদ্যমান স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে লইয়া অত্যন্ত বিরক্তি-সহকারে তারাকৃষ্ণবাবু নিজের বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন যে, আগামী কল্য তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই যেন ইহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়।

তারাকৃষ্ণবাবুর স্ত্রীর নাম উমা—অত্যন্ত সরলপ্রাণা ও মিষ্টভাষিণী। উমা খুঁটিনাটি করিয়া স্ত্রীলোকটি সমস্ত সংবাদ লইতে লাগিল। তাহার

অশ্রুরুদ্ধ অর্ধেক হিন্দী অর্ধেক বাংলা কথা হইতে এই বুঝা গেল যে, তাহার বাড়ী মথুরায়। তাহার স্বামী মথুরার পাণ্ডা। প্রত্যেক বার যাত্রী সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার স্বামী বাংলাদেশে আসিয়া থাকে, এইবারও আসিয়াছিল ; কিন্তু আসিয়া বর্ধমান জিলার কোন গ্রাম হইতে যে সে একখানি পৌঁছপত্র দিয়াছিল, তারপর পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। বাড়ীতে আর কেহ নাই যে সন্ধানে আসিবে ; সমব্যবসায়ীরাও আসিতে পারে না, আসিলে তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। বাধ্য হইয়া তাহাকেই তাহার স্বামীর খোঁজের জন্য বাহির হইতে হইয়াছে। কিন্তু অপরিচিত দেশ, তাহাতে উপযুক্ত অর্থের অভাব ; গায়ের অলঙ্কার কয়খানি বিক্রয় করিয়া তাহার পথের খরচ চলিয়াছে, এখন সম্পূর্ণ বিদেশে তাহাকে বাধ্য হইয়া ভিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

উমা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, তুমি কোন চিন্তা করো না, আমি যেমন ক'রে হোক্, তোমাকে দেশে পৌঁছে দো'ব।

স্ত্রীলোকটি বলিল, স্বামীর সন্ধানের জন্য দেশ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, তাহাকে না লইয়া কোন্ মুখে আর দেশে ফিরিব? তাহাকে না পাই, এই দেশে পড়িয়াই মরিব।

উমা বলিল, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমরা তোমার স্বামীর খোঁজ ক'রে দো'ব।

পরদিন তারাকৃষ্ণবাবু একটু বিলম্বে ঘুম হইতে উঠিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপদটা দূর হ'য়েছে ত?

উমা বলিল, আমি ভর্ পোয়াতী একটা মেয়েমানুষকে নিরাশ্রয়ে রাস্তায় বা'র ক'রে দিতে পার্‌ব না।

তারাকৃষ্ণবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, রাস্তায় বা'র ক'রে দেবার কথা কি আমিই বল্‌ছি? তবে কি না, তাকে কোল্‌কাতার কোন হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেই কি ভাল হতো না? ঐ অবস্থার একটা স্ত্রীলোককে

এখানে রাখা কেমন দেখায়, সে কথাটা একবার ভেবে দেখেছ?

কিন্তু তারাকৃষ্ণবাবুর আর অধিক ভাবিতে হইল না। স্ত্রীলোকটি সেই দিনই সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহেই একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া অত্যন্ত দুর্বলতার জন্য তিন চারিদিনের মধ্যেই পরলোক গমন করিল। সেই দিন হইতে উমা স্বহস্তে শিশুটির পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিল।

এই আকস্মিক অবস্থা-বিপর্যয়ে তারাকৃষ্ণবাবু যতই বিমূঢ় হইয়া গেলেন, উমা ততই প্রফুল্ল হইল। তাহার নিঃসন্তান নারীহৃদয় এই নবাগত শিশুকে দেবতার আশীর্বাদের মত বরণ করিয়া লইল। তারাকৃষ্ণবাবু স্ত্রীর উপর কোন কথা কহিতে পারিতেন না, তবে যেখানে নিজের স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইত, সেখানে স্ত্রীকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাহাতেও শেষ পর্যন্ত সফলকাম হইতে পারিতেন না। এক একবার উমার নিঃসন্তান জীবনের দিকে চাহিয়া তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইত; ভাবিতেন, বেচারীকে আমি কি দিতে পারিলাম? নিজের সেই বয়স ত নাই-ই, এমন কি, দুই দণ্ড সময়ও নাই যে, স্ত্রীর শূন্য অবসরগুলি কথায় আলাপে ভরিয়া রাখি। সেইজন্য ইচ্ছা করিয়াই স্ত্রীর আব্দারগুলি নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেন। এইবারও তাঁহার ব্যতিক্রম হইল না। স্ত্রীর যথেচ্ছ আব্দার রক্ষা করিয়া তিনি আরও দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাটাইয়া দিলেন, ক্রমে তাহার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের সময় হইয়া আসিল।

তারাকৃষ্ণবাবুর পশ্চিম যাত্রার মূলে এই উদ্দেশ্যই ছিল যে, তীর্থযাত্রার নাম করিয়া মথুরায় গিয়া তিনি এই বালকটির কোন আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান করিবেন। সম্ভব হইলে তাহাকে সেখানে রাখিয়া আসিবেন।

তখন আশ্বিন মাস। তারাকৃষ্ণবাবু জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করিয়া স্ত্রী ও চন্দনকে লইয়া পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উমা কিংবা চন্দন তারাকৃষ্ণবাবুর মনের কথা অনুমানও করিতে পারিল না।

চন্দন এই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের বাহিরে চলিয়াছে—রেল-লাইনের দুইধারে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত অনুচ্চ পাহাড়ের সারি, তরঙ্গায়িত নীরস প্রস্তর-ভূমিতে শ্যামল পলাশ ও মহুয়া গাছের ঘন বন, কোথাও অন্তঃসলিলা প্রস্তর-শয়না পার্বত্য নদী—এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য তাহার কিশোরচিত্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। রাত্রি জাগিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি অনেক হইতে দেখিয়া উমা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, বেঞ্চির উপর বিছানা ক'রে দিচ্ছি, একটু ঘুমো! বলিয়া জোর করিয়াই তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া গায়ে একটা চাদর টানিয়া দিল।

কি একটা স্টেশনে গাড়ী ভিড়িতেই উমা তারাকৃষ্ণবাবুকে বলিল, তুমি লক্ষ্য রেখো, পাটনা স্টেশনে পৌঁছুলে চন্দনকে জাগিয়ে খাইয়ে আন্‌তে হ'বে।

তারাকৃষ্ণবাবু বলিলেন, তুমি অত ব্যস্ত হ'য়ো না, পাটনা এখনও অনেক দূরে, রাত্রি বারটার আগে ট্রেন সেখানে পৌঁছুবে না।

উমা একটু উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াই বলিল, ব্যস্ত হ'ব না? ছেলেটা কিছু মুখে না দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ুক! একবার ঘুমিয়ে পড়্‌লে তাকে ডেকে তুলে খাওয়ানো যে কত কষ্ট, তা'ত কেবল আমিই বুঝি!

তারাকৃষ্ণবাবু হাসিয়া বলিলেন, আমি ত আর ইঞ্জিনের ড্রাইভার নই যে এক দৌড়ে পাটনায় গিয়ে খাবারের সময়ের আগেই পৌঁছুব? এই স্টেশনে গরম দুধ পাওয়া যায়, কিছু বরং কিনে নাও। তারপর পাটনায় গিয়ে ব্যবস্থা কর্‌লেই হবে।

অনেক রাত্রে ট্রেন পাটনায় পৌঁছিল। উমা বলিল, এখানে নেমে আর কাজ নেই, অত রাত্রে আমি ছেলেটার ঘুম ভাঙ্গাতে পারব না, কাল সকালে একেবারে কাশীতে গিয়ে নাম্‌লেই চল্‌বে। তারাকৃষ্ণবাবুও আপত্তি করিলেন না।

মথুরায় আসিয়া তারাকৃষ্ণবাবু বিশ্রাম ঘাটে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া

করিলেন; ইচ্ছা এইখানে কিছুদিন কাটাইয়া পরে হরিদ্বার অভিমুখে যাইবেন। তিনি যত সহজে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কার্যত দেখিলেন, তাহা তত সহজ হইবে না। তাহার প্রধান বাধা উমা। কিন্তু তিনি এইবার মনে করিলেন, এই দুর্বলতার আর প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না। অনেকদিন তিনি সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন একটু কঠিন হইয়াই তাঁহাকে স্ত্রীর সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি মনে করিলেন, চন্দন সম্বন্ধে তিনি যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা তিনি স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিবেন। কিন্তু দিন যাইতে লাগিল, তিনি মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

একদিন ঘাট হইতে স্নান করিয়া উমা বাড়ী ফিরিয়া দেখে, চন্দন ঘরে নাই। চঞ্চল বালক, ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ; তথাপি উমা তাহাকে ক্বচিৎ বাহিরে যাইতে দিত। স্নানের সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে সাহস পায় না, যেমন খাড়া সিঁড়ি, তাহার উপর জল পড়িয়া পড়িয়া তাহা সর্বদা পিছল হইয়া থাকে। সেইজন্য তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য বাড়ীতে একাকী রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল।. তারাকৃষ্ণবাবু সকাল হইতেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

চন্দন দুরন্ত ছেলে, কিন্তু উমার কথার অবাধ্য নহে। উমা ঘরে ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিল, নিশ্চয়ই তাহার কোন বিপদ হইয়াছে; কিন্তু এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করিয়া যখন কোথাও দেখিতে পাইল না, তখন অগত্যা স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহরে তারাকৃষ্ণবাবু বাড়ী ফিরিলেন। উমা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, চন্দনকে দেখেছ? তাকে সকাল থেকেই খুঁজে পাচ্ছিনে।

তারাকৃষ্ণবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, চন্দনের আত্মীয় একটা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল; সে তার ভার নিয়েছে, তাকে সেখানে রেখে এসেছি।

উমা মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেল। স্বামীকে সে শ্রদ্ধা করিত। তাহার নিজের নারী-জীবনের কোনদিক পূর্ণ না হইলেও . বৃদ্ধ স্বামীকে সে ইহার জন্য কদাচ দায়ী করিত না। কিন্তু আজ তাহার এই নীচ আচরণে মূহূর্তে স্বামীর উপর তাহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। বলিল, রেখে এসেছ, বেশ ক'রেছ, আমাকে তা'র আগে একটু জানিয়ে নিলে কি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা'কে ধ'রে রাখ্‌তাম? যা'বার সময় তা'কে একটিবার দেখেও দিতে পারলাম না! বলিয়া উদ্বেলিত অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিতে দ্রুত ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

তারাকৃষ্ণবাবু তাহার পশ্চাতে আসিয়া বলিলেন, দেখ, এ তোমার অন্যায়! পরের ছেলে, কি জাত কিছুই ঠিক নেই, তা'কে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি ভাল দেখায় না। দশ জনে মন্দ বলে।

উমা কোন জবাব দিতে পারিল না, বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফোপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তারাকৃষ্ণবাবু বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন, তারপর চাকুরি হইতে অবসর লইতেছেন, এই অবস্থায় অত্যন্ত নিবিড় ও একান্ত ভাবে স্ত্রীর সেবা ও যত্ন কামনা করিতেন। কিন্তু তিনি দেখিতেন, চন্দনের প্রতি উমার আকর্ষণ ক্রমে এতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে, তাঁহার প্রাপ্য সেবা যত্নটুকু হইতে তিনি প্রায়ই বঞ্চিত হইতেছেন। তারাকৃষ্ণ বাবু বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশিতে পারিতেন না। তাঁহার অনাত্মীয় ও নিঃসহায় বার্ধক্য-জীবনের মধ্যে এক আধটু স্নেহ ও ভালবাসার স্পর্শ লাভের জন্য তিনি অন্তঃপুরে ছুটিয়া আসিতেন। কিন্তু সেখানে আসিয়াও কোন সাড়া পাইতেন না। অজ্ঞাতকুলশীল এক বিদেশীয় বালক তাঁহার সে পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিত। সেইজন্য তিনি মথুরায় আসিয়া গোপনে চন্দনকে এক অনাথ আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া উমার কাছে মিথ্যা করিয়া ঐ গল্পের অবতারণা করিলেন। উমা স্বামীর নির্মমতায় অত্যন্ত আহত হইল; কিন্তু স্বামীর কথায় অবিশ্বাস করিল না।

উমা স্বামীকে বলিল, পনর বৎসর একটা ছেলেকে জন্ম থেকে পালন কর্‌লে, তা'কে আজ হঠাৎ ছেড়ে দিতে তোমার এতটুকুও বাধ্‌ল না? তোমার মত কঠিন-হৃদয় পুরুষ আমি কল্পনাও কর্‌তে পারিনে।

তারাকৃষ্ণবাবু এই কথায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন; স্ত্রীর এই অপবাদে মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন, পরের ছেলেকে চিরকাল এমন ক'রে ধ'রে রাখ্‌বার অধিকার আমাদের নেই: যতদিন শিশু ছিল, ততদিন পালন ক'রেছি; এখন বয়স হ'য়েছে, তা'কে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম, ইহাই ত কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি।

উমা বিবাদ করিতে জানে না, করিতে ভালবাসে না। সে মনে করিল, আজ হইতে প্রকৃতই সে নিঃসন্তানা। কিন্তু এই কথা লইয়া স্বামীর সঙ্গে আর কোন বচসার সৃষ্টি করিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইত।

তারাকৃষ্ণবাবু মনে করিলেন, এইবার স্ত্রীকে নূতন করিয়া হাতের মুঠিতে পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন, যতই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ততই একজন অত্যন্ত নিকট নিঃস্বার্থ কোন আত্মীয়ের স্পর্শ তাঁহার জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্ত্রীর সমগ্র সেবার মধ্যে আর কেহ অংশীদার এখন নাই, ইহাই মনে মনে কল্পনা করিয়া তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি মথুরা ত্যাগ করিয়া গৃহের দিকে ফিরিলেন; তীর্থের পথে অধিক আর অগ্রসর হইলেন না।

তারাকৃষ্ণবাবু কর্ম্মস্থলে আর ফিরিলেন না; মনে করিলেন, সেখানে চন্দনের স্মৃতি উমাকে ব্যথিত করিতে পারে। তাহাকে লইয়া তিনি একেবারে তাঁহার হুগ্‌লী জেলার দেশের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাকুরিটি পরিত্যাগ করিলেন।

তারাকৃষ্ণবাবুর বহু দিনের বুভুক্ষু আত্মা উমার সম্মুখে একবিন্দু স্নেহ যাচ্ঞা করিল। উমা স্নেহ-কৃপণা নহে। চন্দনকে হারাইয়া তাহার যে স্নেহ-প্রবৃত্তি বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, বৃদ্ধ স্বামীর সেবা ও যত্নে তাহা পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল।

দেশের বাড়ীতে তারাকৃষ্ণবাবুর কেহই ছিল না। নূতন করিয়া ঘর দুয়ার বাঁধিয়া সংসার পাতিতে তাঁহার যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। তারাকৃষ্ণবাবু একদিন উমাকে বলিলেন, আমাকে আজ কোলকাতা যেতে হ'বে।

উমা জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

তারাকৃষ্ণবাবু বলিলেন, তোমার কাছে সকল কথার আমি অত জবাব দিতে পারি নে। বিশেষ প্রয়োজন আছে, আজই রাত্তিরে ফির্ব।

উমা হাসিয়া বলিল, আমি জানি তোমার কোনই প্রয়োজন নেই! আর যা'বে ত আমাকেও নিয়ে চল। আমি মূহূর্ত এখানে একা থাক্‌তে পার্ব না। তারাকৃষ্ণবাবু অগত্যা কলিকাতা যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন।

গ্রামে আসিয়া তারাকৃষ্ণবাবু কিছু জায়গা-জমি করিয়াছিলেন। লোকজন খাটাইয়া নিজেই তিনি সম্বৎসরের প্রায় সমস্ত ফসলই নিজের ক্ষেতে চাষ করাইয়া লইতেন। সেই বার ধান কাটার সময় পড়িয়াছিল, চাকরেরা পাকা ধানের আঁটি সুবিধা পাইলেই সরাইয়া ফেলে। সেইজন্য তারাকৃষ্ণবাবু মনে করিলেন, মাঠে গিয়া নিজে সমস্ত তদারক করিবেন। তিনি সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া উমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি একটু মাঠের দিকে যাচ্ছি। ফির্‌তে বেলা হ'বে।

উমা বলিল, তোমাকে মাঠের রোদ্দুরে এখন গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কোন কাজ নেই; যতবার ইচ্ছে, আমি তামাক সেজে দিচ্চি, তুমি রোয়াকে ব'সে ব'সে টান, আমি ততক্ষণ রান্নাবান্না করি।

তারাকৃষ্ণবাবু বলিলেন, চাকর-বাকরে সমস্ত ধান চুরি করে নিয়ে গেল, একটু সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তদারক কর্‌লে ভাল হ্ত।

উমা হাসিয়া বলিল, তা হলে, আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে চল। আমিও তদারক কর্‌ব। সে আরও ভলে হবে!

তারাকৃষ্ণবাবু সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন; অনুমানে মনে হইল, অর্ধেক ধান চুরি গিয়াছে।

তারাকৃষ্ণবাবু বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, রাত্রি বেলায় সকাল সকাল খাইয়া দাইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন। উমা খাইয়া দাইয়া রান্নাঘর গুছাইয়া যখন শুইতে আসিত, তখন তারাকৃষ্ণবাবুকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিত; বলিত, আজ বড় গরম পড়েছে, চল ছাতে গিয়ে বসে গল্প করি।

তারাকৃষ্ণবাবু বলিতেন, বুকে সর্দিটা প্রায় বসে গিয়েছে, আর বাত্তির জেগে ঠাণ্ডা লাগাতে পারিনে।

উমা সে কথা কাণে তুলিত না, বলিত, তাতে কি হযেছে,? দেখ্‌ছ না, বাইরে কি চমৎকার জ্যোৎস্না! তারাকৃষ্ণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতেন।

তারাকৃষ্ণবাবু কখনও মনে করেন, একটা পোষ্যপুত্র লইলে হয়ত সকল আপদ চুকিয়া যায়; কিন্তু উমার কাছে এই কথাটা পাড়িতে সাহস পাইতেন না। আত্মকৃত অপরাধের জন্য নিজেই যেন মরমে মরিয়া থাকিতেন।

তারাকৃষ্ণবাবু এক মুহূর্তের জন্যও ঘরের বাহির হইয়া বিষয় আশয়ের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না; পাড়াগাঁয়ের দশজনের সঙ্গে একটু মিলিয়া মিশিয়া গল্প করিতে পারেন না; উমার যথেচ্ছ ছেলেমানুষী ব্যবহার তাহার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতে লাগিল। যে স্নেহকে তিনি একান্তভাবে কামনা করিয়াছিলেন, দূর হইতে তিনি যাহাকে অত্যন্ত কমনীয় ও মনোরম বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহার বাস্তব সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাহাতে আজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া তিনি তাহা হইতে

এখন পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। স্নেহই তাঁহার এখন দুরন্ত বন্ধন হইয়া দাঁড়াইল। তিনি এখন ইহা হইতে মুক্তির জন্য কাতর ভাবে চতুর্দিকে উপায় সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই যে বাহিরের চির চঞ্চল জগৎ, তাহার সহিত তিনি সমস্ত যোগাযোগ পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের বদ্ধ পঙ্ক কুণ্ডের মধ্যে নিয়ত পচিয়া মরিতেছেন। এক মুহূর্ত নিজের অবস্থার কথা কল্পনা করিবার পর্যন্ত অবসর নাই। তাহাকে কোথাও একাকী বসিয়া ভাবিতে দেখিলে উমা ছুটিয়া আসিয়া বলিবে, এখানে গুম্ হইয়া বসে থাকার চাইতে রান্নাঘরে একটু আমার কাছে বসবে চল, একটু গল্প করব।

গল্প করিবে, কি গল্প করিবে? উমার সঙ্গে যে গল্প তাহাতে আর নূতনত্ব কোথায়? এখন তাহার বয়ঃক্লান্ত জীবন একটু নিরুপদ্রব বিশ্রাম প্রার্থনায় উন্মুখ হইয়া থাকে, কিন্তু হতভাগ্য তারাকৃষ্ণ নিজেই তাহার বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে।

একদিন বর্ধমান হইতে এক জরুরী তার পাইয়া তারাকৃষ্ণবাবু উমার কাছে আসিয়া বলিলেন, আমার এখুনি বর্ধমান যেতে হবে। কোম্পানির কাছে কিছু টাকা আমার পাওনা আছে, আপিস থেকে গিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে।

উমা বলিল, এতদিন পর রেল কোম্পানী তোমাকে আবার নোতুন কি বখ্‌শিস্ দেবে? যেতে হলে আমাকে নিয়ে চল।

অনেক সাধ্যসাধনায়ও উমা নিরস্ত হইল না, বাধ্য হইয়া তারাকৃষ্ণবাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া বর্ধমান আসিলেন। কিন্তু সেদিন আপিস্ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য শহরে আরও দুই দিন অপেক্ষা করিয়া তারাকৃষ্ণবাবু যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন দেখিলেন, সম্বৎসরের জন্য সঞ্চিত তাহার সমস্ত গোলার ধান চুরি গিয়াছে।

প্রায় দুই সপ্তাহ কাল পর একদিন সকালবেলা একখানি খামের চিঠি হাতে করিয়া লইয়া তারাকৃষ্ণবাবু উমার কাছে আসিয়া বলিলেন,

তোমাকে একটা সুখবর দেব, চন্দনকে আস্‌তে লিখেছিলাম, সে আজ সন্ধ্যের ট্রেণে এসে পৌঁছুবে।

উমার বহুদিনের রুদ্ধ আবেগ একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আনন্দে বিমূঢ় হইয়া গিয়া বলিল, চন্দন আস্‌ছে! যাও, তুমি আজই কোলকাতায় গিয়ে তার জন্য নোতুন জামা-কাপড় কিনে নিয়ে এস। আমি তার খাবার জোগাড় করে রাখি। তুমি যাও, এখুনি যাও। বিলম্ব করো না। সন্ধ্যের আগেই আবার ফিরে স্টেশনে গিয়ে থাক্‌তে হবে। তুমি এখুনি বেরিয়ে পড়, হয়ত পরে চন্দন এসে ফিরে যাবে।

বহুদিন পর তারাকৃষ্ণবাবু তাহার লাঠিখানি হাতে করিয়া জামা চাদর পরিয়া বাড়ী হইতে একাকী বাহির হইলেন। উমা চন্দনের জন্য খাবার আয়োজন করিতে লাগিল।

মনের আগুন

এই বিষয়ে আর কাহারও কোন সংশয় রহিল না—রাত্রি অনেক হইয়া গেল, খাদে বারটার ভোঁ বাজিয়া গেছে, সেও অনেকক্ষণ ; ধাওরার সব মেয়েই ফিরিয়াছে, এক সৈরভীই ফিরিল না। পঞ্চু সর্দার হাতের কলিকাটি নামাইয়া অনেকক্ষণ খুব কাসিল, তারপর বাঁ হাতটা বুকের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তোরা কেউ যা' ত, ছ'নম্বর ধাওরায় গে' দেখে আয়, সোনা ছোঁড়াটা ফিরেছে কি না!

মেলায় যাইবার আগে কে নাকি দেখিয়াছিল, একটা মহুয়া গাছের নীচে দাঁড়াইয়া দুইজনে কি আলাপ হইতেছে।

দুই নম্বর ধাওরায় যে সংবাদ লইতে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, সোনা ফিরে নাই, তা'র অন্ধ মা'টা রাত জেগে তা'রই জন্যে পথের দিকে চেয়ে আছে। ইহার পর আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সোনা মাঝিই সৈরভীকে লইয়া বাহির হইয়া গেছে ; এত রাত্রি পর্যন্ত যখন ফিরিল না, তখন আর ফিরিবে না।

কথাটা কাঞ্চনেরও কানে গেল, কিন্তু সে ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। একদিন নয়, দুই দিন নয়, আজ তিন বৎসর ধরিয়া সে সোনাকে চিনে, এই তিন বৎসর তাহারা এই কয়লা খাদে কাজ করিতেছে এবং এই পাশাপাশি ধাওরাতেই বাস করিতেছে, কিন্তু সোনা···কথাটা ভাবিতেও কাঞ্চনের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কাঞ্চনও আজ মেলায় গিয়াছিল। আজ কেন জানি সাধ করিয়াই সে বড় সাজিয়াছিল। কবে তাহার বিবাহ হইবে, সেইজন্য তাহার মা আগে হইতেই যে একটি রূপার পৈঁচে গড়াইয়া রাখিয়াছিল, সে লুকাইয়া

আজ তাহা পরিয়াছিল। সাধ করিয়া চোকে সুর্মা মাখিয়াছিল। একখানি চওড়া লালপেড়ে কোড়া শাড়ী অনেক দিন ধরিয়া যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল, আজ মেলায় যাইবার আগে তাহাই সে পরিয়া লইয়াছিল। তাহার বড় সাধ ছিল, সে আজ সোনার সঙ্গে মেলায় যাইবে ; কিন্তু সোনা কখন যে কোনদিক দিয়া পলাইয়া গেল, সে জানিতেও পারিল না।

সোনা আজ সকালেও ত তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, কি লা কাঞ্চি, মেলায় যাস্ ত, আমার সঙ্গে যাবি বুঝলি ?

কাঞ্চনও ঘাড় নাড়িয়া তাহাতে সম্মতি দিয়াছিল। কিন্তু সাজিয়া গুঁজিয়া যখন সে ধাওরা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন দেখিল সোনা কখন চলিয়া গেছে। সে মনে করিল, তাহারই দোষ হইয়াছে, সে সাজিতে গুঁজিতে বড় দেরী করিয়া ফেলিয়াছে,—ভাবিযা সোনার উপর তাহার আর বিন্দু মাত্রও অভিমান রহিল না। সে ধাওবার অন্যান্য মেয়ের সঙ্গেই পঞ্চু সর্দারের ছেলে বিন্দের সঙ্গে মেলায় রওয়ানা হইয়া গেল।

কাঞ্চনের সহসা সৈরভীর কথা মনে হইল। মেয়েটা যেন কেমন এক স্বভাবের। কাঞ্চনের তাহাকে একেবারেই ভাল লাগে না। যদিও তাহারা একই ধাওরায় পাশাপাশি ঘরেই থাকে, তবু এক দিনও তাহাদের মধ্যে প্রাণ খুলিয়া আলাপ হয় নাই। সৈরভী এই ধাওরায় নূতন ; আগে কোথায় একটা কয়লা-খাদে কাজ করিত। তিন চারি মাস হইল, তাহার বুড়া বাপকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছে। তাহার বড় দেমাক। কেহ কেহ বলিত, মেয়েটা নাকি বাবুদেরও নজরে আছে ; ছিঃ! সৈরভী সে দিন কাঞ্চনকে বলিয়াছিল, কি লা কাঞ্চি, তোর নাকি বিয়ে ? তু'নম্বরের সোনার সঙ্গে ?

সোনার সঙ্গে তাহার মেশামিশির ভাব দেখিয়া অনেকেই এমন কথা বলিত, সেই জন্য সে ইহা একেবারেই গ্রাহ্য করে নাই এবং প্রশ্নের কোন উত্তরও দেয় নাই। কিন্তু সৈরভী মনে করিল, তাহাকে ঘৃণা করিয়া কাঞ্চন তাহার সঙ্গে কথা কহিল না।

কাঞ্চন আর ভাবিতে পারিল না। বাহিরে পঞ্চু সর্দারের আড্ডা কখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; রাত্রি নিঝুম অন্ধকার। দূরে কেবল খাদের কল-ঘর হইতে ইঞ্জিনের শব্দ আসিতেছে। কাঞ্চন একবার ভাবিল, চুপি চুপি দুই নম্বর ধাওরায় গিয়া সোনার ঘরটা দেখিয়া আসে, কিন্তু ধাওরায় সকলেই ঘুমাইতেছে; কেহ যদি হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে এমন অবস্থায় দেখিয়া অন্য কিছু মনে করে, তাহা হইলে লজ্জার আর সীমা থাকিবে না। কাঞ্চন দরজার চৌকাঠ ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মনের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল।

পরদিন সকাল না হইতেই আড়কাঠিবাবু ধাওরার সম্মুখে আসিয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। সৈরভীর বাপ বলিল, কি জানি রে বাবু, মেয়েটার মনের কথা আমি কি করে বুঝ্‌ব?

আড়কাঠি ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না, বলিল, এত বড় ছুঁড়িটাকে বে' না দিয়ে রাখ্‌বার এই ফল; এখন মর উপোস প'ড়ে! নিজের ত গতর খাটাবার ক্ষেমতা নেই যে, এক গাড়ী কয়লা কেটে রোজ নিজের পেটটা চালাবি!

সৈরভীর বাপ অত্যন্ত কাতরভাবে বলিল, মেয়েটাকে বে' দিয়েই খাই কি ক'রে? ওরই ত মেহনতের উপর বাপ বেটিতে চলে।

আড়কাঠি বলিল, ভাল চাস্‌ ত থানায় খবর দে, আজকের দিনের মধ্যে যদি না ফেরে, তবে তোকে ধাওরা থেকে টেনে বা'র ক'রে দেব; আমরা কাজের লোকের জন্য এ' ঘর দুয়ার তৈরী করেছি, এটা ধর্মশালা গড়িনি।

কথাটা মিথ্যা নয়। সৈরভীর বাপ বৃদ্ধ অকর্মণ্য, একমাত্র মেয়েটা খাদে কাজ করিত বলিয়াই সে এই ধাওরায় একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পাইয়াছিল। এখন মেয়েটা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাকে এই সরকারী ঘরটা ত দিয়া রাখিলে কোম্পানির ক্ষতি; কারণ, তাহারা এইখানে একটা কর্মঠ লোকের স্থান দিতে পারে।

পঞ্চু সর্দার মধ্যস্থ হইয়া বলিল, দু' চারটা দিন সবুর কর রে বাবু,

মেয়েটা ত ফির্‌বেই, যাবে কোথায় ? বুড়ো বাপটার জন্য হলেও ফিরে আস্‌বে। এই বুড়োটাকে তার আগে তুই গাছতলায় দাঁড় করাসনি। আমরা দশজনে মিলে যেখান থেকেই হোক্, ওকে খুঁজে বার করব ; কোথায় যাবে সে ?

আড়কাঠি একটু নরম হইয়া বলিল, আচ্ছা দেখ, কোথাও খুঁজে পাস্ যদি, বলিয়া দুই নম্বর ধাওরার দিকে চলিয়া গেল।

কাঞ্চন রাত্রে ঘুমাইতে পারে নাই। আড়কাঠির গলা শুনিয়াই সে উঠিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে চুপ করিয়া থাকিয়া সমস্তই শুনিল। কিন্তু আড়কাঠিকে যখন দুই নম্বর ধাওরায় সোনার ঘরের দিকে যাইতে দেখিল, তখন তাহার মনটা হঠাৎ কি যেন আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল।

সোনার মা'টা আবার অন্ধ। আড়কাঠি যদি তাহাকে ঘর খালি করিয়া দিতে বলে ? এখানে ত পঞ্চু সর্দার গায়ে পড়িয়া সৈরভীর বাপটাকে আরও দু' একদিনের জন্য রক্ষা করিল, কিন্তু সেখানে সোনার মার জন্য দুই একটা কথা কে বলিতে আসিবে ? সর্দার আছে, সে বলিতে প্যারে ; কিন্তু সে যদি না বলে, এই অন্ধটাকে যদি আড়কাঠি ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দেয় ?

কাঞ্চন আর দাঁড়াইতে পাড়িল না। সে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে দুই নম্বর ধাওরায় সোনার ঘরের সম্মুখে পৌঁছিল।

সোনার মা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সারা রাত্র ছেলেটার পথ চাহিয়া জাগিয়াছে, বুড়ো মানুষ, কখন ভোরের দিকে একটু ঘুম আসিয়া গিয়াছে। আড়কাঠি ডাকিল, ঘুমুচ্ছিস যে, কাণি ! ছেলেটার খোঁজ কিছু পেলি ?

আড়কাঠির গলা শুনিয়া সোনার মা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; বলিল, এ'. এক নম্বরের কাঞ্চি ছুঁড়িটার কাজ রে বাবু, আমার ছেলেটাকে ভুলিয়ে নে গেছে।

আড়কাঠি বিস্মিত হইয়া কাঞ্চনের দিকে তাকাইল, দেখিল, লজ্জায় সে মাথা নোয়াইতেছে। আড়কাঠির অর্থপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সে এইটুকু মাত্র জবাব দিল, আমি ত এ'র কিছু জানিনে!

কাঞ্চনের গলার সুরে সোনার মা তাহাকে চিনিল, প্রথতঃ একটু বিস্মিত হইয়া গিয়া বলিল, তাই ত তুই, তুই এখানে? কাল সোনা তোর সঙ্গে মেলায় যায় নি?

কাঞ্চন এইবার একটু তিক্তস্বরে জবাব দিল, আমার সঙ্গে যাবেক কেনে? সে গেইছিল সৈরভীর সঙ্গে।

সোনার মা আড়কাঠিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তা হলে ঐ, ঐ বুঝলি বাবু, ঐ আমার ছেলেটাকে ভুলিয়ে নে গেছে!

আড়কাঠি বিরক্ত হইয়া গেল, বলিল, আমি ত তার বিচার করতে আসিনি, বুঝলি, কাণি? আমি তোকে জানাতে এসেছি, খাট্‌বার লোক যখন তোর চলে গেছে, তখন এই সরকারী ঘরে তুই আর থাক্‌তে পাবি নে। আমাদের অনেকগুলো লোককে ঘর দিতে পাচ্ছি নে।

সোনার মা বিলাপের সুরে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, এই অন্ধ বূড়ীটাকে আর দুটো দিন ঘরটাতে থাক্‌তে দে রে বাবু, অত বড় অধর্মটা করিস্‌নি। আমার ছেলে, আমি তাকে জানিনে? আর কিছুর জন্যে না হোক্, আমার জন্যে হলেও সে ফিরে আস্‌বেই!

হাঙ্গামা শুনিয়া ধাওরার যত কুলি আসিয়া সোনার ঘরের সম্মুখে জড় হইয়াছে, আড়কাঠি একবার তাহাদের সকলের দিকে চাহিয়া বলিল, তোদের জাতের মধ্যে কি এত দয়া মায়া আছে রে? যদি থাক্‌ত, তা হলে আর এমন হয় কেন? ছুঁড়িটাও ত বুড়ো বাপটাকে ফেলে রেখে গেছে।

কাঞ্চন ভাবে বুঝিল, আড়াকঠির মন একটু নরম হইয়াছে।

ধাওরার অনেকেই রাত্রে কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, এই

ব্যাপার সম্বন্ধে তাহারা এখন মাত্র আসিয়া শুনিল। দুই একটা মেয়ে কাঞ্চনকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া পরস্পর কি বলাবলি করিতে লাগিল, কখনও কখনও হাসিতে হাসিতে এ' ও'র গায়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। একটা তরুণ বয়স্ক ছোক্‌রা কাঞ্চনের দিকে আড় চোখে চাহিয়া চাহিয়া কি একটা অশ্লীল সাঁওতাল গানের কলি ধরিয়া মনে মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল, শুনিয়া মেয়েগুলি সমস্বরে একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কাঞ্চন সকলকেই চিনে, যথেষ্ট আলাপও আছে, কিন্তু আজিকার দিনে তাহাদের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইতেও যেন তাহার কেমন বোধ হইতে লাগিল। সে কাঠ হইয়া দরজার গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুই নম্বর ধাওরার সর্দারের নাম তালিত মাঝি। তালিত লোক ভাল। একটু বয়স হইয়াছে বলিয়া সকলেই তাহাকে খুব মান্য করে। সে গোলমাল শুনিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। লোকজন দেখিয়া বলিল, যা, যা, নিজেদের কাজে যা, এখানে কি? যা কাঞ্চি, তুই আবার এখানে কেন? তারপর আড়কাঠি বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে বাবু, ব্যাপার কি?

আড়কাঠি সমস্ত ঘটনা এবং তৎসম্পর্কে তাহার অপ্রিয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিল। শুনিয়া সর্দার মাথা নাড়িল। সম্মুখে কাঞ্চনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি লা কাঞ্চি, তুই জানিস্ কিছু? যে মেয়েগুলি তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এই প্রশ্ন শুনিয়া সমস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কাঞ্চন লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, আমি তা'র কি জান্‌ব? আমি ত সর্দারের বেটার সঙ্গে মেলায় গিয়েছিলাম।

সর্দার আড়কাঠিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, থাক্ বাবু, আর দু'টো দিন দেখ্, অত বড় অধর্মের কাজটা করিসনি। এই অন্ধটাকে পথে দাঁড় করিয়ে দিলে শেয়াল কুকুরে টেনে খাবে। আমরা খুঁজে ছেলেটাকে

যেখান থেকে হোক্, বা'র করব ; সাঁওতালের কি পালাবার জায়গা আছে রে ! এ' খাদে, না হয় ও' খাদে ! দেখ্‌বি দু'দিনে নিজেই চ'লে আস্‌বে, নয়ত আমরাই নিয়ে আস্‌ব।

আড়কাঠি আর কিছু বলিতে পারিল না, কেবল বলিল, ধাওরার একটা হাজিরা কম হ'লে আমাকে যে আবার বড়বাবুর কাছে জবাবদিহি করতে হ'বে ! বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

কাঞ্চন ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, সকলেই কাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মনের অবস্থা যাহাই থাকুক, শরীরের অবস্থা যাহাই হোক্, তাহাদের নিত্যকর্মে একদিন ব্যাঘাত হইবার উপায় নাই ; হইলেই আড়কাঠির লোক আসিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়া যাইবে। কাঞ্চনকেও কাজে বাহির হইতে হইবে। সাতটার ভোঁ পড়ার আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে খাদে গিয়া তাহার যে ভাবেই হউক পৌঁছাইতে হইবে।

গত রাত্রে সে যে মেলা হইতে ফিরিয়া অবধি এই ঘটনার কথা শুনিয়াছে, সেই হইতে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হইয়া গেছে। তবু খাদের নীচের খাটুনি, পেটে কিছু না পড়িলে গায়েই বা জোর পাইবে কোথায় ? কাঞ্চন গত রাত্রির বাসি ভাত লইয়া চারিটি মুখে পূরিয়াই ঝুড়িটা মাথায় করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহির হইবার সময় একবার পাশের ঘরটার দিকে তাকাইয়াও দেখিল না, সৈরভীর বুড়া বাপটা কি করিতেছে, তাহার আজ খাইবার দাইবার ব্যবস্থাই বা কি হইবে !

দুই নম্বর ধাওরার সম্মুখ দিয়াই তাহার খাদে যাইবার পথ। সে সোনার ঘরটার কাছে আসিয়া একবার দাঁড়াইল। ভিতরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল যে, কাণিটা উপুড় হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া আছে।

কাঞ্চনের মনে হইল, হয়ত বুড়ীটা আজ সারাদিন উপোস্ করিয়াই থাকিবে, সন্ধ্যার পর সর্দার ফিরিলে চারটি এঁটো ভাত পাইলেও পাইতে পারে। তাহার মনে হইল, গত রাত্রির বাসি ভাত ত তাহার ঘরে আছে, সে ত সব খাইতে পারে নাই। সেইগুলি আনিয়া ইহাকে দিয়া গেলেও

কাজে লাগিতে পারে। ভাবিয়া কাঞ্চন ফিরিয়া নিজের ঘরে গেল ; বাসি ভাতের হাঁড়িটা কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল। আসিবার সময় সৈরভীর বাপ তাহার সাড়া পাইয়া কাসিতে কাসিতে অতি কষ্টে ডাকিল, কি লা, কাঞ্চি নাকি ? একটা কথা শোন্ ত, মা !

কাঞ্চন সাড়া দিল না, অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে নিজের দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া চলিয়া আসিল।

সোনার ঘরের দরজা খোলাই ছিল, খোলাই থাকে। সে ভিতরে আসিয়া সোনার মা'র সম্মুখে ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, নে কাণি, খাস্, এই ভাত রেখে গেলাম ; বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সোনার মা প্রথমটায় চমকিয়া উঠিল, তারপর কাঞ্চনের গলা চিনিতে পারিয়া বলিল, আঃ মা, বাঁচালি, কাল রাতেও উপোস্ ক'রে আছি, বলিয়া হাতড়াইয়া ভাতের হাঁড়িটা নিজের কাছে টানিয়া লইল।

সন্ধ্যার পর কাঞ্চন খাদ হইতে ফিরিল। ফিরিবার পথে ভাবিল, হয় ত গিয়া সোনার মার কাছে খবর পাইবে, সোনা ফিরিয়াছে ; ফিরিয়া সৈরভী যে তাহাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাই সর্কলের কাছে বলিতেছে। শুনিয়া লোকে সোনার দোষ দিবে না, সৈরভীকে ছি ছি করিয়া ধাওরা হইতে খেদাইয়া দিবে।

সকাল বেলায় যে ছোকরাটা সোনার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া একটা অশ্লীল গান গাহিয়া ঠাট্টা করিয়াছিল, পথে তাহার সঙ্গে কাঞ্চনের দেখা হইল' কাঞ্চন একবার তাহার দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সে উপহাসের সুরে আবার বলিল, কি লা কাঞ্চি, সোনার খবর কিছু পেলি ?

কাঞ্চন জবাব দিল না ; প্রশ্নকর্তা কথায় বিদ্রূপের বিষ মিশাইয়া বলিল, আঃ ছুঁড়ির দেমাক দেখ না ; আমাদের যেন মানুষ ব'লেই মনে হয় না।

কাঞ্চন ইহারও কিছু উত্তর দিল না, কেবল মনে মনে বুঝিল, আজ সোনা থাকিলে, ইহার জবাব পাইত। লোকটা সেই সকাল বেলার গানের সুরটাই ভাঁজিতে ভাঁজিতে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল।

কিছু দূর আসিতেই সম্মুখে দেখিল, পাঁচ নম্বর ধাওরার তুফান সর্দারের ছেলেটা একটা গরুর গাড়ী লইয়া আসিতেছে। সে একটু রসিকতা করিবার জন্যই গাড়ীটা একেবারে রাস্তার কিনারা ধরিয়া কাঞ্চনের প্রায় গায়ের উপর লইয়া ফেলিল। ঠাট্টা করিয়া একবার শিস্ দিয়া বলিয়া উঠিল, আঃ, দেমাকে ছুঁড়ির যেন আর পথের মাটির দিকে চোখ নেই, দেখে চল্‌তে পারে না!

কাঞ্চন ইহারও কোন প্রতিবাদ করিল না। কারণ, দারুণ দুঃখে গত রাত্রি হইতে তাহার যে মন একেবারে অভিভূত হইয়া আছে, তাহা দ্বারা আর নূতন কোন অনুভূতি সম্ভব হইতেছে না। এখন তাহাকে যতই অপমান কর, এমন কি, গলাটা হঠাৎ তাহার টিপিয়া ধরিয়া যদি চাপিতে চাপিতে দম বন্ধও করিয়া দাও, তথাপি সে তাহার কড়ে অঙ্গুলিটি তুলিয়াও আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করিবে না।

তুফান সর্দারের ছেলের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না দেখিয়া সে এইবার স্পষ্টভাবেই বলিল, কি লা কাঞ্চ, সোনা নাকি শিকল কেটেছে?

কাঞ্চন ইহার উত্তরেও কিছু বলিল না। সর্দারের ছেলে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ইস, ছুঁড়ির দেমাকে যে আর বাঁচিনে! বলিয়া পাশ কাটাইয়া গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

সোনার ঘরের সম্মুখ দিয়া আসিবার সময় একবার মনে করিল, কাণিটার খবর লইয়া যায়। কিন্তু তাহার মনটা নানা কারণেই আজ ভাল ছিল না, তায় আবার সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটু বিশ্রামের জন্য ঘরে ফিরিতেছে। ইহা মনে হইতেই সে স্থির করিল, সোনার ঘরের দিকে সে তাকাইবেও না। সোনা তাহার কে? নিজে ছেলে হইয়া অন্ধ মা'টাকে ফেলিয়া একটা ছুঁড়ি লইয়া পলাইয়া গেল, সে

পরের মেয়ে হইয়া তাহার জন্য সেবা করিয়া মরিবে কেন ? কাণি না খাইয়া পড়িয়া মরুক, তাহার কি ? তাহাদের মধ্যে না খাইতে পাইয়া মরা ত নিত্য ঘটনার মধ্যে !

কাঞ্চন দৃঢ় পাদবিক্ষেপে নিজের ঘরে আসিয়া শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। তাহার সাড়া পাইয়া পাশের ঘর হইতে সৈরভীর বাপ কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কাসিতে কাসিতে তাহার কথা আট্‌কাইয়া গেল।

এমন সময় পঞ্চু সর্দার আসিয়া কহিল, কি লা কাঞ্চি, তোর পাশের ঘরে যে বুড়োটা না খেতে পেয়ে মর্‌ছে !

কাঞ্চন বাধা দিয়া বলিল, তা' আমি কি কর্‌ব ? তোর অত দরদ থাকে, তুই এ'কে খাওয়া গে, যা ! তুই ত সর্দার !

সর্দার কাঞ্চনকে অত্যন্ত বিনীত স্বভাবের মেয়ে বলিয়া জানে বলিয়াই এমন ভাবে কথা বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কাছ হইতে এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া নিজেই গিয়া সৈরভীর বাপের ঘরে প্রবেশ করিল। সেই রাত্রির জন্য তাহার একটা কি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

তিন চারিদিন হইয়া গেল, সোনা কি সৈরভী কেহই ফিরিল না। আজ সকালে আসিয়া আড়কাঠি জানাইয়া গিয়াছে, আজ রাত্রের মধ্যেই সৈরভী ও সোনার ঘর খালি করিয়া দিতে হইবে। কাল সকাল হইতে নূতন লোক ঘর দখল করিবে।

কাঞ্চন সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া এই কথা শুনিল। কাল সকালে সোনার অন্ধ মা'টা পথে আসিয়া দাঁড়াইবে, এতটুকু মাথা গুঁজিবার স্থান তাহার আর রহিবে না। কাঞ্চনের চোখে জল আসিল। কতদিন সে ভাবিয়াছে, সোনাদের সংসারে সেও একজন হইয়া বসিবে। সোনাকে সে কতদিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে, সোনাকে তাহার ভাল লাগিত। কাঞ্চনের মা'রও বড় সাধ ছিল, সোনার হাতে তাহার মেয়েকে তুলিয়া

দেয়। সবই যখন ঠিক হইয়া আসিল, তখন খাদের নীচের এক দুর্ঘটনায় তাহার মা মারা গেল। কোম্পানী হইতে সেইজন্য কাঞ্চন কিছু টাকা পাইল। এই টাকাই তাহার সর্বনাশ করিল। ইহার লোভেই পঞ্চু সর্দার তাহার নিজের ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু ছেলেটা এখনও ছোট। পঞ্চু স্থির করিয়া রাখিয়াছে, ছেলেটা একটু বড় হইলেই সে তাহার সঙ্গে কাঞ্চনের বিবাহ দিয়া দিবে। সর্দারের অমতে সোনার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবার উপায় নাই। তবে সে ঠিক করিয়াছিল এবং সোনাও তাহাতে সম্মতি দিয়াছিল যে, তাহারা দুইজনে কোথাও পলাইয়া গিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিবে, কিন্তু সোনা তাহার অন্ধ মা'টার জন্যই ঘরের বাহির হইতে পারিতেছিল না।

সোনার উপর দুরন্ত অভিমানে কাঞ্চন এই চারিদিন আর কাণিটার কোন খোঁজ লইয়া আসে নাই। আজ যখন শুনিল, কাল তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিবে, তখন সে সোনার উপর সমস্ত অভিমান মুহূর্তে ভুলিয়া গেল। মনে করিল, আজ একটু ভাল করিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া কাণিটাকে গিয়া নিজের হাতে খাওয়াইয়া আসিবে, হয়ত এই কয়দিন তাহার খাওয়াই হয় নাই। সে হাট হইতে কিছু জিনিষ পত্র কিনিয়া আনিয়া তাহাদের দুইজনের উপযোগী রান্নার আয়োজন কারতে লাগিল।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া কাঞ্চন কড়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একটা দেখিতেছিল, এমন সময় পিছনে কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। কাঞ্চন চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, সৈরভীর বাপ—একটা লাঠিতে ভর দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার দিকেই আসিতেছে।

কাঞ্চন মুহূর্তে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, কি চাস্, তুই এখানে? বেরো, শীগ্‌গির বেরো বল্‌ছি, নইলে এই পোড়া কয়লা তোর গায়ে ছুঁড়ে দোব! বলিয়া চিম্‌টা দিয়া একটা জ্বলন্ত কয়লা উনুন হইতে তুলিয়া তাহার সম্মুখে লইয়া ধরিল।

সৈরভীর বাপ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। কাঁপিতে কাঁপিতে ধপ্ করিয়া ঘরের মাঝখানেই বসিয়া পড়িল, বলিল, দিবি? এক মুঠো ভাত দিবি খেতে? চারটে দিন ধরে এক এক বাটি করে মাড় সর্দারটা এনে দিয়ে যাচ্ছে, তাই খেয়ে আছি, দিবি আজ চারটি ভাত খেতে? বলিয়া যেন দারুণ পরিশ্রমে হাঁপাইতে লাগিল।

কাঞ্চন তেমনই ক্রুদ্ধভাবে বলিল, দেব, ছাই দেব। উঠ বল্‌ছি এখান থেকে, উঠ্, উঠ্। বলিয়া এক রকম ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া কবাট আট্‌কাইয়া দিল।

কাঞ্চন মনে মনে এক অতি নীচ হিংস্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সৈরভীর উপর ইহার চাইতে বড় প্রতিশোধ যেন আর লওয়া যাইতে পারে না। কাঞ্চনের দুঃখের যেন অনেকখানি লাঘব হইল।

রান্না বান্না শেষ হইতে কাঞ্চনের বেশী দেরী হইল না। সে কয়েকটা বাটিতে করিয়া খাবার সাজাইয়া লইয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, দরজার গোড়ে উপুড় হইয়া সৈরভীর বাপটা এখনও পড়িয়া আছে। কাঞ্চন তাহাকে পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এখান থেকে উঠ্‌লি নে? দরজা আগ্‌লে পড়ে আছিস, মানুষ যায় কোন দিক দিয়ে?

কথা শুনিয়া সৈরভীর বাপের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, কাঞ্চনকে একেবারে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বলিল, তোর দয়া হল বুঝি! দে বেটি, বাটিটা দে আমার হাতে! দে, দে, নিস্‌নি, পালাস্‌নি; দে দে বেটি, দিবি ত দে, আর দেরী করিস্ নি।

কাঞ্চন মুখ ভেঙ্গ্‌চাইয়া বলিল, আহা হা, সখে আর বাঁচিনে! যেন তার জন্যেই আমি এতক্ষণ বসে রেঁধেচি আর কি! বলিয়া বাটিগুলি সন্তর্পণে বাম হাতে লইয়া ডান হাতে ঘরের শিকল তুলিয়া দিল।

সৈরভীর বাপ খাবার দেখিয়া উন্মাদের মত হইয়া গেল, বলিল, তোর পায়ে আমি মাথা কুটে মরব, যদি এক মুঠো ভাত না দিয়ে যাস্।

কাঞ্চন একটা ঝাঁকুনি দিয়া তাহার দুর্বল হাত হইতে নিজের পা ছিনাইয়া লইল। ধাক্কা খাইয়া সৈরভীর বাপ উপুড় হইয়া বারান্দার উপর পড়িয়া গেল।

কাঞ্চন বাটি কয়টি লইয়া সোনার মার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বারান্দায় কাঁচা কয়লার আগুন জ্বলিতেছিল, সেই আলোতে দেখিতে পাওয়া গেল, ঘরের যত ময়লা কাপড় চোপড় জড়াইয়া সোনার মা ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া আছে।

কাঞ্চন তাহাকে শক্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, উঠ্, কাণি! নে খেয়ে নে। আমার সঙ্গে যাবি ত চল্।

কাণি ঘুমায় নাই, ক্ষুধায় অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। সে কাঞ্চনের গলা চিনিতে পাইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, যাবি, তুই আমায় নিয়ে যাবি?

কাঞ্চন বলিল, হ্যাঁ, যাব, এই ভাত কয়টি খেয়ে নে দিকিন! চরণপুরের খাদের আড়কাঠিবাবুর সঙ্গে কথা বলে রেখেছি, কাল থেকেই সেখানে গিয়ে কাজে লাগ্‌তে হবে, এখনই বেরুতে হবে।

কাণি বলিল, তাই চল, মা!

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কাণির হাত ধরিয়া কাঞ্চন চরণপুরের পথে বাহির হইল।

টঙ্গাওয়ালা

তখন আশ্বিনের শেষ পড়িয়া আসিয়াছে ; দেরাতুনে আসিয়া পৌছিয়া অবধি হোটেলের একটা নির্জন ঘরে আবদ্ধ হইয়া অকাল বাদল-তুর্যোগের অনাচার সহ্য করিতেছি। এমন সময় সহসা একদিন মেঘ কাটিয়া গিয়া চমৎকার রৌদ্র উঠিল, হিমালয়ের পাদান্তস্পর্শী অরণ্য-প্রকৃতি যেন এক অপূর্ব স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল।

ভাবিলাম, আর ঘরের কোণে বসিয়া থাকা নয় ; একটা গাড়ী করিয়া সহরের চারিটা দিক একবার ঘুরিয়া আসিয়া মনের এই তুঃসহ আবদ্ধতার গ্লানি একটু দূর করিয়া আসি। চাকরকে ট্যাক্সি ডাকিতে বলিয়া আসিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পর চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবু, নিকটে কোন ট্যাক্সি পাওয়া গেল না ; একটা টঙ্গা ডেকে এ'নেছি।

মনে মনে খোট্টাগুলির বুদ্ধিবৃত্তির উপর চরম বীতস্পৃহ হইয়া বলিলাম, ট্যাক্সি পাওয়া যায় নি, ফিরে এ'লেই হ'ত, টঙ্গা আনতে তোমাকে কে বলেছিল ?

চাকরটা বলিল, আচ্ছা বাবু, তা' হ'লে এ'কে বিদায় করে দিই। বলিয়া চলিয়া গেল।

উৎসাহেব মুখে এমন ভাবে বাধা পাইয়া প্রথমটায় একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। তারপর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম, মনে করিলাম, পথে স্টেশনের নিকট হইতে একটা ট্যাক্সি ঠিক করিয়া লইলেই চলিবে।

সদর দরজা দিয়া পা' বাড়াইতেই একটা লম্বা চওড়া চেহারার লোক

অত্যন্ত বিনীত ভাবে সেলাম করিয়া পাশে দাঁড়াইল। প্রথমতঃ মনে করিলাম, হোটেলের দারওয়ান, ভবিষ্যৎ বখশিস্ লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিতেছে, কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম এ-ই টঙ্গাওয়ালা!

আমি তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, দুর্যোগের ছায়া এখনও সমগ্র সহরটাকে আচ্ছন্ন করিয়াই রাখিয়াছে। পথের দুই পাশের বাঁধানো নর্দমাগুলি দিয়া জলধারা তীব্র বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিতেছে। কালো পিচ্ ঢালা রাস্তাগুলির উপর কাদার দাগ কাটিয়া যে গাড়ী-মোটর যাতায়াত করিয়াছে, তাহাদের চক্রচিহ্ন স্পষ্ট হইযা আছে; কোথাও কোথাও পথের উপরই দুই পার্শ্বস্থ ইউকিলিপটাস্ গাছ হইতে দীর্ঘ শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পথ চলাচল দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। নিকটে কিংবা দূরে, এখনও স্বাভাবিক লোক চলাচল ও গাড়ীঘোড়ার হাঁকডাক আরম্ভ হয় নাই। আমি প্রায় মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইয়া এই সব লক্ষ্য কবিতেছিলাম; সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম সেই টঙ্গাওয়ালা আসিয়া আমার ঠিক পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া আছে। চোখ মুখের ভাব দেখিয়া লোকটাকে বড় বিপন্ন বলিযা মনে হইল। সে যেন কিছু আমার কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করিতে চাহিতেছে, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না—প্রতি মুহূর্তেই যেন সে কোন চরম দুঃসাহসিক কার্যের মুখে আসিয়া পরক্ষণেই আবার পিছাইয়া যাইতেছে। আমি তাহার এই সঙ্কোচ দূর করিয়া নিজেই জিজ্ঞাসা করিলাম, এখান থেকে ইস্টিশন পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

লোকটা যেন কৃতার্থ হইয়া গিয়া বলিল, পারব না কেন, নিশ্চয় পারব! গাড়ীতে এসে বসুন!

গাড়ী নিকটেই ছিল। আমি অগত্যা গিয়া তাহাতেই চাপিয়া বসিলাম।

পশ্চিম ভারতের এই অপূর্ব অশ্বযানটি আমার কাছে চিরদিনই অত্যন্ত

ভীতির বস্তু। পশ্চান্মুখী হইয়া ইহাতে চাপিয়া বসিলেই আমার যেন মনে হয়,—এই বুঝি চলন্ত টঙ্গা হইতে মাঝ রাস্তায় উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়া নাকমুখ থেৎলাইয়া ফেলি। অথচ এসব দেশীয় ভদ্রলোক মাত্রেরই ইহাই একমাত্র অবলম্বন। বাংলা দেশের তুলনায় এদিককার বড় বড় সহরেও ট্যাক্সির ব্যবহাব নিতান্ত নগণ্য।

স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম; কিন্তু একখানিও ট্যাক্সি দেখিতে পাইলাম না। আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ট্যাক্সিগুলো সব কোথায় গেল বলতে পার?

টঙ্গাওয়ালা বলিল, সহরে ট্যাক্সি চলে না; সব ট্যাক্সিই এখান থেকে পাহাড় ভেঙ্গে মুসৌরী যায়। কিন্তু ক'দিন ধ'রে বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড়ের উপর দিয়ে এখনও জল চলছে বলে মোটর চলাচল বন্ধ—সেজন্যই গ্যারেজ থেকে গাড়ীগুলো এখনও বেরোয়নি। ভাবিলাম, আজিকার দিনটাও তবে মাটি হইল। এমন করিয়া ঘরের কোণেই যদি আবদ্ধ হইয়া থাকিব, তবে এত দূর দেশে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিবার সার্থকতা কোথায়?

নিকটেই একটা সিনেমার ঘরে সন্ধ্যার জন্য অগ্রিম টিকিট বিক্রয় হইতেছিল। অগত্যা মনে করিলাম, আজ সন্ধ্যাটা অন্তত একটা সিনেমা দেখিয়াই কাটাইয়া দেওয়া যাউক। ভাবিয়া টঙ্গা হইতে নামিয়া গিযা একটি টিকিট কিনিয়া আনিলাম।

টঙ্গাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কোথায় যাবে, বাবু? আমি ভাবিলাম, আর কোথায় যাব? এখন হোটেলেই ফিরে যাওয়া যাবে—তারপর সন্ধ্যায় এসে সিনেমার ঘরে ঢু'কেই সময়টা কাটিয়ে দিতে হ'বে। প্রকাশ্যে বলিলাম, হোটেলেই নিয়ে চল।

টঙ্গাওয়ালা অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথায় যেতে চাইছেন, আমি কি আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না?

আমি তাচ্ছিল্যের সুরে কহিলাম, না, তুমি নিয়ে যা'বে কি হে! সে অনেক দূর।

টঙ্গাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ? শুন্‌তে পারি নে কি ?

আমি বলিলাম, ধর না সহস্র-ধারা, নিয়ে যেতে পারবে তুমি ? সহস্র-ধারা দেরাদুন হইতে দশ মাইলের পথ।

টঙ্গাওয়ালা বলিল, কেন পারব না বাবু, নিত্যই ত আমরা সোয়ারী নিয়ে সে'দিকে দিনে দুই তিনবার যাতায়াত করি।

আমি বলিলাম, তা' কর, স্বীকার করি। কিন্তু এই টঙ্গায় চ'ড়ে আমার সেখানে যাওয়া অসম্ভব। তা' ছাড়া সন্ধ্যায় এখানে ফিরে সিনেমা দেখ্‌তে হ'বে—আগেই টিকিট কেনা হ'য়ে গেছে।

তারও মাত্র তিন চার ঘণ্টা বাকি।

টঙ্গাওয়ালা বলিল, তা'র আগেই আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এখানে নামিয়ে দিয়ে যা'ব।

লোকটার বেহায়াপনা দেখিয়া এইবার আমার সত্য সত্যই রাগ ধরিল। একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলাম, না, বাপু, তোমাকে যা' বলছি, তাই কর। আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যাও, নয়ত এখানেই তোমার পয়সা নিয়ে বিদেয় হও। বলিয়া আমি টঙ্গা হইতে নামিয়া যাইবার উপক্রম করিলাম।

টঙ্গাওয়ালা ব্যস্ত হইয়া বলিল. না বাবু, আপনি নামবেন না; হোটেলেই আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বলিয়া যে দিক হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকেই সে পুনরায় টঙ্গা ছুটাইয়া চলিল।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই গাড়ীর বেগ একটু কমাইয়া দিল। তারপর যেন আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল—পাঁচ দিন ধ'রে ঘোড়াটা ঘরে বাঁধা, এক মুঠো দানা দিতে পারিনি'। এক বছরের শিশুটার মুখে এ' কয়দিন এক ফোঁটা দুধ পড়েনি'। বৃষ্টিতে বাদ্‌লায় একদিন ঘরে ব'সে থাকলে তিন তিনটে প্রাণীর নির্জলা উপোস। বলিয়া নিজের মনে মনেই যেন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করিয়া লইল।

আমি বুঝিলাম, লোকটার বুকে একটি গভীর ক্ষত প্রচ্ছন্ন হইয়া

আছে। একটু সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হে, কিসের কথা বল্‌ছ, টঙ্গাওয়ালা!

সে বলিল, না বাবু, আমার নিজের একটা কথা। বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

লক্ষ্য করিলাম, লোকটার চোখ দুইটি একবার একটু অস্বাভাবিক বড় হইয়া উঠিল। নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাইতে চালাইতে তাহার পার্শ্বস্থ একটী জীর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত কি বস্তুর উপর যেন বার বার তাকাইতে লাগিল।

হোটেলের সম্মুখে গাড়ীবারিন্দায় আসিয়া টঙ্গা থামিল। নামিবার উপক্রম করিয়াও নামিতে পারিলাম না। একবার টঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, দেখ, ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে তুমি সহস্র-ধারা থেকে ফিরে আসতে পারবে?

টঙ্গাওয়ালা বলিল, তা পারব বাবু, এখন আপনার দয়া।

এইবার আর মিনতির অনুরোধ নয়, একটি কথা মাত্র সে বলিল, 'এখন আপনার দয়া!' বহুল বাক্যের অপচয় করিয়া সে অনুরোধ জানাইলে কি করিতাম জানি না, কিন্তু তাহার নিতান্ত অর্থপূর্ণ ঐ একটি মাত্র কথা আমার অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করিল। বলিলাম, আচ্ছা, নিয়ে চল!

টঙ্গা আসিয়া বড় রাস্তায় পড়িল। সম্মুখে, দুই পার্শ্বে বহুদূরে শৈবালিক গিরিশ্রেণীর অস্পষ্ট নীলাভচ্ছায়া আকাশ গাত্রে লীন হইয়া আছে; পথের দুই ধারের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে এই দৃশ্যটি আচম্‌কা আসিয়া চোখের পাতায় ছোঁয়া দিয়া যাইতে লাগিল। শহর ছাড়াইয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ী আসিয়া বনপথের মধ্যে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর বেগ অত্যন্ত কমিয়া আসিল।

আমি একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলাম, এই ভাবে গাড়ী নিয়ে চললে তুমি যে আজ দশ ঘণ্টায়ও ফিরতে পারবে না! টঙ্গাওয়ালা ঘোড়ার রাশ

টানিয়া ধরিয়া বলিল, বাবু, একটু সবুর করুন, পথটা বড় খারাপ! গাড়ীটায় বড্ড ঝাঁকুনি লাগছে। বলিয়াই তাহার পার্শ্বস্থ সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত বস্তুটির দিকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিল।

এমন সময় একটা বড় পাথরের উপর দিয়া চলিতে গিয়া গাড়ীটা শক্ত একটা ঝাঁকুনি খাইল। আমি হাতের কাছের একটা কাঠ ধরিয়া কোন মতে টাল সাম্‌লাইয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সেই জীর্ণ বস্ত্রাবরণ অপসারণ করিয়া বৎসর দেড়েকের একটি ছেলে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া টঙ্গাওয়ালার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। আমি একেবারে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া টঙ্গাওয়ালা নিজেই বলিল, এটি আবাব বাচ্চা। মাত্র কযেক মাসেব রেখে এ'র মা ম'রে যায়! বলিয়া বাঁ হাত দিয়া ছেলেটাকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া আহ্লাদেব সুরে বলিতে লাগিল, দেখ বাচ্ছা, কোথায় এসেছিস্! খুব ঘুম্‌টা আজ ঘুমিয়েছিস্, রাতটা আমায় জ্বালাবি'খন।

ছেলেটা পিছন ফিরিয়া আমার মুখের দিকে একবার তাকাইল। আমার মাথার টুপিটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া টঙ্গাওয়ালাকে অস্ফুট কণ্ঠে কি আব্‌দার জানাইতে লাগিল। টঙ্গাওয়ালা তাহার পায়ের নীচ হইতে একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি ছোট্ট ফুলদার টুপী বাহির করিল। তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহা তাহার মাথায় পরাইয়া দিল।

আমি অপূর্ব বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিয়া যাইতে লাগিলাম। কখন বনপথ অতিক্রম করিয়া গাড়ী আসিয়া চা বাগানের মধ্যে পড়িয়াছে। পথের দুই ধারে বহুদূর বিস্তৃত অনুচ্চ চা গাছের অরণ্য। কোথাও কোনও জনমানবের চিহ্ন নাই। সদ্য মেঘমুক্ত আকাশে দুই একটি বন্য পক্ষী উড়িতে দেখা যাইতেছে মাত্র।

গাড়ীর বেগ অত্যন্ত মন্দ হইয়া আসিল। আমার সেদিকে আর বিন্দু মাত্রও লক্ষ্য নাই। টঙ্গাওয়ালা অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে ঘোড়ার

পিঠে চাবুকটি বুলাইতে বুলাইতে মুখ ফিরাইয়া সদ্য ঘুমভাঙ্গা ছেলেটিকে সহস্র কথায় ভুলাইয়া রাখিতে ব্যস্ত হইয়া আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ীতে তোমার আর কেউ নেই? ছেলেটাকে তার কাছে রেখে এ'লেও ত' পার!

টঙ্গাওয়ালা বলিল, তা' থাকলে কি আর, বাবু, এই শিশুটাকে সঙ্গে করে রাতদিন ঘুরে ফির্‌ছি!

আমি বলিলাম, তুমি আর একটা বিয়ে কর্‌লেই ত পার!

টঙ্গাওয়ালা একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, তা'ও করেছিলাম বাবু, এই ছেলেটার মুখ চেয়ে দশ জনের কথায় তা'ও করেছিলাম, কিন্তু···

আমি উৎসুক হইয়া বলিলাম, কিন্তু কি? সে'ও বেঁচে নেই না কি?

টঙ্গাওয়ালা বলিল, শুন্‌বেন বাবু, শুন্‌বেন সেই দুষ্‌মনীর কথা? আপনার সময় আছে?

আমি বলিলাম, তুমি বল, সময়ের জন্য আমি ভাবি না।

টঙ্গাওয়ালা ছেলেটাকে কোলের কাছে আরও নিবিড় ভাবে জড়াইয়া লইয়া বলিল, তবে শুনুন,—'ছ' মাসের শিশুটাকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে যে দিন এ'র মা'টা মরে গেল, সেদিন আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ল। ভাবতে পার্‌লাম না, আমার কত বড় বিপদ হ'য়েছে! একটা শিশুকে পালন করবার আমার কি জ্ঞানই বা আছে! এ'কথা নিশ্চিত মনে হ'ল যে, মা'টা এর যে পথে গেছে, অল্পদিনের মধ্যে এ'ও সেই পথেই যা'বে, কার সাধ্য তা' থেকে তাকে উদ্ধার করে? কিন্তু কি আশ্চর্য, বাবু, ছেলেটা বেঁচে গেল। সকাল বেলায় কয়েকখানা রুটি নিজের হাতেই ক'রে খেয়ে নিয়ে যখন টঙ্গা নিয়ে বেরুতাম, তখন এই শিশুটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। পথে কোন চায়ের দোকান থেকে এক ফোঁটা দুধ কিনে খাইয়ে নিয়ে একে আমার পাশেই এই জায়গাটিতেই শুইয়ে রাখতাম। গাড়ীর দোলানিতে সে অল্প সময়ের মধ্যেই চুপ ক'রে ঘুমিয়ে পড়্‌ত।

সারা সকাল বেলাটা খেটেখুটে দুপুর বেলায় ঘরে ফিরে আসতাম। আসবার পথে যেদিন হাতে পয়সা থাকত, সে' দিন বাজার থেকে এই বাচ্চাটার জন্যে এক ফোঁটা দুধ, দু' একটি আঙ্গুরের দানা কিনে নে আসতাম। নিজের হাতে নিজের খাবারটি তৈরী ক'রে, এ'কে দুধ ফোঁটা খাইয়ে আবার এ'কে সঙ্গে ক'রে টঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম; ফিরতে কোন কোন দিন অনেক রাত্তির হ'ত। দু' এক পয়সার বিস্কুট কিনে খাইয়ে ছেলেটাকে আমার পাশেই গাড়ীর মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখতাম। আশ্চর্য এর অভ্যেস, বাবু! গাড়ীর এত জোর ঝাঁকুনিতেও কখনই এর ঘুম ভেঙ্গে যেতোনা; তা হ'লে আমার কাজ চালানো দায় হ'ত।

দু' একজন পরামর্শ দিল—তুই আর একটা সাদি কর, এমন ক'রে ছেলেটাকে কি মারবি? আমিও ভাবলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এতটুকুন ছেলেটার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। একদিন আমার ছেলেটা পড়ল অসুখে; সঙ্গে নিয়ে বেরুই, তার উপায় নেই; অথচ দিন আনি, দিন খাই—এইভাবে আমার সংসার চলে। একদিন যদি গাড়ী নিয়ে না বেরুই, তবে আমাদের বাপ-বেটাতে এই ঘোড়াটাকে নিয়ে উপোস থাকতে হয়।

কিছু দিনের মধ্যেই কিছু টাকা ধার কর্জ ক'রে এই শহরেরই একটি মেয়েকে সাদি করে নিযে এলাম। ছেলেটাকে তা'কে আম্মা ডাকতে শেখালাম।

আমি ত বাবু সারাদিন বাইরে বাইরেই থাকি; সকাল থেকে বেরুই, কোন দিন ফিরি, কোন কোন দিন ফিরি না; পথেই রুটির দোকান থেকে দু' চারখানা রুটি কিনে খাই। রাত্তিরেও যে দিন দূরের ভাড়া থাকে, সেদিনও ফিরতে অনেক দেরি হয়। বাড়ীতে কেবল আমার নোতুন বউ আর ছেলেটা থাকে। রাত্রি ক'রে ঘরে ফিরে ছেলেটাকে প্রত্যহ ঘুমন্ত দেখতে পাই; আবার ঘুম ভাঙ্গতে না ভাঙ্গতেই ভোরের দিকে একটু নাস্তা ক'রে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ছেলেটার দিকে নজর দেবার অবসর আর পাই না।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে একটা ভাড়া নিয়ে আমার বাড়ীর সামনা দিয়েই যাচ্ছিলাম। মনে করলাম, বাড়ীর সামনে গাড়ীটাকে একটু দাঁড় করিয়ে ছেলেটা কি করছে, এক চোখ দেখে আসি।

বাড়ীর সাম্‌নে এসে দেখলাম, ঘরের দরজা বাইরে থেকে শিকল আঁটা, বাড়ীতে কেউ নেই। মনে করলাম, হয়ত বউ ছেলেটাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেছে—সারাদিন বেচারী একা একা বাড়ীটাতে প'ড়ে থাকে—কথা বলবারও একজন লোক জুটে না।

আমি গাড়ীতে ফিরে এ'সে গন্তব্য স্থানের দিকে হাঁকিয়ে চললাম। সেদিন ফিরতে একটু রাত্তির হ'ল। বউকে বাড়ীতে এসেই জিজ্ঞেস করলাম, আজ সন্ধ্যার সময় কোথায় গিছলি? একবার বাড়ীতে এসে ডাকাডাকি করে গেছি।

বউ যেন একটু চমকে উঠল, বলল—তা আমাকে তোর সন্দেহ হয়, তুই সারাদিন বাড়ীতে ব'সে পাহাড়া দিলেই ত পারিস্‌।

কথাটা শুনতেই আমার মনে হ'ল, হঠাৎ কে যেন আমার পিঠে এক ঘা চাবুক কসে দিল। সন্দেহের কথা, বাবু, তখন পর্যন্ত আমার মনেও আসে নি। এই ভেবে তাকে সে কথা কখনও জিজ্ঞেসও করি নি। কিন্তু তার এই জবাবে হঠাৎ কে যেন আমার চোখ খুলে দিল। তার চরিত্রে সন্দেহ করবার সম্ভাবনা সে-ই ইঙ্গিত দিয়ে আমার বুকে জাগিয়ে তুলল। আমি সে দিনের মত চুপ করে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা, দেখি, তুমি কত বড় শয়তানী!

এমনি ক'রেই দিন যায়; আমি আমার নিত্য কর্ম করে যাচ্ছি, কিন্তু একটি দৃষ্টি সব সময়ই তখন থেকে তা'র উপর সতর্ক হ'য়ে আছে! তার এ'কথাটা আমি কখনও ভুলতে পারিনি—যদি আমাকে সন্দেহ করিস্‌। সন্দেহ! তাইত, লোকে বউয়ের চরিত্রে যে আবার সন্দেহও করতে পারে, তা আগে আমার কোন দিন ধারণাই ছিল না। আমার যে বউটা মরে গেছে, তার কথা মনে পড়ল! একদিন তা'কে আমি

ঠাট্টা ক'রে বলেছিলাম—তুই আমাকে ভালবাসিস্ না। দুঃখে অভিমানে বউটা দু'দিন জলস্পর্শ করে নাই। তার সেই গোসা ভাঙ্গাতে আমার যা মেহনৎ!'

টঙ্গাওয়ালার জীর্ণ মুখখানিতে অলক্ষ্যে একটু হাসি খেলিয়া গেল, সে উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, সে সেই পূর্ব দাম্পত্য জীবনের স্মৃতিতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন এই বর্তমান কলুষিত অভিজ্ঞতার যে কাহিনী সে বর্ণনা করিতেছিল, তাহার পার্শ্বে সে যেন সেই স্বর্গীয় চিত্রকে স্মরণ করিতেও ব্যথিত হইতেছে।

ছেলেটা বাপের হাত হইতে চাবুকটা কখন নিজের হাতে লইয়া তাহা দিয়াই আপন মনে খেলা করিতেছে! কখনও কখনও ডান হাত উচ্চে তুলিয়া ক্ষুদ্র মুষ্টিতে চাবুক দিয়া ঘোড়ার পিঠে মৃদু আঘাত করিতেছে! ঘোড়ার লেজটা কখনও আসিয়া তাহার গায়ে পড়িতেছে—আত্মীয় স্থানীয় এই মূক প্রাণীটি পর্যন্ত যেন মাতৃহারা এই শিশুর গায়ে কোমল পুচ্ছাগ্রদ্বারা পরম স্নেহাশীর্বাদ বুলাইতেছে!

দূরে শৈবালিক গিরিশ্রেণীর পরপ্রান্তে সূর্য অস্ত যাইতেছে। আকাশ লাল, দিগন্তের বিলীয়মান মেঘপুঞ্জে লাল রং ধরিয়াছে—ছেলেটার গোলাপের মত গাল দুইটিতে আকাশ যেন তাহার রংয়ের ঐশ্বর্য নিঃশেষে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে।

আমি একটু ব্যগ্র হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর কি হ'ল, টঙ্গাওয়ালা?

সে যেন সহসা পূর্ব চেতনায় ফিরিয়া আসিল; পুনরায় বলিতে লাগিল, তারপর একদিন গাড়ী নিয়ে অত্যন্ত অসময়ে সহসা বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লাম! তখন সন্ধ্যার দিক্! এক্সপ্রেস গাড়ীটা স্টেশনে এমন সময়ে এসে ভিড়ে। স্টেশনে থাক্‌লে, দু' একটা ভাড়া পাওয়া যায়;—ঠিক এমন সময়টিতে গিয়ে একেবারে বাড়ীতে হাজির হয়েছি।

বাড়ীতে জন-মানবের চিহ্নমাত্র নাই। সে দিনের মত ঘর বাইরের

দিক থেকে শিকল-আঁটা, তা'র উপর চাবি দেওয়া। আমি মনে করলাম, আজ আর দোরগোড়া থেকে নড়ব না; দেখি, কখন বাড়ীতে ফিরে আসে, নিত্য কোথায় যায়!

আমি ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের দু-একটি কাজ কর্ম করছি, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে ছেলেটার কান্নার শব্দ পেলাম। ছুটে গিয়ে জানালাটা গায়ের জোরে একটু ফাঁক ক'রে দেখতে পেলাম, ভেতরে মেঝের উপর প'ড়ে ছেলেটা ঘুমুচ্ছে—তার চারদিকে পিঁপড়ের সারি। মনে হ'ল, পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে বলে, হয়ত ঘুমের ঘোরে একটু কেঁদে উঠেছিল, আবার চুপ ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার আর তখন বাবু মাথাটা ঠিক ছিল না। গায়ের জোরে কপাট ধাক্কিয়ে ভেঙ্গে ফেল্লাম। ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দেখি, তার সারা গায় পিঁপড়ে কাম্ড়ে একেবারে চাকা চাকা রক্তের দাগ করে দিয়েছে। আমি তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে আদর করতে চাইলাম; কিন্তু প্রতিক্ষণেই ঘাড়টি নেতিয়ে পড়ছে। আমার মনটা এক আশঙ্কায় দুর দুর করে উঠল। মনে হ'ল, হয়ত ছেলেটাকে বিষ খাইয়ে সে পালিয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে ছেলেটাকে এক দাওয়াইখানায় নিয়ে গেলুম! ডাক্তার বল্লে, ছেলেটাকে অল্প মাত্রায় আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। ডাক্তার বহু কষ্টে আফিমের নেশা কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু অবশ হয়ে ছেলেটা আমার গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে রইল।

বাড়ী ফিরে এসে দেখি, তখনও সেই দুষ্‌মনী ফেরেনি। মনে মনে স্থির করলাম, আজ তাকে যা শাস্তি দেব, তা দেখে স্বয়ং শয়তানও ভয় পাবে। তারপর আমি আর এই ছেলেটা—যে জীবন আমাদের আগেকার ছিল, সেই জীবনে আবার পাড়ি দিয়ে চলব।

বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারা না যায়, সে জন্য দরজাটা আবার তেমনি করেই বন্ধ করে রাখলাম। রাত্রি তখন আটটার কম হবে না, সহসা আমার বাড়ীর সামনে লোকের পদশব্দ শুনলাম।

সমস্ত দেহের রক্ত যেন তীরবেগে আমার মাথায় চলে এল। টঙ্গার চাবুকটি আমার হাতের কাছেই ছিল। তাই হাতে করে নিয়ে দৌড়ে এলাম। আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই কে যেন একটা জোয়ান ছোক্‌রা দৌড়ে গিয়ে রাস্তায় উঠেই পালিয়ে গেল। সে-ই বোধ হয় বৌকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। বৌটা আঙ্গিনার মাঝখানে স্তম্ভিত হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল, আর আমি মনের সমস্ত জ্বালা মিটিয়ে চাবুকের বাঁটটা পর্যন্ত তার পিঠে ভাঙ্গলাম। তার চীৎকার সোর হাঙ্গামায় লোকজন এসে জড় হল; মনের জ্বালাটা যখন একটু জুড়াল, তখন বউটাকে ঘাড় ধরে রাস্তায় দাঁড় করে দিয়ে এলাম।

দূরে, বহু দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়ের ছায়া আর দেখা যায় না। একটি দুইটি করিয়া উপরের আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের গিরিশৃঙ্গে, যেখানে মুসৌরীর শহর, সেখানে নির্বাপিতপ্রায় অসংখ্য তারকার মত ক্ষীণ বৈদ্যুতিক আলোগুলি কখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে সেইগুলিকে কখনও দেখা যায়, আবার কখনও একেবারেই দেখা যায় না।

টঙ্গাওয়ালাকে বলিলাম, গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চল। সে তাহাই করিল, জিজ্ঞাসা মাত্র করিল না, গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার সঙ্কল্প কেনই বা পরিত্যাগ করিলাম।

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ। ছেলেটা তাহার পিতাকে ভয়ে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছে—ঘোড়াটি তাহাদের পুরাতন ভৃত্যের মত পিতাপুত্রকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।

অনেক রাত্রিতে টঙ্গা হোটেলের দরজায় আসিয়া থামিল। আমি পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া টঙ্গাওয়ালার হাতে দিলাম, বলিলাম, তোমার ছেলের হাতে দিও। বলিয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

অবিশ্বাসী

সন্তোষবাবুর স্ত্রী মমতার স্বাস্থ্য এই এক বৎসর ধরিয়া আদৌ ভাল যাইতেছিল না। সন্তোষবাবু কখনও মনে করেন, হয় ত অল্প বয়সে সন্তানটি হওয়াতে স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে; কিন্তু তিনি কিছুতেই ভাবিয়া পান না, মমতাকে নিতান্ত অল্প বয়স্কাই বলা যায় কি করিয়া, আর খোকার বয়সও ত এক বৎসরের বেশি হইতে চলিল, তাহা হইলে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার এই ভগ্নস্বাস্থ্যতার কি-ই বা আর কারণ থাকিতে পারে।

সহকর্মীদিগের মধ্যে যাহারা বয়সে প্রবীণ, তাহাদের কেহ কেহ বলিলেন, বুঝলে ভায়া, যা'কে বলে পশ্চিমের হাওয়া, দু'টি দিন গায়ে লাগ্‌লে শরীর ঝর্‌ঝরে হয়ে যায়। যাও না, পূজোর ছুটি ত আসছে, বৌ-মাকে নিয়ে একবার পশ্চিমটা ঘুরে এ'স। দেখ্‌বে, দু'দিনে শরীরটা তাজা হয়ে উঠ্‌বে। বলিয়া কেহ কেহ তাহাদের বিগত জীবনের জীর্ণ স্মৃতির পাতা হইতে পশ্চিম-ভ্রমণের দুই একটি বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীর উল্লেখ করিলেন।

পরামর্শটি সন্তোষবাবুর অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল না। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, প্রায় বৎসর দুই পূর্বে তিনি বিবাহ করিয়াছেন অবধিই এই সরকারি বাড়ীটার নির্দিষ্ট চৌ-সীমানা উত্তীর্ণ হইয়া স্ত্রীকে লইয়া কোথাও বাহির হন নাই। ডাক-বিভাগের চাকুরি, ছুটিছাটা একরূপ নাই বলিলেই হয়। তিনি অফিসের কাজে প্রায় সমস্ত দিন মগ্ন থাকিয়াও সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া রুগ্না স্ত্রীর সেবা করিয়া এই দুইটি বৎসর যে কি ভাবে কাটাইয়া দিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যে স্ত্রীর অবসর বিনোদনের জন্য যে কোন ব্যবস্থাই

অবলম্বন করেন নাই, তাহা তাহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। ইহাই মনে মনে চিন্তা করিয়া স্ত্রীর এই স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য নিজেকেও দায়ী করিলেন।

সে'দিন বাড়ী ফিরিয়া সন্তোষবাবু স্ত্রীর নিকট কথাটা পাড়িলেন। মমতা বলিল, বেশ ত, চল না, আমি ত কতদিন ভেবেছি, একবার তোমার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাই, এই ঘরের কোণটাতে ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে! কিন্তু তোমার যা' আপিসের কাজ!

সন্তোষবাবু মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তা' হোক্‌গে, মনে করেছি, একমাসের ছুটি নে'ব।

মমতা ব্যগ্র হইয়া বলিল, না, না, এক মাসের নয়! নিতে হয়, ছ'তিন মাসের ছুটি একসঙ্গে নিয়ে নাও, কোথাও গিয়ে যদি ভাল লাগে, তবে সেখানে কয়েকটা দিন বেশ থাকা যা'বে। সন্তোষবাবু তাহাতেই সম্মত হইলেন।

এই বিষয়ে স্বামি-স্ত্রীতে সেদিন আরও অনেক আলাপ হইল। শেষে স্থির হইল, সন্তোষবাবু কালই ছুটির জন্য আবেদন করিবেন এবং দিন পনেরর মধ্যে ছুটি মঞ্জুর হইলেই তাহারা এই আশ্বিনের শেষ দিকেই বাহির হইয়া পড়িবেন!

একটা কথা সেই সম্পর্কে সন্তোষবাবুর বারবারই মনে হইতেছিল। স্ত্রী রুগ্না, সঙ্গে এক বৎসরের একটি শিশু, এই অবস্থায় তাহার সঙ্গে আর একজন লোক হইলে বড় ভাল হইত। একবার মনে করিলেন, একটা চাকর সঙ্গে নিবেন, কিন্তু এই দেশী চাকরগুলির যেমন বুদ্ধিশুদ্ধি, তাহাতে বিদেশে গিয়া তাহাকে চাকরকেও যে সাম্‌লাইতে না হইবে, তাহাই কে বলিতে পারে? অতএব একজন চলা ফেরায় অভ্যস্ত জানাশোনা লোক সঙ্গে থাকিলে খুব ভাল হইত, কিন্তু এমন লোক সহসা কোথায় পাওয়া যায়?

সন্তোষবাবু তাহার সহকর্মীদিগের মধ্যে দুই একজনকে তাহার সঙ্গী

হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কেহই সম্মত হইল না। তাহাদের অনেক বাধা, অনেক ওজুহাত।

সন্তোষবাবুর সহসা নীহারের কথা মনে পড়িল। নীহার রেলের আপিসে কাজ করে। সে অবশ্য একবার অনেকদিন আগে সন্তোষবাবুকে তাহার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। তখন মমতার শরীরের অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না; সেইজন্যই তাহার সেইবার যাওয়া হয় নাই। সন্তোষবাবু মনে করিলেন, এবার তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া ধরিলে সে তাহাদের সঙ্গী হইলেও হইতে পারে। বিশেষতঃ সে যখন পূর্বে একবার ঐ সব অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়াছে, তাহার মত লোক সঙ্গী পাইলে আর কোনও কথাই উঠিতে পারে না।

সন্ধ্যায় সন্তোষবাবু নীহারের মেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বিষয় শুনিয়া নীহার বলিল, তা বেশ, আমি সঙ্গে যেতে রাজী আছি, কিন্তু আমি তোমাদের সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে বৌদির স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ উন্নতি দেখিয়ে নির্বিঘ্নে ঘরে পোঁছে দেব, বখ্‌শিস্‌ আমাকে দেবে, কবুল কর!

সন্তোষবাবু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে'খন, তা হ'লে, কথা কিন্তু ঠিক থাক্‌ল, আমি এদিকে সব ঠিক ঠাক করিগে!

নীহার দেখিল, ব্যবস্থাটা মন্দ হয় নাই। রেলের চাকুরীর দৌলতে গাড়ী ভাড়া যখন নিজের একান্তই লাগিবে না, তখন এমন সঙ্গী পাইলে বিদেশ যত সুদূর বিদেশই হউক না কেন, তাহা গৃহের চেয়েও মধুর হইয়া উঠিবে। পূজায় আপিস ছুটি থাকে, কিন্তু কোন ছুটিতেই সে বাড়ী যায় না। আজ দশ বৎসর হইতে চলিল, তাহার মা'র মৃত্যু হইয়াছে, ইহার মধ্যে দশবারও সে বাড়ীতে গিয়াছে কি না সন্দেহ। মা'র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার গৃহের প্রতি আকর্ষণ লোপ পাইবার এতদিন পর্যন্ত এমন কিছু কারণ ছিল না; কিন্তু আজ বৎসর দুই হইল, বৃদ্ধ বয়সে তাহার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া অবধি তাহার মন গৃহের প্রতি সমস্ত দিক দিয়াই বিমুখ হইয়া গিয়াছে। সেই অবধি তাহার

গৃহহারা মন প্রবাসের দুঃখের মধ্যে নিজের সংস্থান করিয়া লইলেও একটুকু গৃহ-সুখের আস্বাদনের জন্য সর্বদা মাথা খুঁড়িয়া মরিত।

মমতা সমস্ত শুনিয়া বলিল, বেশ ত, তা' ভালই হোল, একজন লোক না হ'লে, খোকাকে সাম্‌লানো, আর আমারও যা অবস্থা, এই দু'দিক সাম্‌লানো এ কখনই তোমার কর্ম নয়। কিন্তু নীহার বাবুর সঙ্গে কোন দিন আলাপ করিনি', তার সাম্‌নে বেরুতে আমার লজ্জা কর্‌বে।

সন্তোষবাবু একটু রাগের ভাবে বলিলেন, ঐ ত তোমার দোষ। আজকালকার দিনে বিদেশে থাক্‌তে গেলে, ও'রকম কর্‌লে চলে না। আর নীহার কেমন ছেলে, দেখবে তা'র সঙ্গে আলাপ ক'রে; কেমন চমৎকার ও'র স্বভাব!

মমতা বলিল, কিন্তু আলাপ কর্‌তে হ'লেও প্রথম প্রথম আমার খুব লজ্জা কর্‌বে কিন্তু! সন্তোষবাবু মমতার ছেলেমানুষি কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, তা' করুকগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লজ্জা ভাঙ্‌লেই হ'লো।

মমতার মনটা আজ বড় ভাল লাগিতেছিল। সে অনেক দিন ধরিয়া কল্পনা করিয়া আসিয়াছে, স্বামীর সঙ্গে কোথাও বেড়াইতে যাইবে; বাংলাদেশের বদ্ধ হাওয়া হইতে একটু মুক্ত হাওয়ায় গিয়া স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিয়া আসিবে। ভাবিতে ভাবিতে সে খোকার কথা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যায়। সে শুধু ভাবে তাহাকে, আর তাহার পাশে তাহার স্বামীকে—তাহারা যেন কোন এক সুদূর প্রবাসের জনহীন পথরেখা ধরিয়া চলিয়াছে, তাহারা সেই কল্পলোকের পথচারী; আর কেহ সঙ্গী নাই, এমন কি, খোকাও নয়। উপরে উন্মুক্ত আকাশ, আর সম্মুখে অনন্ত পথরেখা—সেখানে সমাজ নাই, লোকাচার নাই, সংস্কার নাই। ভাবিতে ভাবিতে মমতার রোগ-ভারাক্রান্ত দেহ যেন নিমেষে হাল্‌কা হইয়া উঠিল।

বড় আপিশ হইতে সন্তোষবাবুর ছুটি মঞ্জুর হইয়া আসিল। নীহারের সঙ্গে আলোচনার ফলে স্থির হইল যে, প্রথম তাহারা এখান হইতে

রওয়ানা হইয়া আগ্রায় যাইবে, সেখান হইতে মথুরা, বৃন্দাবন ঘুরিয়া দিল্লী হইয়া হরিদ্বারে গিয়া কিছুকাল থাকিবে।

রওয়ানা হইবার চারি পাঁচ দিন পূর্বে সন্তোষবাবু একদিন আসিয়া মমতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নীহারকে আজ রাত্তিরে এখানে খেতে বলব? তার সঙ্গে না হয় তুমি আলাপ-পরিচয় ক'রে রাখ। তা' নয়ত পথে বেরিয়ে ও'রকম লজ্জা সঙ্কোচ যেমন দেখ্‌তেও ভাল লাগ্‌বে না, তেমনি কাজের দিক দিয়েও অসুবিধে হবে।

মমতা বলিল, খেতে বল, কিন্তু আজই তা'র সঙ্গে আমি আলাপ কর্‌তে পার্‌ব না। আমার খুব লজ্জা কর্‌বে।

সন্তোষবাবু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কাজের সময় ও'রকম আমার ভাল লাগে না।

মমতা স্বামীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, আচ্ছা, বেশ বল, কিন্তু একজন ভদ্রলোককে খেতে বল্‌চ, ঘরে কি আছে না আছে, কি রান্না হবে না হ'বে, তা'র একটু খোঁজ কর্‌তে হবে ত!

সন্তোষবাবু বলিলেন, সে জন্যে ভাবি নে, নীহারকে নিজের লোকের মতই মনে করি, এক মেসে তার সঙ্গে আট বছর কাটিয়েছি, তার কাছে আর বাইরের ভদ্রতা রক্ষা কর্‌বার কোন প্রয়োজন নেই।

সন্তোষবাবু নীহারকে সে দিন রাত্রে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও মমতা সেদিন তাহার সম্মুখে বাহির হইতে কিংবা আলাপ করিতে পারিল না। সন্তোষবাবু ইহাতে মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইলেও বাহিরে প্রকাশ করিয়া কিছু বলিলেন না; ভাবিলেন, পথে বাহির হইলেই এই সঙ্কোচ আপনা হইতেই কাটিয়া যাইবে। এখন আর এই বিষয় লইয়া বাড়াবাড়ি করা ভাল দেখায় না।

পূজার সময় বলিয়া কয়দিন ধরিয়াই গাড়ীতে অত্যন্ত ভীড় হইতেছিল। নীহার সেদিন আপিস হইতে ফিরিবার পথে সন্তোষবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আমি কণ্ট্রোলে খবর নিয়ে জেনেচি, কাল

রাত্তির আটটায় হাওড়া থেকে একখানা দিল্লী স্পেশাল ছাড়্‌বে। চল, ও ট্রেনখানাতেই বেড়িয়ে পড়া যাক্‌। সাধারণ যাত্রীরা স্পেশালের খবর রাখে না, তাই তা'তে ভীড়ও কম হয়; আর এতদূরের পথ একটু পা ছড়িয়ে যদি বস্‌তে না পারা গেল, তা হ'লে অসুবিধের একশেষ হ'বে। সন্তোষবাবু ইহা অতি উত্তম যুক্তি বিবেচনা করিলেন এবং সামান্য কিছু জিনিষপত্র, খোকার জন্য বিশেষ কিছু কিছু সরঞ্জাম ইত্যাদি গুছাইয়া লইয়া পরের দিনই সকালে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন।

দিল্লী স্পেশাল পরের দিন রাত্রি ন'টায় আসিয়া তুণ্ডলা জংশনে পৌঁছিল। নীহার বলিল, বৌদি, খোকাকে আমার কাছে দিন, এখানেই নাম্‌তে হ'বে। আজ রাত্রে কিছু দুর্ভোগ আছে, কাল সকাল সাতটার আগে আর আগ্রার ট্রেন মিল্‌বে না। যে ভাবেই হোক, ওয়েটিং রুমেই আজ রাত্রি বাস কর্‌তে হ'বে।

সন্তোষবাবু একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, দেখ, আজ রাত্তিরটা ঘুমোতে না পার্‌লে ও'র শরীর নিশ্চয়ই খুব খারাপ হ'য়ে পড়্‌বে। কিন্তু ওয়েটিং রুমে সে রকম কি ভাল ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'বে?

নীহার তাহাকে অভয় দিয়া বলিল, তোমার সে জন্য কিছু ভাব্‌তে হবে না, সন্তোষদা! ইচ্ছে হয়, তুমিও একটু ঘুমিও, সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে দিতে পার্‌ব। আর আমি না হয়, কুটীর-দ্বারে ধনুকরে পাহারায় নিযুক্ত থাক্‌ব। কি বলেন, বৌদি? বলিয়া মমতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া সন্তোষবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। মমতাও হাসিতে হাসিতে ঘুমন্ত খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মাথার টুপীটা টানিয়া ঠিক করিয়া দিতে লাগিল।

নীহার বলিল, দিন্ আমার কাছে, বলিয়া দুই হাত পাতিয়া মমতার কাছ হইতে খোকাকে নিজের কোলে লইল। তারপর বলিল, আসুন,

আমার সঙ্গে নেমে আসুন। বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সন্তোষবাবু কুলি ডাকিয়া জিনিসপত্রগুলি বাঁধা ছাদা করিয়া তাহাদের পিছন পিছন ওয়েটিং রুমে আসিয়া পৌঁছিল।

নীহার বলিল, দাও ত বিছানাটা খুলে, বেঞ্চির ওপরে দিব্যি বিছিয়ে দিই! বলিয়া খোকাকে সন্তোষবাবুর কাছে দিয়া নিজেই একটা বিছানা খুলিয়া পরিপাটি করিয়া বিছাইয়া দিল। বলিল, নিন্, বৌদি, এ'বার শুয়ে পড়ুন! আমি দেখ্‌ছি, খাবারের একটা কি ব্যবস্থা করা যায়! এ'কথা আগেই বলে নিয়ে এসেছি যে, এ খোট্টার দেশে ডাল-রুটি ছাড়া আর কিছুই জুট্‌বে না।

মমতা বলিল, আমার জন্যে কিন্তু আপনাকে কোন কষ্টই কর্‌তে হ'বে না; আমি আজ রাত্তিরে কিছুই খাব না, বড় ক্লান্ত হয়েছি, এ'বার ঘুমিয়ে পড়্‌লেই কাল আপনার সাতটার ট্রেণের আগে টেনেও তুল্‌তে পারেন কি না সন্দেহ।

নীহার বলিল, আপনি ঘুমুবেন না, আমি এক্ষুণি যা হোক্ কিছু নিয়ে আস্‌ছি। বলিয়া নীহার খোকাকে মমতার কোলে দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

সন্তোষবাবু আর একটি বেঞ্চির উপর নিজের বিছানাখানি পাতিয়া লইয়া ক্লান্ত দেহ তাহাতে এলাইয়া দিলেন।

পরের দিন দশটার সময় আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে পৌঁছিয়া তাহারা মেট্‌কাফ্ রোডে একটি বাঙ্গালী হোটেলে গিয়া উঠিল। হোটেলটি দেশীয় হইলেও আধুনিক গৃহ-সজ্জায় সুরুচি-সম্মত বিস্তৃত ফুলের বাগানে ইউরোপীয় বলিয়াই ভ্রম হয়। উর্দি-পরা চাপরাশি খানসামারা আসিয়া একখানি দক্ষিণ-খোলা ঘরের তিনখানি খাটের উপর তিনখানি বিছানা পাতিয়া দিয়া গেল। নীহার স্বতন্ত্র একখানি ঘর লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সন্তোষবাবু কিছুতেই তাহাতে সম্মতি দিলেন না; বলিলেন, না না, মিছামিছি তোমার আর আলাদা খরচের প্রয়োজন নেই, এই ঘরটি ত

বেশ পাওয়া গেছে, কথায় গল্পে যে কয়দিন থাকা যায়, এখানে বেশ থাকা যাবে। মমতা এই সম্পর্কে কোন কথাই কহিল না।

স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতেই নীহার মমতাকে বলিল, বৌদি, তাজমহল দেখ্‌বেন? পূবদিক্‌কার জান্‌লাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ঐ যে দেখ্‌চেন, এই তাজমহল!

মমতা ভাল করিয়া মাথার চুল্ আঁচ্‌ড়াইতে ভুলিয়া গেল; গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া জড়াইয়া পরিতে গিয়াছিল, তাহাও পরা হইল না, মাথা হইতে কাপড় খসিয়া পড়িয়া গেল, অবিন্যস্ত একরাশি চুল অর্ধনগ্ন পিঠের উপর লুটাইতে লাগিল। সে ছুটিয়া আসিয়া জান্‌লার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায়? কোন্ দিকে?

নীহার জানালার কাছে গিয়া হাত তুলিয়া দেখাইয়া দিল। সন্তোষবাবু হাসিয়া কহিলেন, যেমন নীহার তুমি ছেলেমানুষ, মমতাও ঠিক তেম্‌নি। দু'দিনের ট্রেনের ঝাঁকুনি যা গেছে, কোথায় একটু চানটান ক'রে এখন খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম ক'রে নে'বে, তা' না ক'রে, এখুনি এসব কি আরম্ভ করেছ? তাজমহল ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না! সন্ধ্যের আগে বেরুলেই চল্‌বে। বলিতে বলিতে সন্তোষবাবুও জানালার কাছে আসিয়া বাহিরে দূরে তাজমহলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

এমন সময় খানসামা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, হুজুর, খানা তৈয়ার।

সন্তোষবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, চল, এ'বার খেয়েদেয়ে লওয়া যাক্। তারপর যদ্দিন পর্যন্ত তাজমহল একেবারে অরুচি না ধরে, তদ্দিন পর্যন্তই না হয় এখানে থাকা যাবে।

সন্ধ্যার পূর্বেই কাপড় চোপড় পরিয়া সকলে বাহির হইল।

তাজমহলে গিয়া পৌছিতে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল; কিন্তু শুক্ল পক্ষের কি একটা তিথি ছিল বলিয়া আকাশে তখন অল্প অল্প জ্যোৎস্না ছিল। শারদাকাশের সেই স্বল্প জ্যোৎস্নালোকে তাজমহলের মর্মর কান্তি

যেন স্বপ্নলোকের মায়াপুরীর মত তাহাদের চোখের সাম্‌নে ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল।

মমতা তাজমহলের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া গেল। বহুকালের যেন একটি বিস্মৃতপ্রায় সুখস্বপ্ন তাহার চোখের সম্মুখে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মমতার মনে হইল, সে এক সময় স্কুলে পড়িবার কালে চমৎকার আবৃত্তি করিতে পারিত। একবার স্কুলের বার্ষিক সভায় সে সত্যেন্দ্র দত্তের 'তাজমহল' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিল। কিন্তু সে তখন তাজমহল দেখে নাই, কোনদিন দেখিতে পাইবে, এমন কল্পনাও করিতে পারে নাই। আজ তাহাই বাস্তব বিগ্রহে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহার অন্তরের সেই বিস্মৃতপ্রায় কবিতার কলিগুলি যেন প্রভাত সমীরণের শিহরণের মত দুলিয়া উঠিল!

মমতা সন্তোষবাবুর কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, মনে আছে, বিয়ের রাত্তিরে তুমি আমাকে কি ব'লে ডেকেছিলে?

সন্তোষবাবু নিম্নস্বরে জবাব দিলেন, আছে, মমতাজ!

মমতা সন্তোষবাবুর জামার আস্তিনটা ধরিয়া একটু আস্তে টানিয়া বলিল, আর তার সঙ্গেই যে বলেছিলে, জগতে একজন প্রেমিক ছিল, সে শাজাহান, সে তার প্রিয়ার ভালবাসায় অমর হয়ে আছে, আমিও তোমাকে তেমনি ভালবাস্‌ব।

সন্তোষবাবু একটু সরিয়া গিয়া বলিলেন, যাও, তুমি এখনও যে কি ছেলেমানুষ?

মমতা পুনরায় সন্তোষবাবুর কাছ ঘেঁসিয়া গিয়া দাঁড়াইল, তেমনি অনুচ্চস্বরে বলিল, এখানে যতদিন আছি, ততদিন তুমি আমাকে আমার সেই নাম মমতাজ ব'লেই ডেকো, তা'কে আর সংক্ষেপ ক'রে নিয়ো না।

সন্তোষবাবু বলিলেন, ছিঃ, নীহার কি মনে করবে?

সহসা মমতা যেন চেতনার রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। সন্তোষবাবুর কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া নীহারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আচ্ছা

ও'গুলোর উপরে ওঠা যায় না? বলিয়া উচ্চ মিনারগুলি দেখাইয়া দিল।

নীহার বলিল, নিশ্চয়ই ওঠা যায়, ভেতরের দিকে ঘুরে ঘুরে চমৎকার সিঁড়ি আছে। দেখুন না, কত লোক নেমে আস্‌চে!

মমতা আব্দারের স্বরে বলিল, চলুন না, ও'র ওপরটা তা'হলে দেখে আসা যাক্।

সন্তোষবাবু বলিলেন, আমি খোকাকে নিয়ে নীচে এই বেদীর উপর বসচি, যাও, তোমরা ঘুরে এস; খোকাকে নিয়ে অতদূর উঁচুতে উঠ্‌তে পারা যা'বে না।

নীহার বলিল, তা'লে আমিই বরং খোকাকে নিয়ে বস্‌চি, তুমিই গিয়ে ঘুরে এ'স।

সন্তোষবাবু বলিলেন, পথঘাট তোমার সব জানা শোনা, তুমিই যাও! আমি অচেনা পথে উঠ্‌তে গিয়ে কোথায় ঠোক্কর খাই, কে জানে! বলিয়া নিজেই হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু এই হাসিতে মমতা কিংবা নীহার যোগ দিতে পারিল না।

সিঁড়ির দরজার কাছে আসিয়া ভিতরের দিকে তাকাইয়া দেখা গেল, সিঁড়ির পথ ভীষণ অন্ধকার। এই রন্ধ্রহীন পথে কোনদিন দিবালোক প্রবেশ করিতে পারে না, আর এখন ত রাত্রি। নীহার পকেট হইতে টর্চ বাহির করিয়া জ্বালিতেই সম্মুখের মর্ম্মর-সোপানশ্রেণী উজ্জ্বল স্ফটিকের মত ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল।

নীহার বলিল, কোন ভয় নেই, আসুন বৌদি! বলিয়া নিজে আলো লইয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

কতদূর উঠিয়াই মমতা বলিল, নীহারবাবু, একেবারে এ'র চূড়োয় উঠ্‌তে কতক্ষণ সময় লাগ্‌বে?

নীহার চলিতে চলিতে বলিল, সে'ত আপনার উপর নির্ভর করে। আমি হ'লে ত দশ মিনিটেই উঠে যাই। সে'বার যখন দিল্লীতে, তখন এক হিন্দুস্থানীর সঙ্গে বাজী ধর্‌লাম, কে কুতুব মিনারের চূড়ায় সব চাইতে

আগে উঠ্‌তে পারে। এক সঙ্গে স্টার্ট নিলাম, চৌদ্দ মিনিটে আমি একেবারে চূড়োতে গিয়ে পৌঁছে দেখি ভুঁড়িওয়ালা হিন্দুস্থানীর সাড়াও সেই। এ কি? আপনি যে আর উঠ্‌তেই পাচ্ছেন না!

মমতা দাঁড়াইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, শ্লো বাট্ ষ্টেডি (Slow but steady)! নীহার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির শব্দ সেই রন্ধ্রহীন অন্ধকারাবর্তে যেন বারবার মাথা কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মমতা আবার উঠিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, দেখ্‌লেন, শব্দটা কেমন শোনায়! মনে হয়, যেন এ' কোথায় আমরা চলেছি, বাইরের জগতের আলো-হাওয়ার সঙ্গে এ'র কোন সম্পর্ক নেই। এমন কি, কথাটা পর্যন্ত এ'খানেই আট্‌কে রইল।

আরও কিছুদূর উঠিতেই দেখা গেল যে, উপরের দিকটাতে অন্ধকার কেমন যেন একটু ফিকা হইয়া উঠিয়াছে, একটুকুন চার-কোণা চাঁদের আলো সিঁড়িগুলির উপর মূর্ছাহত হইয়া নিতান্ত আড়ষ্টভাবে পড়িয়া আছে।

নীহার উপরের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া বলিল, দেখ্‌লেন, কি চমৎকার! ও'খানে একটা দরজার মত আছে, তা' দিয়ে চাঁদের আলো এ'সে পড়েছে। খানিক দূরে দূরেই অমনি একটা ক'রে দরজার মত দেখ্‌তে পাবেন।

মমতা বলিল, তাইত! আচ্ছা, ও'দিকে তাকালে খোকাদেরে দেখ্‌তে পাওয়া যা'বে?

নীহার বলিল, নিশ্চয়ই, চলুন, দেখাব।

দরজা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখা গেল, মিনারের গা' চারদিক ঘেরিয়া একখানি অপ্রশস্ত বারান্দার মত। তাহাও রেলিং দিয়া ঘেরা। নীহার ও মমতা দরজা দিয়া বাহির হইয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, তাহারা অনেক দূর উঠিয়াছে, তাজমহলের পূর্বদিককার বেদীর উপর

খোকাকে লইয়া সন্তোষবাবু বসিয়া আছেন। মমতা হাততালি দিল, নীহার দুই একবার ডাকিল; কিন্তু সন্তোষবাবু কোন সাড়ার লক্ষণ দেখাইলেন না; মনে হইল, যেন তিনি তাহাদের হাঁকডাক কিছুই শুনিতে পান নাই।

মমতা চারিদিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেল। নীহার বলিল, দেখেচেন, যমুনা কি চমৎকার দেখাচ্ছে এখান থেকে?

মমতা ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না, অসীম তৃপ্তির সহিত কেবল একটা কথা মুখ দিয়া বলিল, চমৎকার!

কথায় গল্পে সিঁড়ি ভাঙ্গিবার পরিশ্রম মমতা অনেকটা লাঘব করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যখন প্রায় তাহারা শেষ দরজাটার নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন মমতা আর পারিল না! বলিল, নীহারবাবু, আমাকে একটু ধর্‌বেন? আমার মাথাটা যেন ঘুর্‌ছে!

নীহার তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল, এই ত প্রায় পৌঁছে গেছি, একেবারে উপরে পেঁছুলে দেখ্‌বেন, কি চমৎকার হাওয়া, একটু দাঁড়ালেই শরীরটা হাল্কা হয়ে যাবে।

মমতা ক্লান্তস্বরে বলিল, না, নীহারবাবু, আমি আর একেবারেই পাচ্ছিনে, আমাকে একটু ধরুন, তা' নইলে হয় ত পড়ে যাব! বলিয়া নিজেই নীহারের কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

নীহার লক্ষ্য করিল, মমতার চক্ষু দুইটি যেন মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, ডান হাতখানি তাহার স্কন্ধচ্যুত হইয়া দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নীহার ডাকিল, ও' বৌদি! মমতা কোন জবাব দিল না, কেবল সংজ্ঞাহীন দেহখানি ধীরে ধীরে নীহারের গায়ের উপর এলাইয়া দিল।

নীহার মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। কোন মতে হাঁটুর উপর ভর করিয়া দুই হাতে মমতাকে কোলের উপর লইয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অসমতল ও অপ্রশস্ত সিঁড়ির উপর কোন ভাবেই নিজেকে স্থির করিয়া লইয়া বসিতে পারিল না। একটুকু উপরেই

শেষের দরজাটা। চার পাঁচটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আর একটুকু উপরে যাইতে পারিলে, সেই দরজা দিয়া এক আধটুকু হাওয়া আসিয়া গায়ে লাগিলে এই সময় অত্যন্ত উপকার হইত। নীহার অবশেষে তাহাই স্থির করিল। মমতাকে পাঁজা কোলে করিয়া সে অতি কষ্টে সেই দরজার পথে ছোট বারান্দাটুকুতে আসিয়া পৌঁছিল। নীহার তাকাইয়া দেখিল, বহু নীচে যেখানে সন্তোষবাবু বসিয়াছিলেন, সেইখানে একটা কালো বিন্দুর মত কি দেখা যাইতেছে, এই স্বল্প জ্যোৎস্নালোকে ইহা মানুষ কিংবা অন্য কোন বস্তু, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

নীহার ধীরে ধীরে মমতাকে কোলের উপর লইয়া বসিল। হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া প্রতি মুহূর্তেই মমতার কেশবাস অবিন্যস্ত করিয়া দিতে লাগিল। নীহার মমতার মূর্ছা-নিমীলিত চক্ষু দুইটির দিকে তাকাইয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

সন্তোষবাবু অগত্যা নিজের গায়ের চাদরখানি পাথরের উপর বিছাইয়া খোকাকে তাহার উপর শোয়াইয়া রাখিলেন। তাহাদের ফিরিতে এত বিলম্ব হইবার কোন কারণই তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। রাত্রি প্রায় এগারটা হইতে চলিল। তাজমহলের ভিতর আঙ্গিনার মধ্যে লোকজন বড় একটা আর চোখে পড়ে না। এমন সময় যেন চারি পাঁচ-জন পশ্চিমদেশীয় স্ত্রীলোক ও একজন প্রৌঢ় সেই মিনারের সিঁড়ির দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। সন্তোষবাবু ব্যগ্র হইয়া তাহাদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে দেখিয়াছে কি না। কিন্তু তাহারা বলিল, কোন লোকের সঙ্গেই সিঁড়িতে তাহাদিগের সাক্ষাৎ হয় নাই।

শুনিয়া সন্তোষবাবুর মনে কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু প্রকৃত আশঙ্কাটাই যে কি, তাহাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উন্মাদের মত হইয়া গিয়া ঘুমন্ত খোকাকে বুকে জড়াইয়া লইয়া সেই অন্ধকার সিঁড়ির পথে উপরে উঠিতে লাগিলেন। একবার 'নীহার,

নীহার' বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু সেই ডাক তাহার নিজের কানেই এমন বীভৎস শুনাইল যে, তিনি আর দ্বিতীয় বার ডাকিতেও সাহস পাইলেন না।

সন্তোষবাবু রুদ্ধশ্বাসে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। দরজাগুলির নিকটে আসিয়া এক একবার মুখ বাহির করিয়া তাহাতে সংলগ্ন ক্ষুদ্র বারান্দাগুলিও একবার দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষ দরজাটির কাছে আসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইতেই তিনি বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তিনি নিজের চক্ষুকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কি মনে করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া ফিরিয়া নীচের দিকে নামিয়া যাইতে লাগিলেন।

নীহার আবার ধীরে ধীরে ডাকিল, বৌদি বৌদি! উত্তাল বাতাসে মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার গায়ের কাপড় মাথার চুল কেবলি অবিন্যস্ত করিয়া দিয়া যাইতে লাগিল। নীহার কোন মতে কাপড় দিয়া তাহাকে জড়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন মতেই সেই দুরন্ত বাতাসের বিরুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না।

সন্তোষবাবু নীচে নামিয়া আগের স্থানটিতে আসিয়া বসিলেন। তিনি মনে মনে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন যে, মমতা কিংবা নীহারের সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইয়া যায় নাই। তাহা হইলে মমতা নিশ্চয়ই বলিত, তুমি বুঝি আমাকে সন্দেহ কর? তা' না হ'লে, তুমি চুপি চুপি উপরে উঠে এ'লে কেন? আর যদি সন্দেহই কর, তবে এমন ভাবে আমাকে একজনের সঙ্গে ছেড়েই দিলে কেন?

সন্তোষবাবু বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। একজন চাপরাশি আসিয়া জানাইল, বারোটা বাজিয়াছে, এখন ফটক বন্ধ হইবে। সন্তোষবাবু বলিলেন, একটু দাঁড়াও, আমাদের একজন লোক মিনারে উঠেছে, নেমে এলেই বেরিয়ে যাচ্ছি। বখ্‌শিসের লোভে সে তাহাতেই সম্মত হইল।

মমতা ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া অনুভব করিল, সে কাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে।

নীহার জিজ্ঞাসা করিল, বৌদি, এখন একটু ভাল আছেন? মমতা সহসা সমস্ত অবস্থাটা বুঝিয়া লইল।

মমতা গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলাম? নীহার বলিল, ওঃ অনেকক্ষণ, ঘণ্টা চারেকের কম হবে না। মমতা কথার স্বরে তেমনি গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া বলিল, আমার স্বামীকে নীচে সংবাদ দিয়েছিলেন?

নীহার মমতার গম্ভীর ভাব দেখিয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল। বলিল, কি করে তাকে সংবাদ দেব, তিনি ত নীচে! মমতা বলিল, তা হ'লে চলুন, আর দেরী করা সঙ্গত নয়।

দীর্ঘ সিঁড়ির পথ তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিতে লাগিল। আকাশে চন্দ্র কখন অস্ত গিয়াছে। আসিবার সময় যে দরজা দিয়া এতটুকুন চারকোণা জ্যোৎস্না আসিয়া মাঝে মাঝে সিঁড়িগুলিতে পড়িয়াছিল, এখন আর তাহার চিহ্ন মাত্র নাই।

নীচে নামিয়া আসিয়াই মমতা দেখিল, সন্তোষবাবু সেই জায়গায়ই অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মমতা দ্রুত তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খোকা, খোকা কোথায়? খোকাকে আমার কাছে দাও!

সন্তোষবাবু ঘুমন্ত খোকাকে মমতার কোলে তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, চল, তা' হ'লে এখন ফেরা যাক্, বলিয়া নিজেই আগে আগে চলিলেন। হোটেল পর্যন্ত আসিয়া তাহারা পৌঁছা পযন্ত তিনজনের মধ্যে একটা কথাও হইল না। তাহাদের এই বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে সন্তোষবাবু কিছু জানিতে চাহিলেন না, তাহারাও নিজ হইতে কেহই কিছু বলিল না।

সেই রাত্রেই খাওয়া দাওয়ার পর মমতা স্বামীকে বলিল, মার জন্যে

মনটা বড় ছটফট্ কচ্ছে, চল এখানে আর থেকে কাজ নেই। বাড়ীতে মা'র কাছে গিয়ে তুমিও কিছুদিন থাক্‌বে, মা কত খুসী হবেন! সন্তোষ বাবুও তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

পরদিন নীহার ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল, সন্তোষবাবু নিজেই সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করিয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। নীহারকে বলিলেন, আমাদের হঠাৎ একটু বাড়ী যাবার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে! তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি একটু এদিক সেদিক গিয়ে বেড়িয়ে আস্‌তে পার! আমরা আজই দেশে রওয়ানা হ'য়ে যা'ব। নীহার ইহার উত্তরে আর কিছুই বলিল না।

এক রাত্রির জন্য

রাত্রি আটটায় যখন ট্রেন পাট্‌না জংসন স্টেশনে এসে পৌঁছুল, তখন পকেট থেকে রিটার্ণ টিকিটটা বা'র ক'রে দেখলাম যে, কোলকাতা পৌঁছুবার আগে আরও তিন দিনের ব্রেক্ জর্ণি প্রাপ্য আছে। বিশেষ কোন বিচার না ক'রে কুলি ডেকে নেমে পড়লাম; বল্লাম, ভাল একটা হোটেলে নিয়ে চল।

হোটেল নিকটেই ছিল। বাঙ্গালীর হোটেল হলেও ইংরেজী রুচিতে তা' গাড়ী-বারান্দায়, সিজন ফুলের বিস্তৃত বাগানে সুসজ্জিত। দেখে ইচ্ছে করে দু' একদিন থাক্‌তে! চাপরাশী ম্যানেজারের রুম দেখিয়ে দিলে। ম্যানেজার অত্যন্ত বিনীত হ'য়ে বল্লেন যে, একা থাক্‌বার জন্যে একখানি পূরো রুম তা'র আজকের রাত্রির জন্য নেই; কাল ভোরেই একজন লোক চলে যাবার কথা আছে, তারপর দু'জন থাকবার আন্দাজ একখানি রুমই আমি একা দখল ক'রে বস্‌তে পারব! তবে এক রাত্রির জন্য যা' একটু অসুবিধে!

আমি অসঙ্কোচে জানালাম, সে জন্যে আমার কোন অসুবিধেই হ'বে না; দু'জনেই এক ঘরে গল্পে সল্পে বেশ থাকা যা'বে ইত্যাদি।

ম্যানেজার একটা রুমের নম্বর ব'লে দিয়ে বয়কে আমার জিনিস পত্রগুলো গুছিয়ে তা'তে নিয়ে তুলতে ব'ল্ল। আমিও হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি আমার বিছানাটি এ'র আগেই বয় সযত্নে পেতে রেখে কখন চলে গেছে! রুমের দক্ষিণ দিককার জানালার পাশে আর একটা তক্তপোশ—তাতে একটা বিছানা পাতা রয়েছে! বুঝলাম, এই বিছানার অধিকারীই আমার আজ রাত্রের জন্যে রুম্‌মেট্ হ'বেন! তা'র বিস্তৃত

পরিচয় জানবার কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ না ক'রে আমি আমার বিছানার কোলে ঢ'লে পড়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়্লাম!

রাত্রের খাবারের সময় আমার অতীত হ'য়ে যাচ্ছিল ব'লে কিছুতেই চোখে ঘুম আসছিল না। দক্ষিণ দিককার জানালার নীচেই একটা গোলাপ গাছ; অন্ধকারের মধ্যে তা' বাতাসে দুল্‌ছে; রাস্তার আলো-কে ছায়া ক'রে সে'টি পড়েছে রুমের ভেতরকার দেওয়ালের গায়ে! হোটেলের সেই নীরব নিঃঝুম কুঠুরির মধ্যে একাকী যখন অকারণে বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে আবোল তাবোল ভাবছি, তখন চঞ্চল ছায়াগুলোকে দেখে হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌তে হয়! পাশের তক্তপোশের উপর পাতা বিছানাটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অমার এই অ-দেখা অপরিচিত বন্ধুটির কথা ভাবতে লাগলাম্! লোকটি কে? বয়স কত? কোত্থেকে এসেছে? এক সঙ্গে এক রাত্রি কাটা'ব, হঠাৎ যদি মাঝ রাতে উঠে আমাকে সর্বস্বান্ত ক'রে নিয়ে উধাও হয়? তা'ব বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দাড়ি চাঁচবার কিছু সরঞ্জাম ও একটি পেতলের সরু মতন কি জিনিস প'ড়ে আছে! দেখে শুনে লোকটাকে নিতান্ত সাধারণ ব'লে মনে ক'রে মনে মনে একটু হাস্‌লাম।

এমন সময় বয় এসে খাবার জন্যে ডাক্‌ল। আমি এ' অকারণ দুর্ভাবনা বন্ধ রেখে ছুটে খাবার টেবিলে গিয়ে হাজির হ'লাম।

সে'খানে আরও দু'চার জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। আমি অনুমান ক'রলাম যে, এরই মধ্যে একজন আজ রাত্রে আমার রুমের আংশিক অধিকারী হ'বেন। কিন্তু এ' তিন চারজন লোকের সঙ্গে কাউকেই সেই গোল আয়না, আর ভাঙ্গা চিরুণীর সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে দেখ্‌তে পেলাম না।

বিনা বাক্য-ব্যয়ে রাত্রির আহার সে'রে ফিরে এ'লাম আমার নির্দিষ্ট কুঠুরীতে। মশারিটা টেনে চারিদিক ভাল ক'রে গুঁজে দিয়ে নিত্যকার অভ্যাস মতন একটা সিগার ধরিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে তা' টান্‌তে সুরু ক'রে

দিলাম ! পাত্‌লা মশারির ফাঁক দিয়ে এক একবার আমার অপরিচিত সহচরের বিছানার দিকে তাকাচ্ছিলাম ; হোটেলে খাওয়া দাওয়া ত এক প্রকার শেষ হ'য়ে এ'ল, অথচ লোকটা কেন এতক্ষণেও ঘরে ফিরল না ? হয়ত আমার চোখে যখন ঘুম ধ'রে আস্‌বে তখন লোকটা তাড়াতাড়ি ক'রে ঘরে ঢুকেই চট্‌ ক'রে বিজ্‌লী বাতির সুইচটা টিপে দিবে ; আর চকিতে এক ঝলক তীব্র আলোক এ'সে চোখ্‌ ঝল্‌সে দিয়ে আমার সারা রাত্রির ঘুম মাটি ক'রে দিবে ! হয়ত আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লে লোকটা ধুপ্‌ ধাপ্‌ শব্দ ক'রে বিছানার ধূলো ঝাড়্‌বে, আর সেই শব্দে যে আমার ঘুম ভেঙ্গে যা'বে, তা' সারারাত্রির মধ্যে আর আস্‌বে না। লোকটা এখন এ'সে গিয়ে দোর জানালা বন্ধ ক'রে সুইচ নিভিয়ে বিছানায় শু'য়ে পড়্‌লেই বাঁচতাম ! চেহারা ছবি দেখে সমান বয়সী ও সমান রুচির লোক ব'লে মনে হ'লে, না হয় দু'একটা কথাও বল্‌তাম ; আর তা' না হ'লে জেগে থেকেও ঘুমোবার ভাণ ক'রে চোখ বু'জে প'ড়ে থাক্‌তাম !··· কিন্তু লোকটা এল না, বরং আমারই ঘুম এল !···

গভীর রাত্রে দরজার কাছে যেন কিসের শব্দ হ'ল ; মনে হ'ল, কেউ যেন দরজা বন্ধ ক'রে ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিল। তারপর নিতান্ত পরিচিত সুরে আমার মশারির কাছে এ'সে জিজ্ঞেস কল্লে, আজ কোত্থেকে এলে ? বেনারস থেকে বুঝি ?

ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ল। যাকে আমি কখনও চিনিনে, যার সঙ্গে কস্মিন্‌কালেও কোন পরিচয় থাক্‌বার কোন সম্ভাবনাও দেখিনে, এত দূরদেশে এসে আমার গতিবিধি পর্যন্ত সে লক্ষ্য রেখেছে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, আজ্ঞে, হাঁ ! কিন্তু আপনাকে ত আমি চিন্‌তে পারলাম না !

আগন্তুক সহাস্যে বললে, তা তুমি আমায় কি করে আর চিন্‌বে ! কোন দিন ত দিনের আলোকে চোখের সাম্‌নে দেখনি !

আমি সভয়ে বললাম, তা হলে আপনি আমাকে কি করে চিন্‌লেন ?

আগন্তুক ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে যেন বস্‌লেন, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, সংসারের কেউ কি আমার অচেনা আছে? কিন্তু আমাকে কেউ চিন্‌বে না।

ঘরের ভিতরে থম্‌থমে অন্ধকার ; দক্ষিণ দিককার যে জানালাটা দিয়ে সন্ধ্যে বেলা একটা ফুল-বোঝাই গোলাপের শাখা দেখে যাচ্ছিল, তাও আর দেখা যায় না। জানালাটি বুঝি বাতাসে বন্ধ হয়ে গেছে!

আমি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌বার আগেই আগন্তুক বললে, আমার পরিচয় যদি জান্‌তে চাও, তা হলে শোন! বলে, আরম্ভ কল্লে।—

তোমার মতন বাংলা দেশের নরম মাটির কোলে আমারও বাস ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চাইতে উঁচু পরীক্ষায় নিতান্ত গৌরবের সঙ্গে পাশ করে যখন বাড়ী ফিরে এলাম, তখন চারিদিককার দেশগাঁয়ের কন্যাদায়গ্রস্ত মাতাপিতার দল একটা মস্তবড় সাড়া অনুভব করলে। পড়ার খরচ জুগিয়ে পিতা হয়ে পড়েছিলেন ঋণগ্রস্ত ; সেজন্য তিনি সেই সুযোগ অবলম্বন করে যে পরিমাণ দর হাঁকলেন, তা শুনে পিছিয়ে গেল একরকম সবাই, কিন্তু বাকি থাক্‌ল মাত্র একজন। সে আমাদের পাশের গাঁয়ের পরাণ চাটুয্যে। তাঁর মেয়েকেও আমি শৈশব থেকেই জান্‌তাম। হ্যাঁ, তাকে আমি ভালবাস্‌তাম, সেও আমাকে তেম্‌নি ভালবাস্‌ত। আমরা মনে করতাম, আমাদের যদি মিলন হয়, তা হলে সংসারের আর কোন সুখের আমরা প্রত্যাশা করিনে।

লোকটার কথা শুনে ভয় অনেক পরিমাণে আমার কমে আস্‌ছিল। তাই একটু সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্‌ জিলায় আপনার বাড়ী জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

আগন্তুক একটু থেমে বললে, কেন, বাংলাদেশের যে কোন জিলার পক্ষেই কি আমার কাহিনীর এ পূর্ব-ভাগ প্রযোজ্য নয়?

আমি নিতান্ত বিজ্ঞের মত বললাম, তা ত নিশ্চয়ই, সর্বত্রই এক অবস্থা!

আগন্তুক বল্লেন,—তা হলে, তবে শোন। বলে আরম্ভ করলেন, —পরাণ চাটুয্যে একজন সঙ্গতি-সম্পন্ন ভদ্রলোক; বনিয়াদি জমিদার বংশ; পুরুষানুক্রমিক ধনৈশ্বর্য সম্বন্ধে জনশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করেই চল্‌ছিলেন! কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের বনিবনাও ছিল না। পরাণ চাটুয্যে যখন আমার পিতার দাবী সম্পূর্ণ সমর্থন করে বিয়ের জন্যে অতি মাত্রায় আগ্রহ দেখাতে লাগলেন, তখন পিতা মনে কল্লেন, তিনি ঠকেছেন—তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হ'ল, তাঁর কাছ থেকে আরও দাবী করলে আরও লাভ হত! অতএব অন্যত্র এ পরিমাণ টাকা না পাওয়া গেলেও এ বিয়ে কিছুতেই ঘট্‌তে দিয়ে আমাদের পাল্টা ঘরের ঐশ্বর্যকে স্বীকার করে নেওয়া কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হবে না! আমার পিতা দেখাতে চান, অন্ততঃ তা'দেরকে যে, আমার পুত্র, এই সদ্য পাশকরা পুত্র, কারুরই ঐশ্বর্যের আয়ত্তাধীন নয়! না থাক আমার ধনরত্নের ঐশ্বর্য, কিন্তু এই নশ্বর ধনরত্নের বিনিময়ে যে পুত্র আমি তৈরি করেছি, তার মূল্য কারুরই সর্বস্ব ঐশ্বর্যও নিরূপণ করতে পারবে না! অন্ততঃ এ বিয়ের বেলায় নানাকথায় ভাঁড়িয়ে পিতা এবার দ্বিগুণ দর হাঁকলেন! আমি অদূর ভবিষ্যতে আমার বিয়ের কোন লক্ষণ না দেখে কিছু টাকাকড়ি সংগ্রহ করে বেড়িয়ে পড়্‌লাম দেশ ভ্রমণে। বাবাকে বলে এলাম, পুঁথিতে এ্যদ্দিন যা পড়েছি, তা চোখে না দেখ্‌লে প্রকৃত বিদ্যা ইত্যাদি;—আমি ইতিহাসে এম-এ পাশ করেছিলাম! বাবা বললেন, বেশ, যাও। কিন্তু মাসেকের মধ্যে ফিরে এসো!···

এক মাসের জায়গায় এক বছর ঘুরে এল, বাড়ী ফিরবার কোন তাগিদ অনুভব করছিনে! এর মধ্যে এক বীমা-কোম্পানীতে চাক্‌রী নিয়ে উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্র ঘুরে মরছি! সেবার যখন পাটনায় তখন বাড়ী থেকে বাবার এক খুব জরুরী চিঠি এল। বুঝলাম, দর কষাকষিতে হয়রাণ হয়ে তখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন! কোম্পানীতে ছুটির জন্যে দরখাস্ত করলাম; আবেদন

অগ্রাহ্য হল। ইচ্ছে হল, এই ছুতো ধরে চাকরী ছেড়ে দিই ; বাবা লিখে পাঠালেন, চাকুরী ছাড়্‌লে বিপদ আছে, এই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। বুঝলাম, চাকরী ছাড়লে দরে আরও ঘাট্‌তি হবার সম্ভাবনা! বাবার মনে কষ্ট হবে ভেবে মিথ্যে করে লিখলাম, বিয়ে আমি এখন করব না ; কোম্পানী থেকে আমাকে বিলেত পাঠাবে, সেখান থেকে এলে বিশেষ উন্নতি নিশ্চয়। বাবা আর কিছু লিখ্‌লেন না ; এমন কি, কবে পর্যন্ত বিলেত রওয়ানা হব, তাও জানবার কোন আগ্রহ দেখালেন না!

সেবার শীতকাল! তখনও পাটনায়ই আছি ; এই হোটেলের ঠিক এই কুঠুরিতে, মনে হচ্ছে তোমারই সিট্‌টা দখল করে ছিলাম! বেশী রাত্রি করে একটা রেস্তারাঁ থেকে ফিরে এসে দেখি, হোটেলে আমার রুমে কে একজন নূতন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এসেছেন ; সঙ্গে শুধু তার স্ত্রী। ম্যানেজার আমায় ডেকে বললেন, আজ রাত্রির জন্য দয়া করে আমার প্রাইভেট্ রুমটায় থাকুন! আপনার রুমটা একটা ফেমিলিকে ছেড়ে দিইচি!

আমি বললাম, কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমার জিনিস পত্তরগুলো?

ম্যানেজার বললেন, সেজন্যে আপনার ভাবতে হবে না, নিতান্ত দরকারী যা আছে, তা বরং এখুনি নিয়ে রাখুন ; ওঁরা এখনো ঘুমোন নি!

বয়কে পাঠিয়ে আমি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই এক অল্প বয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে অত্যন্ত বিনীত স্বরে বললেন, মিছিমিছি আপনাকে আজ বড় কষ্ট দিলাম! ডবল সিটেট্ আর কোন রুম খালি নেই বলে বড় দুর্ভাবনায়ই পড়েছিলাম ; তবু আপনি বাঙ্গালী বলেই এ অত্যাচারটা করবার সাহস পেলাম! আমি সহাস্যে বললাম —না, সেজন্যে কি? আমি একা মানুষ, কোন অসুবিধে আমার হবে না!

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাড়ী কোন জিলায়? আমি জিলা ও গ্রামের নাম বললাম।

ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে বল্লে উঠ্‌লেন, সে কি? ঠিক পাশের গ্রামেই যে আমি বিয়ে করেছি!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার বাড়ী?

তিনি বললেন, শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ই যে আমার শ্বশুর; আমি বেনারস চাকরী করি, স্ত্রীর নিতান্ত ইচ্ছায় এখানে একদিন ব্রেক জর্ণি করতে হল।

আমি যেন অনুভব করছিলাম, ঘরের ভিতরে কার চঞ্চল পদশব্দ! যেন দরজার পরদা একটু ফাঁক হয়েই আবার বুজে গেল, আবার ফাঁক হল, আবার বুজে গেল! এক জোড়া কালো চোখ পরদা চিরে যেন বেরিয়ে আস্‌তে চাইল, কিন্তু সামনের কোন অদৃশ্য ভ্রূকুটির শাসন মেনে স্থির হয়ে গেল!

…আমি রাত্রে সেদিন আর কিছু আহার করলাম না; বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌লাম! কিছুদিন ধরেই মদ্য পান অভ্যেস করেছিলাম। সে দিন প্রচুর মদ খেলাম; কেউ আমাকে বারণ করবার ছিল না! মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌লুম। বড় পিপাসা! মদের পিপাসা; অন্ধকারে অচেনা ঘরে হাতড়াতে হাতড়াতে একটা বোতল হাতে ঠেক্‌ল! নির্বিচারে গলায় ঢেলে দিলাম। চোখ আবার বুজে এল। সে আঁধার আর ঘুচল না!

পূবদিককার জানালাটা খোলা পেয়ে ঘরে রোদ এসে ঢুকেছিল; ম্যানেজার এসে বললেন, নিন, সিঙ্গেল-সিটেট রুমই আপনার হল! চেয়ে দেখি পাশের তক্তপোশের উপর কাল রাতের বিছানাটা আর নেই!

পলাতকা

মনীরেব সঙ্গে সাকিনার বিবাহের দিন তারিখ পর্যন্ত স্থির হইয়া গেল, এমন সময় রেঙ্গুনের কোন জায়গা হইতে এক পত্র আসিল যে, আবদুল দেশে ফিরিতেছে। পত্র পাইয়া আসন্ন বিবাহের সম্বন্ধে সকলের কৌতূহল দূর হইল এবং তৎপরিবর্তে আবদুলের সম্বন্ধে সকলের অপরিসীম আগ্রহের সৃষ্টি হইল; সকলে অধীর হইয়া তাহার দেশে ফিরিবার দিন গুণিতে লাগিল।

আবদুল ও মনীর দুই ভাই। আবদুলের বয়স যখন চৌদ্দ কি পনের হইবে, তখন মনীরকে ছয় সাত বৎসরের রাখিয়া তাহার মাতা মারা যায়। পিতারও পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাদিগকে একান্ত নিরাশ্রয় দেখিয়া তাহাদের চাচা তাহাদিগকে নিজের আশ্রয়ে গ্রহণ করে; এই চাচার আশ্রয়ে থাকিবার সময়ই আবদুল একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া যায়। তারপর আর বহুকাল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সকলেরই স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল, সে আর বাঁচিয়া নাই; সেইজন্য সহসা প্রায় কুড়ি বৎসর পর তাহার এই পত্র পাইয়া গ্রামের লোকের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল।

মনীর ভাবিল, ভালই হইল, এতদিনে হয়ত খোদা তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, সে সাকিনাকে বিবাহ করিবে, তাহার ভাই সাহেবও নিরুদ্দেশের রাজ্য হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিবেন। সে মনে মনে ইহাই কল্পনা করিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিল যে, তাহাদের বিবাহের দিনে তাহার এই দীর্ঘকালনিরুদ্দিষ্ট ভাই সাহেবের ফিরিয়া আসা যেন কাহার অদৃশ্য আশীর্বাদ। ভাবিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

আবত্নলের চাচার নাম মনস্থর। মনস্থর অত্যন্ত নীচ স্বার্থপর লোক। সে ভ্রাতুষ্পুত্র ত্নইটিকে যে নিতান্ত স্নেহপরবশ হইয়া আশ্রয় দান করিয়াছিল, তাহা নহে; প্রকৃত কথা এই যে, তাহার ভ্রাতার সামান্য কিছু জমি জায়গা ছিল, তাহার সন্তান ত্নইটিকে আশ্রয়দানের উপলক্ষে ভ্রাতার ঐ জমি জায়গা হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই সে তাহাদিগকে নিজের গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অল্পদিনের মধ্যেই আবত্নলকে সে অন্য একজনের রাখালের কাজে নিযুক্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজে নগদ কিছু লাভও করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং মনীরকেও নিজের ক্ষেতের কাজে সর্বদা খাটাইয়া তাহার নিকট হইতেও একটা চাকরের কাজ আদায় করিয়া লইতে লাগিল। পিতৃব্যের স্নেহহীনতাই যে আবত্নলের গৃহত্যাগের একমাত্র কারণ, এই বিষয়ে কাহারও কোনও সংশয় ছিল না। মনীর বয়সেও অল্প এবং অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিল বলিয়া সে মনস্থরের ব্যবহারে কোন দিনই অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই।

মনস্থরের একমাত্র কন্যার নাম সাকিনা। তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। মনীরের সঙ্গেই সাকিনাকে বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়া মনস্থর তাহার সমস্ত আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, এমন সময়ই রেঙ্গুন হইতে আবত্নলের পত্র আসিল।

মনীরের বিবাহের নির্ধারিত দিনের পূর্বেই আবত্নল দেশে আসিয়া পৌঁছিল। আবত্নলের বেশভূষা, পোষাক পরিচ্ছদ ও জিনিস পত্রের আড়ম্বর দেখিয়া গ্রামের লোক যতই বিস্মিত হইল, মনস্থর মনে মনে ততই প্রফুল্ল হইল। মনীর তাহার বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট ভাই সাহেবের পায়ের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল; আবত্নল এই শৈশব হইতেই মাতৃপিতৃহীন বহুকালবিস্মৃত তাহার ছোট ভাইটির মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে স্নেহালিঙ্গনে নিজের কাছে টানিয়া লইল। এই ভাবে অনেক অশ্রুপাত স্থখত্নঃখের কাহিনী বিনিময়ের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রথম সন্দর্শন সম্পূর্ণ হইল।

মনস্থর কি এক কারণ দেখাইয়া সাকিনার বিবাহের দিন অনির্দিষ্ট কালের জন্য আরও পিছাইয়া দিল। কিছু দিনের মধ্যে গ্রামে এমন কানা ঘুষা শোনা যাইতে লাগিল যে, মনীরের সঙ্গে সাকিনার বিবাহ দিবার ইচ্ছা মনস্থর ত্যাগ করিয়াছে। কথাটা মনীরের কাণেও গেল ; কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনীরের এই স্বভাব—সে তাহার নিজের সম্বন্ধে কোন অশুভ আশঙ্কা কখনও করিতে পারে না। তাহার বিশ্বাস, সংসারে যে যাহা করিতেছে, সকলেই তাহার ভালর জন্যই করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন দিন অমঙ্গল কল্পনাও করিতে পারে, এমন ধারণাই তাহার হয় না।

মনীর একদিন বসিয়া বসিয়া এমনি ভাবিতে লাগিল ;—সাকিনার যদি তাহার সহিত বিবাহ না হয়, তবে কাহার সঙ্গে হইবে? সাকিনাই কি তাহাতে রাজি হইবে? আর সাকিনা যদি রাজি না হয়, তবুও কি তাহার চাচা সাকিনাকে অন্য কোথাও বিবাহ দিতে পারিবে? সে বুঝিতে পারে না, সাকিনার জন্য তাহার এই দুর্ভাবনা কেন? কিন্তু মনীর নিজের অবস্থার কথা কোন দিন ভাবিয়া দেখে না। সে কি চিন্তা করিয়া দেখিতে পারে না যে, সে শৈশব হইতে অনাথ, তাহার চাচার অনুগ্রহে সে জীবন ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছে? নহিলে যে মুহূর্তে শৈশবে সে মাতৃহীন হইয়াছিল ও ভাই সাহেব গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই মুহূর্তেই সে পথে পথে ভিক্ষা করিতে বাহির হইত, কোন দিন হয় ত নিরাশ্রয়ে অনাহারে পড়িয়া পথের মধ্যেই মরিয়া থাকিত। কিন্তু মনীর তাহা কোন দিন ভাবিবে না, সাকিনার উপর তাহার যেন এক জোরাল দাবী জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোথা হইতে কিসের অধিকারে যে তাহার এই দাবী জন্মিল, তাহা সেও কোন দিন বলিতে পারিবে না।

আবদুল সঙ্গে করিয়া একটা কলের গান আনিয়াছিল। দিবারাত্র ইহাকে ঘিরিয়া পাড়ার ছেলেমেয়েদের যত ভিড়! আবদুল সকল

সময় বাড়ী থাকে না, সে গ্রামের দশজনের সঙ্গে দেখা শোনা করিতে বাহির হইয়া যায়। দল বাঁধিয়া ছেলেমেয়েরা গান শুনিবার জন্য তাহাকে সকলে ঘিরিয়া ধরে। আবদুল একদিন বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি অত ব'সে ব'সে তোমাদের গান শোনাতে পারব না, বাপু। তারপর সাকিনাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, তুই ত সারাদিন বাড়ীতে ব'সে আছিস, আয় না ইদিকে, তোকে কলটা শিখিয়ে দি', এ'র আবার একটা হাঙ্গামা কি, তুই একটু শিখে নিয়ে সারাদিন ব'সে ব'সে ওদের গান শোনা, তারপর হয়রান হয়ে কেউ আর এ'দিক মাড়াবে না, দেখবি।

মনসুর নিকটেই একটা মোড়ার উপর বসিয়া তামাক টানিতেছিল। সে মুখ হইতে হুঁকাটা নামাইয়া লইয়া বলিল, যা না। আবদুলের কাছে আবার তোর সরম কি? নে না, কলটা শিখেই নে না, আবদুল আমার নিজের ছেলের মত, তুইও যা, আমার আবদুলও তা। বলিয়া পুনরায় হুঁকা টানিতে লাগিল।

সাকিনা ঘরের একটা থাম ধরিয়া দাড়াইযাছিল। সে পিতার কথা শুনিয়া সমগ্র দেহখানি লজ্জায় থামের অন্তরালবর্তী করিযা লইল। আবদুল কলের গানটা খুলিতে খুলিতে আবার ডাকিল, আয় ত সাকি, দেখ্ এ'সে এই ভাবে এই জায়গাটা ধ'রে তুলতে হয়, আয় না, দেখ না এ'সে? মনসুর এইবার এক প্রকার ধম্কাইয়াই বলিয়া উঠিল, যা না, কাছেই যা না! সাকিনা হাতের আঙ্গুলে কাপড়ের আচলটা জড়াইতে জড়াইতে আবদুলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

আবদুল বলিল, ধর দিকিন এইটে, বলিয়া সাউণ্ড বক্সটা তাহার হাতে দিতে গেল।

সাকিনা তাড়াতাড়ি হাতের আঙ্গুল হইতে জড়ানো কাপড়ের আঁচলখানি মুক্ত করিয়া লইয়া কোন মতে সাউণ্ড বক্সটা হাত পাতিয়া নিজের হাতে লইল।

আবদুল বার বার করিয়া ইহার সমস্ত কলকব্জাগুলি ব্যাখ্যা করিয়া সাকিনাকে বুঝাইতে লাগিল। সাকিনা শাড়ীর আঁচলের একটা কোণ দাঁত দিয়া চিবাইতে চিবাইতে তাহা নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

দুই একটা গান আবদুল নিজেই বাজাইল। তারপর বলিল, এ'বার এ' গানটা শেষ হ'লে তোকে কিন্তু রেকর্ড বদ্‌লে দিতে হ'বে!

সাকিনার সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। আবদুলের কথার উত্তরে সে মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিলেও মনে মনে গানটা শেষ হইতেই সাউণ্ড বক্সটা তুলিবার জন্য সে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

গান শেষ হইতেই সাকিনা যেমনি সাউণ্ড বক্সটা তুলিতে যাইবে, অমনি তাহার হাত হইতে পুনরায় ঘূর্ণায়মান রেকর্ডের উপরেই পড়িয়া গিয়া তাহা এক জায়গা হইতে বাজিতে আরম্ভ করিল। আবদুল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, যাঃ, গেল বুঝি রেকর্ডটা ফুটো হয়ে। খুব আস্তে আস্তে তুলতে হয়। বলিযা নিজে সে সাকিনার হাত ধরিয়া কি প্রণালীতে যে সাউণ্ড বক্সটাতে হাত দিতে হয, তাহা দেখাইয়া দিল।

এক দিন আবদুল বাড়ীতে ছিল না। সাকিনা আসিয়া মনীরকে বলিল, দেখেছ, আমি কলের গান বাজাতে শিখে গেছি, চল তোমাকে বাজিয়ে দেখা'ব।

মনীরের কিছুদিন ধরিয়াই মনটা ভাল ছিল না। ইহার যে কি কারণ, মনীর তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না; কিন্তু ইহা তাহার বঝিতে বাকি নাই যে, তাহার মনের অবস্থা আর পূর্ব্বের মত নাই। শৈশব হইতেই সে নিকটতম আত্মীয় স্বজনের স্নেহ হইতে বঞ্চিত, তাহার ভাই সাহেব দেশে আসিবে শুনিয়া যদিও সে একবার জীবনের সেই অনাস্বাদিত সম্পদ্ লাভ করিতে পারিবে

ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাকে একান্ত নিকটে পাইয়া যেন তাহা তাহার নিতান্তই ভ্রান্তি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। গ্রামের আর দশজন লোক যেমন, মনীর আবদুলকে কিছুতেই তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারিল না। আবদুল যে তাহার ভাইর সঙ্গে তেমন বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠতা করিতেছে, তাহা নহে; কিন্তু ক্রমে এই ব্যবধান এতই বাড়িয়া যাইতে লাগিল যে, এখন এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মনীর আবদুলের সান্নিধ্য বাঁচাইয়া চলিতে চাহে। আবদুলের সম্পর্কে কোন কথাও তাহার কাছে আর প্রীতিপ্রদ বলিয়া মনে হয় না।

সাকিনার কথায় মনীর আরও গম্ভীর হইয়া গিয়া বলিল, জান ত! আমার কোন দিনই গান বাজনা ভাল লাগে না।

সাকিনা মনীরের কাছ হইতে এমন উত্তর পাইবে, তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সাকিনা এতদিন জানে যে, সে যাহা করে, মনীরের কাছে তাহাই ভাল; সে যাহা জানে, মনীরের কাছে তাহাই সত্য। আজ এত বড় একটা বিদেশীয় কলকব্জা সে নিজে চালাইতে শিখিয়াছে, ইচ্ছা মত গান বাজাইতেছে, বন্ধ করিতেছে, গ্রামের কত লোকে সাকিনার বুদ্ধি চাতুর্যের প্রশংসা করিয়া যাইতেছে, একমাত্র মনীরই এই সমস্ত ব্যাপারে চক্ষু বুজিয়া থাকিবে, ইহা কোন মতেই সাকিনা সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, ইহার মধ্যে মনীরের কাহারও প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাবের বীজ নিহিত আছে।

সাকিনা বলিল, জানি, তোমার গান বাজনা ভাল লাগে না; কিন্তু আমি সে গান বাজাব, তোমার শুন্‌তেই হবে! চল।

অগত্যা মনীরকে উঠিতে হইল। কিন্তু সাকিনার অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যে নহে, তাহা সেও স্পষ্ট বুঝিতে পারিল।

কিছুক্ষণ গান চলিতেই মনসুর কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনীরকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, নে নে, সাকি, ও সব

বন্ধ করে রাখ্ ; কলকব্জার জিনিষ কখন কি হয়। বলিতে বলিতে নিজেও আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মনীর নিরুত্তরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। সাকিনাও অগত্যা গান বন্ধ করিয়া রাখিল।

মনীর একদিন হাট হইতে ফিরিতেছিল, একজন কৌতূহলী গ্রামবাসী জিজ্ঞাসা করিল, কি রে, আবদুলের নাকি সাদি ?

মনীর ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না, সেইজন্য ইহার স্থির কোন জবাব দিতে পারিল না। বলিল, কি জানি কিছু ত শুনিনি !

জলিল বলিল, নে ঢঙ্ রাখ্, সারা গাঁয়ের লোকে যা জানে, তুই বাড়ীর লোক হয়ে তা জানিস্ নে, না ?

বাস্তবিকই ইহা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না ; কিন্তু প্রকৃত কথা মনীর ইহার কিছুই জানে না। তবে আবদুল যে দেশে সাদি করিবার জন্যই আসিয়াছে, ইহা পূর্বেও শুনিয়াছে।

জলিল জিজ্ঞাসা করিল, আবদুল রেঙ্গুনে খুব বড় চাকুরী করে, না রে ? মনীর ইহা শুনিয়াছে। বলিল, হ্যাঁ !

জলিল বলিল, তুই যা না তার সঙ্গে এবার চলে রেঙ্গুনে, একটা কাজটাজ যদি তার চেষ্টায় জুটিয়ে নিতে পারিস্। ওরই বা কি বিদ্যে ! মনীর কোন উত্তর দিল না, নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল !

কিছুদূর আসিতেই জলিল অন্য এক পথে নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। একাকী পথ চলিতে চলিতে মনীর ভাবিতে লাগিল, আবদুলের বিবাহ, কাহার সঙ্গে, কবে, কোথায়, এই সমস্ত সংবাদ তাহার জানিয়াই বা কি প্রয়োজন ? আবদুল নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জন করিয়াছে, তাহার ভাইকে ত আর তাহার ভাগ দিতে যাইবে না, সে বিবাহ করিয়া হয় ত আবার রেঙ্গুন চলিয়া যাইবে, তাহার চাচার গৃহে তাহার যেমন পূর্বেকার জীবন ছিল, তেমনি আবার দিনগুলি তাহার জীবনে ফিরিয়া আসিবে।

দূর হইতেই শোনা যাইতে লাগিল, ঘরে কলের গান বাজিতেছে।

সাকিনা সমস্তটা দিন এই যন্ত্রটা লইয়া মত্ত হইয়া আছে, মনীর কখনও সামনে গিয়া পড়িলে তাহাকেও হয়ত দুই দণ্ড টানিয়া না বসাইয়া ছাড়িবে না ; কিন্তু মনীরের সত্য সত্যই এই সব ভাল লাগে না। সে বাড়ীর সীমানা হইতে দূরে দূরে থাকিতে পারিলেই স্বস্তি পায় ; সেইজন্য নিজেকে এই সংসর্গ হইতে সর্বদা বাঁচাইয়া চলে।

বিবাহের জিনিস পত্র কিনিবার জন্য আবদুল কিছুদিনের জন্য একবার নিকটবর্তী এক শহরে গেল, বলিয়া গেল, ফিরিতে দুই তিন দিন বিলম্ব হইবে।

মনীর এতদিন প্রায় বাড়ীর বাহিরেই কাটাইয়াছে। আবদুল কি উদ্দেশ্যেই যে কবে কোথায় গিয়াছে, তাহারও সন্ধান সে রাখে না। তবে একদিন বাড়ীতে আসিয়া শুনিল, আবদুল বাড়ীতে নাই, সে কোথাও গিয়াছে, ফিরিতে দেরি হইবে।

শুনিয়া মনীর যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে যেন একখানি শাসনের ভ্রূকুটি কিছুদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না, আবদুলের প্রতি তাহার মনের ভাব কি ভাবে এমন হইয়া দাঁড়াইল। অথচ আবদুল ত গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়া অবধি তাহার সঙ্গে কোন প্রকার খারাপ ব্যবহার করে নাই, বরং অনেক সময় কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আবদুল তাহার এক মায়ের পেটের ভাই, ইহা কল্পনা করিয়াও মনীর তাহার প্রতি এই মনোভাব পোষণ করিবার জন্য নিজের কাছে নিজেই অপরাধী হইয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি এই অস্বস্তির ভাবটা মন হইতে কোন উপায়েই যেন দূর করিতে পারে না।

সাকিনা আসিয়া একবার দুই হাতের মুঠিতে কি একটা জিনিস লইয়া মনীরের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল, দেখ্‌বে একটা জিনিস ?

মনীর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া কহিল, কি জিনিস, দেখি ! সাকিনা

দুই হাতের মুঠি খুলিয়া একটা টর্চ্চ বাতি বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলত, এটা কি ?

মনীরের সমস্ত ঔৎসুক্য দূর হইল। জিনিসটা যে কি, তাহা সে বলিতে পারে না, এমন জিনিস সে কখনও দেখে নাই, তবে জিনিসটি যে কাহার, তাহা বুঝিতে আর তাহার বাকি রহিল না। মনীর অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, কি জানি কি জিনিস! সাকিনা বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিতেই মনীরের চোখ ধাঁধিয়া গেল। দেখিয়া সাকিনা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই তৎক্ষণাৎ আলো নিভাইয়া দিল।

এমন সময় মনসুর কোথা হইতে আসিল, সাকিনার হাতে টর্চটা দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, আবদুলের এই সব জিনিস সাম্‌নে রাখিস্ কিন্তু, ও'র কি সব কত জিনিস, কোনটা কখন নষ্ট হ'য়ে গিয়ে কত টাকার দায়ে আবার গিয়ে পড়্‌বে, কে জানে ?

মনসুর বাহিরে চলিয়া গেল। সাকিনা মনীরের কাছে আসিয়া বসিল। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একটা গান বাজাই, শুন্‌বে ?

মনীর একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই কহিল, না, গান-বাজনা আমি শুনি না, তোমার ভাল লাগে সারা রাত্রি জেগে গান শোন, আমি উঠে যাই।

সাকিনার বয়স অল্প হইলেও সেই বয়সেই মেয়েরা ভগবৎদত্ত অনেক খানি সাধারণ বুদ্ধির অধিকারিণী হইয়া থাকে, সাকিনাও হইয়াছিল। সে কয় দিন ধরিয়া মনীরের মানসিক অবস্থার একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু ইহার কারণ যে কি, তাহা তাহার সরল অন্তঃকরণে সে উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহার ধারণা হইল, হয়ত তাহাদের বিবাহের তারিখটা সহসা পিছাইয়া গেল বলিয়াই তাহার এমন ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আবদুল দেশে আসিবার আগে একদিন মনীর বলিয়াছিল যে, তাহাদের বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা দূরে কোথাও চাকুরি

করিতে চলিয়া যাইবে, এখানে আর থাকিবে না। সাকিনা বুঝিতে পারে যে, তাহার পিতা মনীরকে স্নেহ করে না। তবে অন্যত্র হাতের টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে বলিয়া মনীরের সঙ্গেই তাহার বিবাহ দিতে স্থির করিয়াছে। সাকিনা মাতৃহীনা, এই অবস্থায় পিতা তাহাকে যতখানি স্নেহ করা প্রয়োজন, ততখানি সে মনসুরের নিকট হইতে কোনদিনই পায় না,—তাহার পিতা যেন কেমন স্বভাবের লোক, সমস্ত জীবন ভরিয়া কেবল স্বার্থেরই সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইল, অথচ কোন দিক হইতেই তাহার কিছু হইয়া আসিল না।

সাকিনা মনীরকে জিজ্ঞাসা করিল, এই তারিখে বিয়ে হ'লো না ব'লে তোমার খুব কষ্ট হ'য়েছে, না ?

মনীর এই কথারও কোন জবাব না দিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল, না, আমার একটু কাজ আছে, একটু বাইরে যাচ্ছি। বলিয়া কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

তিন চারিদিন পর আবহুল শহর হইতে ফিরিয়া আসিল। সেদিন দুপুর বেলা মনীর খাইতে বসিয়াছিল, সাকিনা তাহাকে ভাত বাড়িয়া দিতেছিল। এমন সময় আবহুল সাকিনাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেখ্‌ত সাকি, এ'গুলো তোর হাতে ঠিক লাগ্‌বে কি না, নইলে আবার গিয়ে বদ্‌লে আন্‌তে হ'বে ! বলিয়া কয় গাছি সোনার চুড়ি তাহার হাতে তুলিয়া দিতে গেল। সাকিনা ব্যাপারটা প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না। সোনার চুড়ি ? তাহার জন্য ? তার পর ভাবিল, আবহুল বড় চাকুরি করে, অনেক টাকা রোজগার করে ; হয়ত সখ করিয়াই তাহার জন্য এই কয় গাছি চুড়ি কিনিয়া আনিয়াছে ! সাকিনা ভাতের সান্‌কিটা মনীরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ব্যগ্র হইয়া গিয়া আবহুলের হাত হইতে চুড়ি কয়গাছি নিজের হাতে লইল, তার পর ডান হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র জড় করিয়া এক গাছি চুড়ি পরিতে লাগিল।

এইত বেশ হয়েছে, নে সব কয়গাছি প'রে ফেল্—বলিতে বলিতে আবদুল চলিয়া গেল।

সাকিনার মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল। একেবারে কাঁচা সোনা, কেমন সুন্দর এর রং, গড়নের কি চমৎকার ভঙ্গি! সাকিনা মনীরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, নাও, এ'দুটো তোমার হাতে রাখ ত, আমি একটা একটা ক'রে পরি।

মনীর মাথা গুঁজিয়া ভাত খাইতেছিল, সে মাথা না তুলিয়াই জবাব দিল, ঐ ও' জায়গায় রাখলেই ত হয়, আমার কাছে কেন? মনীরের মুখের কথা কিংবা মনের ভাবের উপর সাকিনার লক্ষ্য ছিল না। সে দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়া মাটির উপর বসিল, তারপর কোলের উপর কয়গাছি চুড়ি রাখিয়া একটি একটি করিয়া পরিতে লাগিল।

সাকিনা জিজ্ঞাসা করিল, সোনা খুব দামী জিনিস, না মনীর ভাই?

মনীরের ভাত খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, সে সান্‌কিটা ঠেলা দিয়া রাখিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল। সাকিনার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

দুই দিনের মধ্যে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, আবদুলের সঙ্গে মনসুর তাহার কন্যা সাকিনার বিবাহ দিবে, মনীরের সঙ্গে বিবাহ দিবে না, আবদুলও তাহাতে সম্মত হইয়াছে।

কথাটা মনীরেরও কানে উঠিল, কিন্তু তখনও তাহা সে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু অবিশ্বাস করিবার মতও ক্রমে তাহার মনের বল নিঃশেষ হইতে লাগিল।

সেইদিন আবার তাহার সঙ্গে জলিলের দেখা হইল। সে মনীরকে জিজ্ঞাসা করিল, কি রে, আবদুলই নাকি মনসুরের মেয়েকে সাদি কচ্ছে, বলিয়া একটি অশিষ্ট মন্তব্য করিল। মনীরের ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল; তখন হইতেই গ্রামের কোন লোকজনের ছায়া মাত্র দেখিলেই সে যেন একেবারে চমকিয়া উঠে। সে কয়দিন ধরিয়া লোকালয় হইতে বহুদূরে

নির্জন মাঠে মাঠে একাকী ঘুরিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। ক্রমে সাকিনার সঙ্গে আবদুলের বিবাহের নির্ধারিত তারিখ নিকটবর্তী হইল।

মনীর গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু যাইবার পূর্বে একবার সাকিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে চাহিল। আবদুল স্বচ্ছল অবস্থার লোক, সে বড় চাকুরি করে, তাহাকে বিবাহ করিয়া সাকিনা সুখে থাকিবে, মনীর এক একবার ইহাই ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। নিজের স্বার্থের জন্য সে সাকিনার সুখের পথে কাঁটা হইতে চাহিল না।

একবার মনীর এক বাড়ীতে চাকুরি করিয়া কয়টি টাকা রোজগার করিয়াছিল, সে তাহা কোন উপায়ে মনসুরের হাত হইতে রক্ষা করিয়া নিজের হাতেই রাখিয়াছিল। সে মনে করিল, এই টাকা কয়টি লইয়া সে আজই রাত্রির গাড়ীতে আসাম রওনা হইয়া যাইবে। সেখানে কে একজন তাহার গ্রামের লোক অনেকদিন ধরিয়াই বসবাস করিতেছে, একবার সে দেশে আসিয়া মনীরকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, তখন সে যায় নাই, একমাত্র সাকিনার জন্যই তখন তাহার যাওয়া হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার আর সেই পথে বাধা দিবার কেহই রহিল না। মনীর মনে করিল, আজ রাত্রের গাড়ীতেই সে রওয়ানা হইবে।

সন্ধ্যা হইতে তখন আর বেশী বাকী নাই। অনেকক্ষণ হইতেই মনসুরের বাড়ীতে নিত্যকার মত কলের গান আরম্ভ হইয়াছে, আসন্ন উৎসবের আয়োজনে লোকজনের হাঁকডাকে বাড়ীখানি একেবারে মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। মনীর বহু দূর হইতেই তাহার আভাস পাইল। কিছুতেই আজ তাহার মনসুরের বাড়ার আঙিনায় পা দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না; কিন্তু তবুও আজ সে জন্মের মত এই গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে একবার হইলেও সাকিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতেও পারিতেছিল না।

মনীর মনস্থরের বাড়ীর আঙিনায় যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর চাকরের নাম বিলু। সে গোয়াল ঘরে গিয়া বিলুকে পাইল। বিলু মনীরকে কয়েকদিন দেখিতে পায় নাই, আজ তাহার চেহারা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, এ' কয়দিন কোথায় ছিলে ? তোমার চেহারা এমন যে ?

মনীর তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, চুপ কর্, সাকিকে একটু ডেকে দিবি ?

বিলু বলিল, এই গোয়াল ঘরে রাত ক'রে সে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবে ? যাও না, ও' ঘরেই ত আছে।

মনীর বলিল, থাক তা' হ'লে, তুই একটা কাজ করিস, এই জিনিসটা তাকে তুই দিস্, বিয়ের দিনে সে যেন হাতে পরে। বলিয়া কাপড়ের নীচ হইতে দুইগাছি রূপার বালা বাহির করিয়া বিলুর হাতে দিল।

বিলু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, তুমি যাচ্ছ কোথায় ? মনীর বলিল, আজ রাত্রের গাড়ীতে আমি চলে যাচ্ছি, নওগাঁ থেকে নাসির মুন্শী লিখে পাঠিয়েছে, খুব জরুরী।

বিলু সমস্তই বুঝিল, সে মনীরের পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহারই চাকর ছিল, মনীরকে সে শৈশব হইতে মানুষ করিয়াছে। বিলুর চক্ষু দুইটি জলে ভিজিয়া উঠিল। মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলিতে পারিল না।

মনস্থরের বাড়ী হইতে গ্রামের স্টেশন বেশী দূরে নহে। মনীর স্টেশনের দিকে দ্রুত হাঁটিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে স্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল। মনীর একটা কামরায় উঠিতে যাইবে, এমন সময় প্লাটফরমে বিলুর গলা শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া দেখিল, সাকিনাকে লইয়া বিলু তাহারই সন্ধান করিতেছে।

বিলু মনীরকে দেখিতে পাইয়া বলিল, এই যে, মনীর ! একটা কাজ কর, তুমি সাকিনাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, এ'দিকে যা হোক্ আমি সাম্‌লাব।

সাকিনা ছুটিয়া গিয়া মনীরের পায়ের কাছে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। বলিল, আমাকে কোথায় কার কাছে ফেলে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ ? যেতে হয়, আমাকে সঙ্গে নাও।

ট্রেনের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মনীর সাকিনাকে তাড়াতাড়ি ট্রেনের কাম্‌রার ভিতর তুলিয়া লইল।

বিসর্জন

দেখিতে দেখিতে ফুলিরও বয়স হইয়া গেল ; তাহার দিদি বিনি ভাবিল, এখন ইহারও একটা বিবাহ হইয়া গেলে ভাল হয়, কারণ, সাঁওতালের মেয়ে, ধাওরায় থাকে, কখন কি বিপদ হইয়া যায়, কে বলিতে পারে।

একদিন বিবাহের কথা পাড়িলে ফুলি রাগ করিল, বলিল —আমি যদি তোর আপদ বালাই, বল্. তা হলে তোর সাম্‌না থেকে চলে যাই। কুলির মেয়ে হয়েচি, গতর যদ্দিন খাটাতে পার্‌ব, তদ্দিন দুমুঠো খাবার অভাব হবে না।

ফুলির কথা শুনিয়া বিনি অপ্রস্তুত হইয়া গেল, কারণ, স্বপ্নেও সে এমন কথা মনে করে নাই, বিনি এমন মেয়েই নয়। দেশে যখন একবার অজন্মা হয়, তখন মা-মরা এতটুকুন এই বোনটাকে লইয়া তাহার বুড়া বাপের সঙ্গে সে এই কয়লা-খাদে কাজ করিতে আসিয়াছিল ; এখানে আসিয়া কি একটা দুর্ঘটনায় তাহাদের বাপও একদিন মরিয়া গেল। তারপর হইতে সে একাই এই বোনটার বাপ-মায়ের স্থান পূর্ণ করিয়া আছে ; কয়েক বছর হইল, সে বিবাহও করিয়াছে এবং সেই অবধি তাহার স্বামীর সঙ্গে ফুলিকে লইয়াই এইখানেই তাহারা একত্র কাজ করিয়া আসিতেছে। একদিনের জন্যও তাহাকে সে চোখের আড়াল করিতে পারে নাই ; কোনদিন করিবার কল্পনাও করিতে পারে না।

বিনি অনাবশ্যক ঘা খাইয়া ফুলির সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না। সে ইহাই মনে করিয়া চুপ করিয়া গেল যে, আর কিছুদিন যাউক, তখন আর তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য

কাহাকেও অনুরোধ করিবার প্রয়োজন হইবে না, নিজে হইতেই বিবাহের কথা পাড়িবে।

কিন্তু আর বেশিদিন যাইতে হইল না, অল্পদিনের মধ্যেই ধাওরার সকলে বলাবলি আরম্ভ করিল যে, ফুলি সর্দারের ছেলে বিল্লুর সঙ্গে যে ভাবে মাখামাখি আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে ইহাদের মধ্যে বিবাহ না হইয়া যায় না। কথাটা বিনির কাণেও গেল, শুনিয়া সে মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে মুখ ফুটিয়া ফুলিকে কোনদিন কিছু বলিল না।

দিন যাইতে থাকে, এই বিষয়ে বিশেষ আর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না। বিনি ভাবে, হয়ত সব মিথ্যা, মাতাল কুলিগুলির আজব খেয়াল! তাহারা বাপ-মা'মরা মেয়ে, সর্দার যেমন লোক, যেখানে স্বার্থের এতটুকুন গন্ধও নাই, সে নিজের একটি মাত্র ছেলের কখন সেখানে বিবাহ করাইতে যাইবে না, বিল্লু ইচ্ছা করিলেই বা কি হইবে? বাপের অমতে সে বিবাহ করিলে তাহাকে ধাওরা হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। তাহাতে কাহারও সুখ হইবে না।

বিনির স্বামীর নাম বঙ্কু। হাজিরার পয়সা হাতে পাইলেই সে মদ কিনিয়া খাইয়া মাতাল হইয়া পথে পড়িয়া থাকে, বিনির তাহাকে নিত্য খুঁজিয়া হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে ধাওরায় আনিতে হয়। সেদিন সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া বিনি দেখিল, বঙ্কু তখনও ফিরে নাই; একটা কাঠের আয়না সামনে রাখিয়া ফুলি চুল আঁচড়াইতেছে। বিনি জিজ্ঞাসা করিল—কি লা ফুলি, বঙ্কুকে দেখেচিস্? না আজও সে পচাই-খানায় মর্‌তে গেছে?

ফুলি দুই ঠোঁট দিয়া বিননিটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—কেন, আজ আবার সে কি সাধু হল? আজ যে তার হাজিরা পাবার দিন!

ফুলির এই ব্যঙ্গ বিনির ভাল লাগিল না; পথে পথে সে এই আশঙ্কাই করিয়া আসিতেছিল। তাহার ভাল লাগে না, কিছুই ভাল

লাগে না ; সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর ধাওরায় ফিরিয়া সে মাতালকেই সাম্‌লাইবে, না রাত্রির জন্য চারটা ভাতই সিদ্ধ করিবে। ফুলি ত কেবল গায়ে ফুঁ দিয়াই বেড়ায়, খাদ হইতে ফিরিয়া এই যে বাহির হইয়া যাইবে, আর ফিরিতে প্রায় বারটার ভোঁ বাজিয়া যাইবে, এতক্ষণ তাহাকেই আবার ফুলির ভাতও আগ্‌লাইতে হইবে।

বিনি বলিল, তুই আজ বেরোসনি, বোন ; উনুনটা ধরা, আমি মাতালটার খোঁজ করে আসি। কোথায় কোন রাস্তার উপর পড়ে থাক্‌বে, গায়ের উপর দিয়ে একটা গাড়ী ঘোড়া চলে যেতেই আটক কি? বলিয়া মাথা হইতে খালি ঝুড়িটা নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল।

ফুলি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, সজোরে আয়নাটা ঠেলা দিয়া সরাইয়া রাখিয়া বাহির হইতে টিনের উনুনটা বারান্দায় আনিয়া ধপ্‌ করিয়া ফেলিয়া দিল, তারপর কয়লার গাদার নিকট গিয়া হাতুড়িটা তুলিয়া লইয়া দুম্‌দাম্‌ শব্দে কয়লার চাপগুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া বিনি হাসিয়া উঠিল, বলিল, নে, নে, থাম্‌, আমিই উনুন ধরাচ্চি। তুই যা! ওদিক পানে যদি যাস্‌, তবে মাতালটার একটু খোঁজ করিস্‌। বলিয়া হাতুড়িটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, কেবল ধাওরায় কয়েকটা ঘরের সাম্‌নে কাঁচা কয়লা যে পুড়িয়া পুড়িয়া লাল হইতেছিল, তাহারই আলোকে খানিকটা জায়গা ফর্‌সা হইয়াছিল। বাহির হইতে বিল্লু ডাকিয়া বলিল, কি লা ফুলি, যাবি নে? তোর যে এখনও সময় হয় না?

বিনি ফুলিকে এক রকম ঠেলিয়া দিয়াই কহিল, যা, ফুলি, যা! তোদের যে আজ ও গাঁয়ে যাত্রা শুন্‌তে যাবার কথা, তা মনে ছিল না ; থাক্‌লে কখনও তোকে কাজ কর্‌তে বল্‌তাম না।

বিল্লু দরজা পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি লা বিনি, ফুলিকে আট্‌কেচিস্ না কি?

বিনি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল—না, ভাই, আমি ওকে আট্‌কে রাখিনি, এই দেখ্ না। বলিয়া তাহার ত্রুটীর কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিল।

বিল্লু বলিল, নে, এতে আর কি হয়েচে? বড় বোন্, তার কথা সইতেও হয়, বইতেও হয়; নে, চ; আর দেরি করিস্ নি, আবার বারটার ভেঁা'র আগেই ফির্‌তে হবে।

ফুলি অগত্যা তাড়াতাড়ি করিয়া এক রকম সাজিয়া গুঁজিয়া লইল: তারপর বিল্লুর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

বিনি রাত্রির জন্য রান্না করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মনটা বন্ধুর জন্য প্রতি মুহূর্তেই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। এক একবার মনে করিল, উঠিয়া গিয়া পচাইখানার পথে কলঘরটা পর্যন্ত তাহার একটু খোঁজ করিয়া আসে।

হিজলগোড়া গাঁয়ে আজ সন্ধ্যা হইতেই যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, ধাওরার সমস্ত কুলিকামিন্ সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া যাত্রা শুনিতে গিয়াছে, একজন কেহ থাকিলেও তাহাকে বলিয়া কহিয়া বন্ধুর একটা খোঁজ লইতে পারিত। হাতের রান্না ফেলিয়া যাইতেও তাহার মন উঠিতেছিল না; কারণ, ফুলি ফিরিয়া আসিয়া যদি কোন কারণে খাবার তৈরি না পায়, তাহা হইলে না খাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িবে। সে আবার এমন মেয়ে, কাল সকালে কাজে যাইবার আগে যে আজিকার বাসি ভাত কয়টি মুখে দিয়া যাইবে, তাহাও নহে; বাসি ভাত ত সে মুখে দেয়ই না, এমন কি, তাহার উপর রাগ করিয়া দুই একদিন কিছু খাইবেই না। বিনি রান্না করিতে লাগিল, আর বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। বারটার ভেঁা পড়িবার আগেই বন্ধু ধাওরায় ফিরিল, বিনি একরকম আশ্চর্য হইয়া গিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

কিন্তু হাতে হাজিরার পয়সা পাইয়াও বঙ্কু পচাই খাইতে যায় নাই ; সে গিয়াছিল যাত্রা শুনিতে। বলিল, গিইছিলাম, ও' গাঁয়ে, বেড়ে আসর জমিয়েচে রে, যদি যেতিস্। বলিয়া যাত্রায় অভিনীত ঘটনা-বস্তুর সংক্ষিপ্ত একটু বর্ণনা দিতে গেল। বিনি বলিল, তা' শুনব'খন, তুই চারটে খেয়ে নে, আবার ফুলি কখন ফিরবে, তার জন্য ব'সে থাকতে হ'বে।

বঙ্কু বলিল, ও'কে যে দেখ্‌লাম, সর্দারের বেটার সঙ্গে একটা পানের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে। বল্লাম, চ' ফুলি ; ঘরকে যা'বি ত চ'! ও' কিছু বল্লে নেই ; ঐ ছোঁড়াটাই বল্লে, তোর গরজ থাকে তুই যা, উ যাবেক লেই। বলিয়া বঙ্কু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বিনির দিকে চাহিল।

বিনিও তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু কিছু বলিল না। বঙ্কু বলিল, আর কেনে? সর্দারকে ব'লে বিয়েটা লাগিযে দিলেই ত পারিস্, ছোঁড়াটা ত দেখছি, ফু'লি'র নাম বল্‌তে অজ্ঞান।

বিনি মনের ভাব গোপন করিয়া একটু রুষ্ট হইয়াই যেন বঙ্কুকে বলিল, নে, নে, তোর আর কথায় কাজ নেই! চার্‌টে খেয়ে নিয়ে প'ড়ে থাক ; নইলে সাতটার ভোঁ-তেও ত ঘুম ভাঙ্গ্‌বে না! বলিয়া একটা মাটির সান্‌কিতে তাহার জন্য ভাত বাড়িতে লাগিল।

বঙ্কুর মনটা মদ না খাইয়াও আজ বড় প্রসন্ন ছিল,—যাত্রায় যে ঘটনাটি এই মাত্র সে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহার রেশটুকু যেন গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গানের মত তাহার মনের আনাচে কানাচে পাক খাইয়া ফিরিতেছিল। সে দুই হাঁটুর উপর চিবুক ঠেকাইয়া বসিল, তারপর যেন একটু রসিকতা করিবার ছলেই বলিল, আজ কি আর পচাই খেয়েছি রে, যে ঘুম ভাঙ্গ্‌বে না! ঐ পচাই ত আমার মাথাটা খেলে, তা নয় ত বঙ্কু মাঝির মত কয়টা লোক এই ধাওরাটায় আর ছিল।

বিনি বলিল, তা যদি বুঝিস্ তবে আর ও পাপ খাস্ কেনে? বলিয়া ভাত-শুদ্ধ সান্‌কিটা তাহার সাম্‌নে আগাইয়া দিল।

বঙ্কু সে কথার আর কোন জবাব না দিয়া নিঃশব্দে ভাত খাইতে লাগিল।

দূরে খাদের কলঘরে বারটার ভোঁ বাজিয়া উঠিল। হিজলগোড়া গাঁয়ের যাত্রার আসর হয়ত এতক্ষণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এই ধাওরা হইতে যাহারা যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, তাহারা একে একে সকলেই ফিরিয়া যে যাহার ঘরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একে ত এই শীতের রাত্রি, তায় আবার কাল সাতটার ভোঁ পড়িতেই সকলের গিয়া খাদে নামিতে হইবে,—কে আর সাধ করিয়া এত রাত্রে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়?

বাহিরে সর্দারের গলা শুনিতে পাওয়া গেল। ধাওরার সকলেই এই লোকটিকে সব চাইতে বেশি ভয় করে; এমন কি, ঠিকাদারের চাইতেও। লোকটার মেজাজ যেমন রুক্ষ, স্বভাবও তেমনি নির্দয়; অথচ লোকটার হাতে ক্ষমতা অপরিসীম—ইচ্ছা করিলেই সে যে কোন মুহূর্তে ধাওরার যে কোন কুলিকে বিনা কারণেই শিয়াল কুকুরের মত তাড়াইয়া দিতে পারে।

সর্দার বাহির হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে, বঙ্কু, ঘরে আছিস্?

বঙ্কু ভাতের গ্রাস গিলিতে গিলিতে জবাব দিল, হু! সর্দার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, মদের উগ্র গন্ধে সমস্তটা ঘর ভরিয়া গেল। সর্দার বলিল, ফুলি কোথায়?

বিনি উত্তর দিল, সে ত তোর বেটার সঙ্গে আজও বেরিয়েচে। সর্দার তাহা জানিত, বলিল, তোদের এক শ' দিন বারণ করেচি, তোরা সবাই মিলে আমার বেটার মাথাটা অমন করে খাস্‌নি। এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে হয়েচে, দে না, কোথাও বিয়ে থা দিয়ে। বিনির মনে একটু আশা হইল, এতদিনের কথাটা কোন রকমে পাড়িতে চাহিল, বলিল, মেয়ে বড় হয়েচে, এখন আমাদের কথায় যেখানে সেখানে ও বিয়ে করবে কেন, বল না! ওর ত এখন একটা নিজের মতের মূল্যি আছে।

সর্দার বুদ্ধিমান লোক। বিনি কোন জায়গায় ঘা দিতেছে, সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল ; বলিল, ওসব তোদের আশা মিছে, বিল্লু আমার কথা না শুনে আবার যদি ফুলির সঙ্গে বেরোয়, তা হলে বিল্লুকে ঘরে শেকল দিয়ে আট্‌কে রাখ্‌ব, আর ফুলিকে ধাওরা থেকে তাড়িবে দেব।

বিনির বুকটা ধড়াস্‌ করিরা উঠিল, সর্বনেশে মাতালটা বলে কি? কিন্তু তাহা দ্বারা যে এ' কখনও অসম্ভবও নয়, তাহা সে ভালই জানে। সকলেই জানে, সর্দার অতি নীচ স্বার্থপর লোক ; যেখানে কিছু টাকার গন্ধ আছে, সেখানেই সে বিল্লুর বিবাহ করাইবে, তাহাদের মত নিঃসম্বল বাপ মা-মরা মেয়েকে সর্দারের মত লোক ঘরের বউ করিতে যাইবে কেন? এত সব জানিয়া শুনিয়া সে এই দুরাশা করিতে গিয়াছিলই বা কেন? সর্দার তাহার মনের কথা জানিতে পারিয়া না জানি নিজে কি মনে করিয়াছে!

সর্দার বলিল, এতটা রাত্তির হল; একটাও ঘরকে এলেক নেই! আমি এ সব আর সইব না! বুঝ্‌লি, বিনি, বুঝ্‌লি বঙ্কু, আমি এর একটা হেস্ত নেস্ত কর্‌ব। বলিতে বলিতে সর্দার বাহির হইয়া গেল।

বঙ্কু এইবার কথা কহিল, বিনিকে ধম্‌কাইয়া বলিল, উ' সব ভাল লয়, বিনি, উ' সব অতটা ভাল লয়! হাজার হোক্ উ গোটা ধাওরাটার সর্দার বটে! দু' তিন শ' সাঁওতাল উ'র কথাটা মাথায় তুলে রাখে, আমরা দুঃখী লোক, উর বেটার সঙ্গে মাখামাখি আমাদের মানায় না।

বিনি কোন কথা কহিল না, ফুলির সম্পর্কে যে সুখের স্বপ্ন সে এতদিন ধরিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল, তাহা এমন ভাবে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে, কোনদিন সে আশঙ্কাও করিতে পারে নাই, সে কতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বঙ্কুর খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, সে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বারান্দায় একটা কাঁথা জড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

এমন সময় ফুলি আসিয়া ডাকিল, দে বিনি, ভাত দে! বলিয়া ঘরে

ঢুকিয়া নিজেই একটা আসন লইয়া বসিয়া পড়িল ; বিনি নিঃশব্দে ভাত বাড়িয়া দিল।

ফুলি খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধু অনেকক্ষণ ফিরেছে, না ? বিনি সংক্ষেপে উত্তর দিল—হুঁ ! তারপর একটু ভাবিয়া বলিল, দেখ্ ফুলি, তুই বিল্লুর সঙ্গে যাস্‌নি', সর্দার রাগ করে !

ফুলি নির্লিপ্তভাবে ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, ও যায় কেনে ? আমি কি ও'কে সেধে নিয়ে যাই ?

বিনি বলিল, নিজের বেটার দোষ ত আর ও দেখ্‌বেনা, উ আমাদেরেই দোষ দেবে, আমরা গরীব, ও'র আশ্রয়ে আছি !

ফুলি আর কিছু বলিল না, বুঝিল, ইহা লইয়া সর্দারের সঙ্গে তাহাদের কথা হইয়াছে ; নহিলে আজ সহসা বিনি নিজে হইতে এমন কথা কখনও বলিতে যাইত না।

ফুলি এক রকম না খাইয়াই উঠিয়া গেল, বিনিও খাইবার জন্য তাহাকে বেশি সাধাসাধি করিতে পারিল না ; কারণ, তাহার মন এই ঘটনা লইয়া এতই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার এরূপ বোধ হইল, এই বিষয়ে আর কিছু বলিতে হইলে সে কাঁদিয়াই ফেলিবে। সেও এক রকম না খাইয়াই রাত্রে ঘুমাইয়া রহিল।

সে দিন কালাঝড়ের মেলা ; খাদের কাজ হইতে কুলিরা সারাদিনের ছুটি পাইয়াছে। মালিজোড়ার ধাওরা হইতে কালাঝড়ের মাঠ প্রায় তিন ক্রোশ পথ। সকাল হইতেই কুলিদের মধ্যে সাজ-সজ্জার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বন্ধুর আজ আনন্দ দেখে কে ? সে তাহার বাব্‌রি চুল একটা কাঠের চিরুণী দিয়া সুন্দর করিয়া আঁচ্‌ড়াইয়া লইয়াছে, দুই কাণে দুইটা বড় গেঁদা ফুল গুঁজিয়া তাহার বহুদিনের জীর্ণ মাদলখানি ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ঢিলা আংটিগুলি টানিয়া আঁট করিয়া সার বাধিয়া লইয়াছে, তারপর তাহা কাঁধে লইয়া ধাওরার সামনে গিয়া নানা ভঙ্গীতে ঘাড় কাত করিয়া পা নাচাইয়া দ্রুততালে তাহাতে ঘা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিনি ফুলিকে বলিল, যাবি ত চার্‌টে খেয়ে নে, ফির্‌তে কত রাত্তির হয়, কে জানে?

ফুলি কোন জবাব দিল না। আজ কয় দিন ধরিয়াই তাহার মনটা ভাল নাই। এই কয়দিন বিল্লুর সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই; সকলেই বলিয়াছে, সর্দার তাঁহাকে তাহার সঙ্গে যাইতে বারণ করিয়াছে, বিল্লু ফুলিকে ভালবাসিলেও বাপের অবাধ্য হইবার মত জোর তাহার নাই। থাকিলে হয়ত তাহারা দুইজনে কোথাও পলাইয়া গিয়া বিবাহ করিত।

বাহিরে দ্রুততালে মাদল বাজিতেছে; যে মাদলের শব্দ শুনিলে সাঁওতাল মেয়ের মন মাতাল হইয়া উঠে, ঘরের কোন হইতে মন দূর মাঠের মুক্ত হাওয়ায় উড়িয়া যায়। ফুলি আন্‌মনা হইয়া গিয়াছিল, তাহার অতৃপ্ত হৃদয়ের সমস্ত অনাস্বাদিতপূর্ব সুখ এমন করিয়া স্বপ্নের মত অন্তর্হিত হইবে, তাহা সে কেমন করিয়া সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

বিনির বয়স হইযাছিল, কিন্তু পরবের দিনে সাঁওতাল মেয়েরা বয়সের বিচাব করিয়া তাহাদের আনন্দকে কোন দিক্‌ দিয়া খর্ব করে না। বিনিও আজ বালিকার মত সাজিতে লাগিল, পরণে নূতন কোরা শাড়ী, পায়ে ঝুমঝুমি, গলায় হাঁস্‌লি, কানে বনফুল। ফুলিই কেবল তাহার নিরানন্দ গৃহকোণে বসিয়া উৎসবের এই আয়োজন নিঃশব্দে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

বিনি আসিয়া বলিল, চ', ফুলি চল্‌, এ'কি গ. তোর যে এখনও কিছুই হয় নি'!

ফুলি বলিল, তোরা যা', আমি যাব নেই, আমার শরীর ভাল' নেই।

বিনি সমস্তই বুঝিল, তাহার ছোট বোনটিকে একেলা ধাওর্‌ায় ফেলিয়া যাইতেও তাহার মন উঠিতেছিল না; কিন্তু বন্ধু অল্প ক্ষণের মধ্যেই ডাকাডাকি হাঁকাহাকি আরম্ভ করিয়া দিল। অগত্যা বিনিকে একাই বাহির হইতে হইল।

ধাওরার সামনা দিয়াই কালাঝড়ের পথ; কত গ্রামগ্রামান্তরের লোক

কাঁধে মাদল লইয়া কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে। কেহ বা সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়া হাতের বাঁশিটী আড় করিয়া ধরিয়া এক একবার ফুঁ দিতেছে, শত শত মাদল আর বাঁশীর শব্দে আকাশ যেন স্তব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা ফুলি কাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, ফিরিয়া দেখিল, বিল্লু।

বিল্লু বলিল, ফুলি যাবি, আমার সঙ্গে যাবি?

ফুলি বলিল, যদি সর্দার দেখ্‌তে পায়?

বিল্লু মনের মধ্যে একটু কৃত্রিম সাহস টানিয়া আনিয়া বলিল, ইস্, তা' হ'লে যেন ব'য়েই গেল, কুলির বাচ্চা হ'য়ে জন্মেছি, না হয় আর কোথাও চ'লে গিয়ে দু'জনে কাজ কর্‌ব!

ফুলি আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পার্‌বি, বিল্লু? আমি কিন্তু খুব রাজি!

বিল্লুর সাহস অনেকটা কমিয়া আসিল, বলিল, সে' দেখা যাবে'খন পরে, আজ চল্ মেলা থেকে আসি, সকলের আগেই আমরা ধাওরায় ফিরে আস্‌ব।

ফুলি আর দ্বিরুক্তি করিল না, এক রকম করিয়া সাজিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

তিন চারিদিন পরে খাদে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিল। কয়েকজন কুলি যখন একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে কয়লা কাটিতেছিল, তখন সহসা উপর হইতে একটি বিশাল পাথরের চাপ তাহাদের মাথায় পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই কুলি কয়জনের মৃত্যু হইল, তাহাদের মধ্যে বঙ্কুও ছিল একজন।

বিনি ও ফুলি দু'জনেই কাঁদিয়া ধাওরায় ফিরিল। সর্দার আসিয়া বিনিকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিল, কিন্তু বিনির ক্রন্দনাবেগ কিছুতেই রোধ মানিতে চাহে না। সর্দার অবশেষে বলিল, সাঁওতালের মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিস্, একটা সোয়ামী মরেচে, না হয় আর একটা বে'

কর্‌বি, তার জন্যে আব এত কান্না কেনে? শুনিয়া বিনি দ্বিগুণ কাঁদিয়া উঠিল। অগত্যা সর্দার নিরস্ত হইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

এই দুর্ঘটনার খবরটা অনেক দূর জানাজানি হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন আশাতীত ক্ষতিপূরণের টাকা পাইল। তাহাদের সঙ্গে বিনিও অনেক টাকা পাইল।

সে'দিন কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিনি দেখিল, সর্দার তাহার ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। সর্দার বলিল, এই যে বিনি, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে, একটু ইদিকে আয়; বলিয়া তাহাকে লইয়া ফুলির নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া আসিল। সর্দার বলিল, আমার বিল্লুকে তোর সঙ্গে বিয়ে করাব ঠিক করেছি, আস্‌চে হপ্তা সোমবারে দিন, বুঝলি, একটু তৈরী হ'য়ে থাকিস্‌!

বিনি ইহার অর্থ বুঝিল, বলিল, না, না, আমার বয়েস হ'য়েছে, তা'র চাইতে ফুলিকে তুই নে, আমার যা' টাকাকড়ি আমি তাকেই দিয়ে দেব।

সর্দার বলিল, তা' কোম্পানি দিতে দেবে কেন? টাকা ত এখনও তাদের হাতে, একটা বিয়ে করে তোর সোয়ামীতে আর তুই কোম্পানীর কাছ থেকে সে টাকা আন্‌বি, এই ত আইন।

বিনি বলিল, টাকা কোনদিন না পেলেও আমি তা পার্‌ব না, তুই অন্য চেষ্টা দেখ্‌।

কিন্তু সর্দার নিরস্ত হইবার পাত্র নহে। সে নানা প্রকার চেষ্টায ঠিকাদারকে ধরিয়া আড়কাঠিকে দিয়া বলাইয়া কহাইয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিল।

এদিকে সমস্ত ধাওরায় রাষ্ট্র হইয়া গেছে যে, সর্দারের বেটার সঙ্গে আগামী সপ্তাহে, বিনির বিয়ে—দিন-তারিখ পর্যন্ত ঠিক। সকলেই ভাবিল, এইবার বিনির কপাল ফিরিয়াছে। দুইদিন পরে বিল্লুই সর্দার হইবে, তখন বিনিই গোটা ধাওরাটার কর্ত্রী; একি একটা সাধারণ মেয়ের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা?

ফুলি কথাটা শুনিল, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না; কারণ, সে নিশ্চিত জানে, বিল্লু তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও জীবনে বিবাহ করিবে না। তাহা ছাড়া বিনিও তাহার চোখের সাম্‌নে লজ্জার মাথা খাইয়া এমন কাজ কখনই করিতে সাহস পাইবে না।

কয়দিন ধরিয়াই ফুলি বিনির চলাফেরা ও কথাবার্তার উপর একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছে। তাহার প্রতি বিনির মনোভাব পূর্বের মতই রহিয়াছে কি না, তাহাই জানিবাব জন্য সে নানা উপলক্ষে বিনির সহিত সম্পর্ক ঘনাইয়া তুলিতে লাগিল। ইহার আগে ফুলি সর্বদাই বিনির নিকট হইতে দূরে দূরে সরিয়া থাকিত, কিন্তু ধাওরায় এই গুজব রাষ্ট্র হওয়ার পর হইতেই সে এক মুহূর্তের জন্যও বিনির কাছ ছাড়া হয় না; বিনিকে সে যদিও বিশ্বাস করে, তবু কেন জানি তাহার এখনকার ব্যবহার সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারে না!

একদিন কাজ হইতে ফিরিয়া খাইয়া দাইয়া ফুলি ঘুমাইতেছিল। তখনও বারটার ভোঁ পড়ে নাই। এমন সময় ঘরের মধ্যে কাহার কথা-বার্তার শব্দ শুনিয়া সে জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া শুনিতে পাইল, সর্দার বিনির সঙ্গে কি যেন আলাপ করিতেছে, কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাহারা বাহিরে চলিয়া গেল। ফুলি বিছানার উপর এ'পাশ ওপাশ করিতে লাগিল; যত রাজ্যের চিন্তা তাহার মাথার গোড়ায় আসিয়া যেন ভিড় করিয়া দাঁড়াইল, সে যতই তাহা দূরে ঠেলিয়া দিতে চায়, ততই তাহা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। এত রাত্রে সর্দার বিনির সঙ্গে কি কথা বলিতে আসিয়াছে? কি কথাই বা তাহারা বলিতে বলিতে এমন ভাবে ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল? নিশ্চয়ই তাহার অজ্ঞাতে বিনিও তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। সে তাহার দিদি হইয়া তাহার বিল্লুকে এমন ভাবে কাড়িয়া লইয়া যাইবে? বিনির কাছ হইতে এমন বিশ্বাসঘাতকতা সে কখনও আশা করিতে পারে নাই! ভাবিতে ভাবিতে ফুলি কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সাতটার ভোঁ পড়িবার আগেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ; দেখিল, বিনি রান্নাবান্না সারিয়া কাজে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও ফুলির ঘৃণাবোধ করিতে লাগিল ; সে বিছানার উপর নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

অবশেষে বিনিই তাহাকে ডাকিল, বলিল, উঠ্‌লিনে ফুলি, ভোঁ যে পড়ে! কখন খাবি, কখন বেরুবি? বলিয়া ঝুড়িটা মাথায় লইয়া সে নিজের কাজে বাহির হইয়া গেল। ফুলি ভাবিল, বিনির কথাবার্তা ও ব্যবহারে যেন তাহার প্রতি আর পূর্বের মত ভাব নাই, যেন তাহাকে সে দূর করিতে পারিলেই বাঁচে, সে যেন তাহার আপদ, প্রতি কাজেই তাহার বাধা!

খাদে সাতটার ভোঁ বাজিতেই ফুলি ধড়্‌মড়্‌ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল, তারপর না খাইয়াই ঝুড়িটা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথে দেখিল, দূরে অন্য পথ ধরিয়া গাঁইতি লইয়া বিল্লু খাদের দিকে যাইতেছে। ফুলি মনে করিল, বিল্লু তাহাকে ডাকিবে ; সেই যে কালা-ঝড়ের মেলা হইতে ফিরিয়া সে সর্দারের হাতে মার খাইয়াছিল, তারপর তাহার সঙ্গে আর বিল্লুর দেখা নাই। এ'দিকে সাতটার ভোঁ বাজিয়া গিয়াছে, পনের মিনিটের মধ্যে ডুলিতে গিয়া না দাঁড়াইলে খাদের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে, শত অনুনয়েও হাজিরাবাবুর মন গলিবে না। ফুলি দ্রুত চলিল।

শেষ ডুলি নীচে নামিবার জন্য প্রস্তুত। ফুলি কোন মতে গিয়া তাহাতে উঠিল, পিছনে বিল্লুও দৌড়াইয়া আসিয়া সেই ডুলিতেই উঠিয়া গাঁইতিতে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

ফুলি ও বিল্লুকে লইয়া অন্ধকার খাদের গর্ভে ডুলি নামিতে লাগিল। বার শ' ফুট গভীর খাদ, ডুলির পথ আর ফুরায় না। গভীর মৃত্তিকাতল হইতে কুলিদিগের কয়লাকাটার শব্দ আর উপরের কলঘরের ইঞ্জিনের শব্দ এই উভয়ে মিশিয়া ফুলির কাছে যেন কি এক প্রেতপুরীর অভিনয়

করিতে লাগিল। ফুলির অভিমান দূর্ হইল, সে বিল্লুকে জিজ্ঞাসা করিল, বিনিকে তুই বিয়ে কর্‌বি, না রে বিল্লু!

দুঃখে বিল্লুরও কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল; সে বলিল, দেখ ফুলি, তোকে ছুঁয়ে বল্‌চি, যদি তোকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে কত্তে চেয়ে থাকি, কিন্তু—

ফুলি বলিল, কিন্তু কি? চল না পালিয়ে যাই! জানিস্‌নে, ও' গাঁয়ে চা বাগানের এক আড়কাঠি এ'সে আপিস খুলেছে? কত লোক নিচ্চে, কোথায় নাকি অনেক দূর্ তা'দের চ-বাগানের দেশ, আমরা হোথায় পালিয়ে যা'ব, চ'।

তাহাদের কথা আর শেষ হইল না, ডুলি আসিয়া খাদের নীচে নামিতেই একজন কুলি তাহাদিগকে দেখিয়া রসিকতা করিয়া এক অতি অশিষ্ট মন্তব্য করিল; শুনিয়া বিল্লু ডুলি হইতে নামিয়া ফুলির জন্য অপেক্ষা না করিয়া এক সুড়ঙ্গ ধরিয়া নিজের কাজে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

ডুলি হইতে নামিয়া ফুলি বিল্লুকে না দেখিয়া ভাবিল, সে এই পলায়নের প্রস্তাবে সম্মত নহে। সে যেমন দুর্বলচেতা, হয়ত সর্দারের আদেশে সে বিনিকে বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই করিবে না।

ফুলির কোন কাজেই আজ মন বসিতেছিল না, সে খাদেব নীচের অন্ধকার অলিগলিগুলি অকারণেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, একটা জায়গায় গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এইখানে বঙ্কু সে'দিন পাথর চাপা পড়িয়া মরিয়াছে! ফুলির আর কিছুই ভাল লাগিল না; সে স্থির করিল, বিল্লু না যায় না যাক, সে একাই আজ চা-বাগানের আড়কাঠির নিকট নাম লিখাইতে যাইবে। তাহাদের ধাওরার কে একজন কিছুদিন চা-বাগানে কাজ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার নিকট সে সেই চা-য়ের দেশের কত গল্প শুনিয়াছে। তাহার কল্পনাতেই যেন এই সাঁওতাল মেয়ের সর্বাঙ্গে আনন্দের রোমাঞ্চ আনিয়া দিল। সে স্থির করিল, এই

অবিশ্বাসী বিল্লু, বিশ্বাসঘাতক বিনি, ইহাদের দেশে আর বাস করিবে না ; দূর আসামের অজ্ঞাত সরল বনের সহস্র শাখা-প্রশাখা যেন তাহাকে নিঃশব্দ-ইঙ্গিতে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, সে এই আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিবে না ; তাহারা বুনো সাঁওতাল, নীরস প্রস্তরভূমির প্রাণহীনতা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে !

বিনি কাজ হইতে ফিরিয়া দেখে ফুলি ঘরে নাই। সে মনে করিল, কোথাও গিয়াছে, এখনি আসিবে। এমন সে নিত্য যায়, কোনদিন ফিরিতে একটু রাত্রিও হয় ! সর্দার আসিয়া বলিল, ফুলিকে নিয়ে চল্, বিনি ! তোর টাকা যে তুই ফুলিকে নিজের ইচ্ছায় দিয়ে দিলি, তা বড় সায়েবকে তোর নিজের মুখে বল্‌তে হ'বে ; ফুলিকেও সাম্‌নে থাক্‌তে হ্‌বে। চ' শীগ্‌গির, সাহেব না বেরিয়ে যায়।

অগত্যা বিনি তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইল ; তাহার বহুদিনের স্বপ্ন আজ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, আজ সে বিল্লুর সঙ্গে ফুলির বিবাহ স্থির করিয়াছে, ইহার জন্য তাহার যে এই সামান্য ত্যাগ তাহা তাহার বাপ-মা-মরা একটি মাত্র ভগিনীর ভবিষ্যৎ সুখের তুলনায় কত সামান্য, কত তুচ্ছ !

অনেক রাত্রে বিল্লু ধাওরায় ফিরিল, বিনি জিজ্ঞাসা করিল, কি রে, ফুলি তোর সঙ্গে যায়নি ?

বিল্লু বলিল, না ! সেও তাহার বিবাহ ব্যাপারে আকস্মিক পট পরিবর্তনের কথা এই মাত্র আসিয়া শুনিয়াছে। তাহার মনটা কি যেন এক অমঙ্গল আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিল। বলিল, চল্ ত, কাজোরা গাঁয়ে নাকি কে এক চা-বাগানের আড়কাঠি এসেছে, তার ও'খানে ! বলিয়া ফুলির সহিত তাহার আজ খাদে নামিবার সময় যে আলাপ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিল।

বিনি উন্মাদের মত হইয়া কাজোরা গাঁয়ের দিকে ছুটিল। সেখানে গিয়া শুনিল, আজ সন্ধ্যায় একদল কুলি লইয়া আড়কাঠিবাবু রাণীগঞ্জ

ইস্টিশনের দিকে গেছেন, রাত্রের ট্রেনে তাহাদিগকে লইয়া আসাম রওয়ানা হইবেন।

কাজোরা হইতে রাণীগঞ্জ স্টেশন তিন ক্রোশ পথ; বিনি উর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের দিকে ছুটিল। অন্ধকার রাত্রি,—পথের কোন দিশা নাই, বিপদের কোন জ্ঞান নাই, সে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিল।

একটু দূর হইতে দেখিতে পাওয়া গেল, একখানি ট্রেন দীর্ঘ-বিসর্পী সার্চ লাইটের আলো ফেলিয়া স্টেশন হইতে বিদ্যুৎগতিতে বাহির হইয়া আসিতেছে। বিনি শূন্য প্লাট্‌ফর্‌মে গিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িল।

টেলিগ্রাম

এক

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দোলগোবিন্দবাবু এইবার বদ্রিনাথ যাইবেন, স্থির করিলেন। যাহারা তাঁহাকে ঘরকুণো বলিয়া উপহাস করিত, তাহারা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের এই দুঃসাহসিক সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া প্রথমটা ইহা বিশ্বাসই করিতে পারিল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যখন দেখিল, তিনি সত্য সত্যই দুই মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই তিনি বদ্রিনারায়ণ পর্যন্ত যাইবেন, তখন আর কাহারও অবিশ্বাসের কিছুই রহিল না, কিন্তু কেন জানি না বিষয়টা বিশ্বাস করিয়া লইতে তখনও সকলেরই কেমন কেমন করিতেছিল।

দোলগোবিন্দবাবু পশ্চিমের একটি শহরে রেলের অফিসে সামান্য চাকুরী করেন। রেলে যাতায়াতে তাঁহার ভাড়া লাগে না; সেইজন্য বলেন, রেলের পাশ নিয়ে গয়া কাশী ঘুরে আমার পুণ্যি কি? অর্থ ব্যয়ও হলো না, কায়িক শ্রমও কিছুই হলো না, এত অনায়াসে দেবতার তুষ্টি হয় না; আগের দিনে বাড়ী থেকে নিজের শ্রাদ্ধ করে তারপর লোকে বেরুত তীর্থে, পুণ্যও হতো তাঁদেরই, আর এখন······? বলিয়া দোলগোবিন্দবাবু অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া দক্ষিণ হাতের পাঁচটি আঙ্গুলে এক অপূর্ব মুদ্রা-ভঙ্গি সহকারে যে মন্তব্য করিতেন, তাহা ঐক তীর্থগামী বৃদ্ধের নিকট কদাচ আশা করা যায় না।

দোলগোবিন্দবাবু প্রায়ই বলিতেন, হ্যাঁ, যেতে হয় যাও মানস-সরোবর, কৈলাস; তা নয় ত অন্ততঃ কেদার বদ্রি। দিনের পর দিন

বরফের উপর দিয়ে নিঃসঙ্গ যাত্রা, দীর্ঘ দুস্তর পথের পরপারে সেই অভীষ্ট স্থান, এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছানর যে আনন্দ, তা কি আর টুক করে ট্রেন থেকে নেমে টাঙ্গায় চেপে গিয়ে পৌঁছানর সমান?

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলে ভাবিত, ইহা তাঁহার পয়সা বাঁচাইবার অন্যতম কৌশল মাত্র, কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে তিনি যে একটি উন্মত্ত বাসনাকে এতকাল সুপ্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। সেইজন্য আজ তাঁহার সত্য সত্যই এই আয়োজন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল।

ছ'কড়িবাবু দোলগোবিন্দবাবুর সহকর্মী, বয়সেও তাঁহার অপেক্ষা কিছু বড়। অফিস হইতে ফিরিবার পথে একদিন তিনি দোলগোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে ভায়া, বলি, একাই যাচ্ছ, না সঙ্গে কাউকে নিচ্চ? আমি বলি কি, এত দূরের পথ এক আধজন সঙ্গী হলে ভাল হয় না? দেখ না চেষ্টা করে, আর কাউকে পাও কি না! এমন তীর্থে যেতে কারই না সাধ যায়? কিন্তু তোমার মত ভাগ্যি নিয়ে ক'জন জন্মেছে,—এই বয়সেও এমন মুক্ত পুরুষ হয়ে বাড়ী থেকে বেরুতে পাচ্ছ, আমাদের যা কপাল, একদণ্ড বাড়ী ছেড়ে বেরুনোর উপায় আছে?" বলিয়া কল্পনায় নিজের গৃহের চিত্রটি দেখিয়া লইয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস গোপন করিয়া লইলেন।

দোলগোবিন্দবাবু বলিলেন আর দাদা, সঙ্গী! সঙ্গী আমার এক বদ্রিনারায়ণ, তাঁর ধ্যান, তাঁর চিন্তাই হবে আমার একমাত্র সহায়। বলিয়া হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইলেন। তারপর বলিলেন, পথের সঙ্গী চাও, তারই কি অভাব? লছমনঝোলায় কালীকম্‌লীওয়ালীর চটীতে দু'দিন থাক্‌লেই ঢের সঙ্গী জুটে যাবে।

ছ'কড়িবাবু বলিলেন, জুটবে ভায়া, তা জুটবে! আমাদের মত হতভাগা ত সংসারে আর নেই যে, চিরটা কাল এমনি ঘরের মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে থাকবে, দুদিনের জন্যে হলেও এই জঞ্জাল ফেলে রেখে পরকালের একটু

উপায় করবার জন্যে সকলই বেরুতে পারে! বলিতেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার তের চৌদ্দ বছরের ছেলে নসু স্কুল-ফেরতা এক পানের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি লম্বমান নাতিদীর্ঘ রজ্জুর জ্বলন্ত অগ্রভাগ হইতে বিড়ি ধরাইবার চেষ্টায় নিযুক্ত আছে। তিনি অলক্ষিতে গিয়া তাহার সম্মুখে পড়িলেন এবং তাহাকে কালোচিত সম্বর্ধনা করিয়া গৃহের দিকে লইয়া চলিলেন।

দোলগোবিন্দবাবুর ছুটি মঞ্জুর হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! দুই একজন মাত্র আড়ালে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, লক্ষণটা বড় ভাল দেখাচ্ছে না; দাদা এবার ফিরলে হয়।

দোলগোবিন্দবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম ঈশানী। কিন্তু তাঁহার বয়স হইয়াছে। পাড়ায় উত্তম গৃহিণী বলিয়া তাঁহার বেশ নাম আছে। আপদে বিপদে সকলেই তাঁহার আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া থাকে। সেদিন তিনি দ্বিপ্রহরে খাইয়া দাইয়া একটু গড়াইয়া লইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় পাড়ার ঘোষগিন্নী আসিয়া তাঁহার পাশে বসিলেন, বলিলেন হ্যাঁগা, এই বয়েসে ওনাকে এমন করে কোথায় পাঠাচ্ছ? লোকে বলে, বদ্রিনারায়ণ গেলে নাকি আর কেউ ফিরে না!

ঈশানীর বুকের ভিতরটা সহসা ধক্ করিয়া উঠিল। পোড়ারমুখী বলে কি? একটু চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, দেবতার কাজে যাচ্ছেন, আমি বাধা দেব কি করে? বদ্রিনারায়ণের কৃপায় তাঁর কোন অমঙ্গল হবে না। বলিয়া তিনি যুক্ত কর কপালে ঠেকাইলেন। ঘোষগিন্নী বলিলেন, না, অমঙ্গলের কথা কি আমিই বলছি? লোকে বলে তাই বলছিলাম। তা নয়ত আমার এতে মাথা ঘামাবার কি? শুন্‌ছি প্রথম পক্ষের ছেলেটাকে নাকি কিছুই দিয়ে যান্ নি, সবই তোমাকে দিয়েছেন? কিন্তু ধর্মের কাছে কি এ সইবে?

ঈশানী সমস্তই বুঝিল, কিন্তু রাগ করিল না। একটু হাসিয়া বলিল,

তোরা বুঝি তাই বলছিস্, না? তোদের আলোচনা যখন এতদ্দূর এগিয়েছে, তখন আমার কথাও ত তোরা বিশ্বাস করবি নে! তা হলে কয়েকটা দিন সবুর কর, তিনি ফিরে এলেই এর ঠিক জবাব পাবি।

ঘোষগিন্নী একটু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, আমরাও ত তাই চাই, দিদি! তা নয়ত এমন সোনার সংসার ফেলে রেখে কে এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাক্, এই চায়। তিনি ফিরে আসুন, সংসারে এমন ছেলে রয়েছে, তার বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে নিন। তা ত সকলেরই আনন্দের বিষয়।

ঈশানী হাসিয়া বলিলেন, তাই হবে লো, তাই হবে! ছেলের বিয়ের বৌ-ভাতে তোকে পাঁচ শো দিস্তে পাঁপড় ভাঁজতে হবে, আজই বলে রাখলাম; যা এখন একটু গড়াব। বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়া পাখাটা হাতে লইয়া মাদুরের উপর শুইয়া পড়িলেন।

দোলগোবিন্দবাবুর ট্রেন দেরাদুন এক্সপ্রেস্ রাত্রি প্রায় দুইটায় এখানে আসে। সন্ধ্যা হইতেই তাঁহার বাড়ীতে পাড়া-প্রতিবেশীর ভীড় জমিয়া গেল। নানা জনে নানা ফরমায়েস্ দিতে লাগিল। কেহ বলিল, দাদা, আমার জন্যে ভাল বেতের লাঠি ফেববার সময় হৃষীকেশ থেকে কিনে আন্‌বে; কেহ বলিল, দাদা, আমার বিশেষ কিছুই নয়, অষ্টধাতুর একটি আংটি, এই আঙ্গুলের মাপ নাও, চাও ত আগাম পয়সা দিয়ে দি; কিন্তু পয়সা দিবার আর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এই ভাবে নানা জনের নানা ফরমায়েস ও শুভেচ্ছা লইয়া রাত্রি বারোটার সময় মাহেন্দ্র যোগে দোলগোবিন্দবাবু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাত্রা করিবার সময় গিন্নী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিলেন, দ্যাখো, এত দূরের পথ, একলা এই বয়সে যাচ্ছ, এই ক'দিন যে আমার কি ভাবে কাটবে, তা নারায়ণই জানেন। তুমি কিন্তু পৌঁছেই একটি টেলিগ্রাম করতে ভুলো না। আমি তোমার টেলিগ্রামের আশায়ই থাকবো।

দোলগোবিন্দবাবু স্ত্রীর এই সপ্রেম উক্তিতে মনে মনে অত্যন্ত

প্রফুল্ল হইলেন, তাঁহার দুর্গম যাত্রাপথের এই অদৃশ্য সতর্ক স্নেহ দৃষ্টিটুকুই যেন তাঁহার পথের দুশ্চিন্তার অনেকখানি লাঘব করিয়া দিল। প্রকাশ্যে বলিলেন, নিশ্চয়ই, সেজন্যে তোমাকে মোটেই ভাবতে হবে না; আমি পৌঁছুতে আজ হতে বড় জোর এই একমাস, যখনই বদ্রিনারায়ণের পায়ের তলে গিয়ে পৌঁছুব, তখনই তোমাকে তার করবো, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।

রাত্রি প্রায় দুইটায় দেরাদুন এক্সপ্রেস্ আসিয়া পৌঁছিল।

বন্ধুবান্ধব অনেকেই রাত্রি জাগিয়া স্টেশন পর্যন্ত আসিল। 'বদ্রিনারায়ণকি জয়' শব্দে স্টেশন প্লাটফরম মুখরিত হইয়া উঠিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রেন ছাড়িয়া যাইবার বাঁশী বাজাইল। নস্করি ট্রেনের কামরার ভিতর প্রবেশ করিয়া দোলগোবিন্দবাবুকে চুপি চুপি বলিল, বাবা, মা বলে দিয়েছেন, পৌঁছেই টেলিগ্রাম করতে যেন ভুল না হয়। দুই একজন বন্ধুবান্ধব কথাটা শুনিতে পাইয়া বলিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, পৌঁছেই কিন্তু টেলিগ্রাম কবো, দাদা! আমরা টেলিগ্রাম অপিসে খোঁজ নেব।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

শেষবারের মত প্রাণপণ চিৎকারে 'বদ্রিনারায়ণ কি জয়' বলিয়া বন্ধুবান্ধব বিদায় লইল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কয়েক জন ইংরেজ যাত্রী নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, আকস্মিক চিৎকারে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা কতক্ষণ বিড়্ বিড়্ করিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইল। ট্রেন অন্ধকারে মিলাইল।

দুই

পশ্চিমের শহরগুলির উত্তাপ ১১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত চড়িয়াছে। স্কুল কাছারি সকালে বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেলা নয়টার পর

হইতে পথঘাট জনশূন্য, দোকান পাট বন্ধ, দামোদর নদের তপ্ত বালুরাশি উত্তাল বাতাসের স্কন্ধে ভর করিয়া শহরের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই তপ্ত হাওয়া গায়ে লাগিলে আগুনে পোড়ার মত সর্বাঙ্গে ফোস্কা পড়িয়া যায়।

এমনই একদিন, প্রায় বারোটার সময় একখানি রিক্সাতে চড়িয়া টেলিগ্রাফ বাবু পোষ্টাপিসের সম্মুখে নামিলেন। তাঁহার বপু স্থূল ও উন্নত, মাথায় একটি বৃহৎ টাক, বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। তাঁহার এই অস্বাভাবিক বপু ও দেহসৌষ্ঠবের জন্য শহরের সকলেই তাঁহাকে চিনে, তাঁহার নাম কুড়ন চন্দ্র রাহা; কিন্তু শহরের লোক তাঁহাকে রাহাবাবু বা তারবাবু বলিয়া জানে।

রিক্সার ভাড়া মিটাইয়া তিনি দরজা একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আপিশের কাজ এখন বিশেষ একটা কিছু নাই, কেরাণীগণ যে যাহার আসনে পাখার নীচে বসিয়া ঝিমাইতেছে। বড়বাবু অর্থাৎ পোষ্টমাষ্টারবাবু এখনও আপিশে আসেন নাই, তিনি আসিলেই একটু কর্মতৎপরতা দেখাইবার জন্য যে যাহার কিছু কিছু হাতের কাজ অবশিষ্ট রাখিয়াছে; সম্প্রতি সকলেই বিশ্রামতৎপর।

রাহাবাবু অপিশে প্রবেশ করিতেই সমবেত কেরাণীগণ তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। একজন বলিল, আরে দাদা, কেমন খেলে গলদা চিংড়ি? খুব যে কিনলে, দেখলাম আধসেরটাক্! ভোজন-বিলাসী বলিয়া পঞ্চুবাবুর একটু সুনাম আছে। তিনি রেজিষ্ট্রেশন সেক্‌শনের কেরাণী। তিনি বলিয়া উঠিলেন, গল্‌দা চিংড়ি উঠেছিল আজ বাজারে? এঃ, খবরটাও যদি পাওয়া যেত। তারপর রাহাবাবুর দিকে সোৎসুকনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ক'ত করে কিনলে?

রাহাবাবু তাঁহার নিজস্ব টেবিলের দিকে না গিয়া মধ্যগৃহেই একটি পাখার নীচে বসিয়া পড়িলেন, তারপর সন্তর্পণে শত অসম-ছিদ্রযুক্ত

গেঞ্জীটি খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন, আর সে ঝকমারির কথা বলো না, ভায়া! কাল রাত্তিরের ট্রেনে সম্বন্ধীর বৌ এসে হাজির, সম্বন্ধী আবার বড়লোক। আজ সকালে গিন্নী ধ'রে পড়লেন, দ্যাখো, ভালো দেখে একটু মাছ টাচ এনো, নিত্যি ত তিনি আর তোমার বাড়ী আসেন না।······

পঞ্চুবাবু কথাটা শুনিয়া কি একটা রসিকতা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাহাবাবু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়াও, আমার কথাটা আগে শেষ করে নি'। তারপর বাজারে গিয়ে ত' দেখি, ওরে ব্বাপ্‌রে, ইঁয়া বড় গলদা চিংড়ি! এই পোড়ার শহরে এমন মাচ ত আর সহজে উঠে না, দৈবাৎ উঠে গেছে—ইয়া ঠ্যাং, ইয়া গোঁপ, ইয়া শুঁড়! হাতের মুঠোতে ধরা যায় না। এই মাচ দেখে ত' বাজারে লোকের মাথা গরম। আমি বল্লাম, তফাৎ রও! নিজে ত' কিনি, তারপর কাছে এ'গুবে, তার আগে নয়, ব'লে দুই হাত দিয়ে ভীড় পেছনে ঠেলে রাখলাম।······

ফেলুরামবাবু আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, রাহাবাবুর কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও তখন মেছোহাটাতেই ছিলাম, ব্যাপার দেখে দু'পয়সার গুগ্‌লি কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম! এ' মাসে আবার ইন্‌শিওরেন্সের প্রিমিয়াম পড়ে গেছে!

পঞ্চুবাবু বলিলেন, গুগ্‌লি খেয়েছ? তা' বেশ, কিন্তু চুপ! মাষ্টারবাবু এ'কথা শুনলে তোমাকে এখান থেকে বদ্‌লি না করে ছাড়বেন না। জানত আজকাল কেউ গুগ্‌লি খায় না, বরং তুমি খেয়েছ শুনলে ঘেন্নায় কোন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে কথা বলবে না।

ফেলুরামবাবু মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, খায় না! বলি পাবে কোথায়, খাবে যে?

আসল কথাটা চাপা পড়িয়া গেল বলিয়া রাহাবাবু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আহা-হা, শোনই না, বাজে কথা নিয়ে বক্‌ছ কেন?

হ্যাঁ, তারপর বললাম, দেখ্ দিকিন তিনটেতে কত ওজন হয় ? মেছুনী বল্লে, দাম ঠিক কর, তারপর ওজন।

কথা শুনে গা জ্বলে গেল, বল্লাম দাম না দিয়েই তোর মাচ লিব ? কর না ওজন, তারপর দাম!

ওরে ব্বাপ্রে, ওজন করে দেখি, আড়াই পো! বল্লাম, নে তোর ঠ্যাং ছিড়ে নে; দে, আধসের করে দে! তা ও কিছুতেই ঠ্যাং ছিঁড়্তে চায় না—বলে, তারপর ঠ্যাং লিবে কে ? মালবাবু ছিলেন পাশে, বল্লেন, দে, ঠ্যাং ক'টা আমাকে দাম ধরে দে। ছ'টা ঠ্যাং তিনিই গুণে নিলেন, ছ'সিকা সের, বারো আনায় আধ সের কিনে নিয়ে গেলাম শবজী মহলে, দেখে ত চক্ষু চড়ক গাছ ······

টিং, টিং, টিং, টেলিগ্রাফের টেবিলের উপব এমন সময় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। রাহা বলিলেন, এই রে খেয়েছে! গল্পটা আর শেষ করতে দিলে না। টক্কা টক্কা টরে টরে, টরে টক্কা—টেলিগ্রাফের টেবিলে বাজিতে লাগিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাহাবাবু উঠিলেন, বলিলেন, কে জানে, বাবা, সরকারী মেসেজ'ই না কি! দাঁড়াও মেসেজটা ডেস্পাচ্ ক'রে আস্চি।···যেমন কপাল, একটু কি আর কথা বলবার অবসর আছে ?

টরে টক্কা টক্কা টরে টক্কা টক্কা টরে—অবিরাম বাজিতে লাগিল। রাহাবাবু নিজের টেবিলে যাইতে যাইতে বলিলেন, আরে দাঁড়া! আস্চি, আর বক্তে হবে না! তারপর মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, টক্কা টক্কা টরে টরে সারাটা জীবনই ত করছিস, একটুও নিঃশ্বাস ফেলতে দিবিনে ? বলিয়া অদৃশ্য শব্দকারকের দিকে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন।

রাহাবাবু নিজের চেয়ারে আসিয়া বসিলেন, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা রিসিভারের বোতাম টিপিয়া জবাব দিলেন, টক্কা টক্কা টরে; তাহার জবাব আসিল, টরে টক্কা টরে।

পঞ্চুবাবু নিজের আসনে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দাদা, সরকারী ?

রাহাবাবু কাগজে মনঃসংযোগ করিয়া জবাব দিলেন, না অর্ডিনারি, প্রাইভেট্।

রাহাবাবু কাগজ পেন্সিল লইয়া মেসেজ রিসিভ করিতে বসিলেন,—বদ্রিনারায়ণ, তারিখ ৭, ৮টা ২৫ মিনিট, শব্দ সংখ্যা ১০, এখানে পৌঁছুল, রাহাবাবু ঘড়ির দিকে তাকাইয়া লিখিলেন ১টা ১৫ মিনিট। লিখিয়া যাহার নামে বিলি হইবে, তাহার ঠিকানা লিখিলেন। তারপর প্রেরিত সংবাদ লিখিতে লাগিলেন Reached Badri gnat, শব্দটি রাহাবাবুর অপরিচিত, সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এইবারও একই রূপ জবাব আসিল। রাহাবাবু লিখিয়া যাইতে লাগিলেন,

Reached badri gnat, তারপর? জবাব আসিল, টক্কা টক্কা টরে টরে টরে ইত্যাদি। রাহাবাবু লিখিলেন, phasure। ব্যস্, ম্যাসেজ শেষ; এইবার প্রেরকের নাম,—Golgobinda। রাহাবাবু কিছুক্ষণ ভাবিলেন, তারপর—নিজে নিজেই বলিয়া উঠিলেন, ইস্, বল্লেই হোল, গোলগোবিন্দ! গোলগোবিন্দ কখনও নাম হয়? নিশ্চয়ই এ' দোলগোবিন্দ, বলিয়া 'G' কাটিয়া নিজেই 'D' করিলেন। তারপর আনন্দে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে, পৌঁছেচে রে, পৌঁছেচে!

পঞ্চুবাবু চেয়ারে বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, সহসা চিৎকার শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, ডাকাত পড়িয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দাদা, খবর কি? অমন কচ্ছ কেন?

রাহাবাবু মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিলেন, পৌঁছেচে, দোলগোবিন্দদা পৌঁছেচে।

পঞ্চুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়? বদ্রিনাথে?

রাহাবাবু চোখমুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিলেন, তা' নয় ত কি জাহান্নামে?

কিন্তু রাহাবাবুর চোখমুখ খুব প্রসন্ন দেখাইল না। খবরটার অর্থ কি হইল? Reached badri gnat phasure। যাক্‌গে ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার তাঁহার কি প্রয়োজন? একটা কিছু অর্থ নিশ্চয়ই হইবে। নিজের বিদ্যা ত মাইনর স্কুল পর্যন্ত, মারেজ্‌ স্পেলিং বুক পড়া শেষ হইতে না হইতেই ইংরাজি বিদ্যা খতম। এই সকল আধুনিক শব্দ! যাক্‌গে, যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। বলিয়া একটি খাম লইযা সংবাদটি পূরিযা দোলগোবিন্দবাবুর বড় ছেলের নাম লিখিয়া পিয়নের হাতে তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর রিসিভারে দুই একবাব টরে টক্কা করিয়া পুনরায় পূর্বস্থানে আসিয়া বসিলেন।

পঞ্চুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লিখ্‌ল?

রাহাবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, লিখ্‌ল তাব মাথা, আব আমাব মুণ্ডু—gnat phasure, ন্যাট্‌ ফেসার!

তিন

মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া ঈশানী মহাভারত পাঠ করিতেছিলেন। পাশুপত অস্ত্রলাভের আশায় অর্জুন হিমালযের দুর্গম প্রদেশে কি ভাবে একপাদ তপস্যায় রত আছেন, সেই বর্ণনা পাঠ কবিতে করিতে বাহিরেব দরজায় কড়া নাড়িবার শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি ছুটিয়া গিযা দরজা খুলিয়া দিতেই পিযন তাহার হাতে টেলিগ্রামটি দিল। ঈশানী চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, ওরে নস্করি! দেখ দিকিন তোর বাবার বোধ হয়; তার এল! নস্করি পাশের ঘরেই ঘুমাইতেছিল, হাঁক ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল, পিয়নের হাত হইতে সহি করিয়া টেলিগ্রামটি লইয়া খামটি ছিঁড়িয়া পড়িল, Reached Badri gnat phasure। পড়িয়াই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আই. এ. ফেল; অতএব

সাধারণ ইংরেজি সে জানে, কিন্তু এই অভিনব শব্দ দুইটির সহিত আজিও তাহার পরিচয় ঘটে নাই, সেইজন্য বার বার পড়িয়া মনে মনে ইহার অর্থ ভাবিয়া আকুল হইল।

ঈশানী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, বল না স্পষ্ট করে কি হয়েছে? ও'মা তা' হ'লে কি আমার কপাল ভেঙ্গেছে গো, বলিয়া তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। নস্করি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, বলিল, তুমি অমন ব্যস্ত হয়ো না, জান ত, আমার ইংরেজি বিদ্যে। আমি এর মানে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি নে, কারুর কাছ থেকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

ঈশানী ইহাকে অলীক প্রবোধ বাক্য মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার লোক আসিয়া বাড়ী ভরিয়া গেল।

নস্করিদাস টেলিগ্রাম হাতে লইয়া এই বাড়ী সেই বাড়ী করিয়া ছুটিতে লাগিল। কেহ ইহার পরিষ্কার অর্থ করিতে পারিল না। কেহ বলিল, ন্যাট ফেসার এক প্রকার পাবত্য ব্যাধি, পার্বত্য মূষিক মহারাষ্ট্রপতি শিবাজি এই রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন, এভারেষ্ট আরোহণকারীরাও এই রোগেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা দুশ্চিকিৎস্য ইত্যাদি। যাহাই হউক, ন্যাট ফেসার যে একপ্রকার ব্যাধি, সে বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় রহিল না।

নস্করি টেলিগ্রাফ অপিশে রাহাবাবুর নিকট আসিয়া হাজির হইল। রাহাবাবু বলিলেন, কি জানি, বাবা, আমি দুইবার রিপিট করেছি, বার বার একই মেসেজ আস্‌ছে—gnat phasure, কোথাও যে ভুল আছে, তাও ত মনে হয় না! তুমি বরং শহরের এক আধজন ভাল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখ, এটা কি রোগ, তার ওষুধই বা কি? বরং একটা ব্যবস্থামত ওষুধ ডাকে যত শীগ্‌গির পার, পাঠিয়ে দাও। তারপর বাবা বদ্রিনারায়ণ যা করেন!

ডাক্তার এফ্. ভি. সাইন অর্থাৎ ফণীভূষণ সেন শহরের একজন বহুডিগ্রীধারী শতমারী চিকিৎসক! নস্করি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই রোগের ব্যবস্থা চাহিল। ডাক্তার সাইন কয়েক ভলিয়্যুম মেডিকেল জার্ণাল কন্সাল্ট করিয়া জবাব দিলেন, এক্সরে ব্যতীত এই রোগের কোন ব্যবস্থা করা যাইবে না। সুতরাং রোগী না পাইলে কোন ব্যবস্থা করিতে তিনি অক্ষম। নস্করি ফিরিয়া আসিল।

এ'দিকে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বদ্রিনাথে দোলগোবিন্দবাবুর ন্যাট্ ফেসার হইয়াছে। সহরশুদ্ধ লোক সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিল। ঈশানীর ক্রন্দন-রোলে পাড়ার লোকের মধ্যাহ্ন-নিদ্রা ইতিপূর্বেই দূর হইয়াছিল।

অনেক সন্ধানেও নস্করি যখন পিতার টেলিগ্রামের কোন নিশ্চিত অর্থ করিতে পারিল না, তখন বাড়ীতে ফিরিবার সমস্ত সাহসও তাহার লুপ্ত হইল। ছ'কড়িবাবুর সঙ্গে পথে দেখা হইল, তিনি বলিলেন, একটা কাজ কর, এক্ষুণি একটা টেলিগ্রাম করে দাও। লিখে দাও, তোমার অসুখে আমরা খুব উদ্বিগ্ন, এখন কেমন আছ, জানাও। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? তুমি ছেলেমানুষ, আর যেতেও এক মাস এবং যাওয়াও মানুষের অসাধ্যি। তারমধ্যে যে রোগে ধরেছে শুনতে পাচ্ছি......

নস্করি বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ন্যাট্ ফেসার!

ছ'কড়িবাবু বলিলেন, হ্যাঁ শুনেছি, ভগবান না করুন, একটা কিছু হোক!

নস্করি অগত্যা পুনরায় রাহাবাবুর নিকট গেল, বলিল, একটা বরং টেলিগ্রাম করে দিই!

রাহাবাবু বলিলেন, তা মন্দ নয়! এই নাও, আমিই বরং লিখে দিচ্ছি, বলিয়া টেলিগ্রামের কাগজ লইয়া লিখিতে লাগিলেন, Anxious for your gnat phasure—লিখিয়া নস্করিকে পড়িয়া শুনাইলেন।

নস্করি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া রসিদ লইয়া বিদায় হইল।

পঞ্চুবাবু বলিলেন, রক্ষে নাই রে, দাদা, যার নাম ন্যাট্ ফেসার! এই রোগ হয়েছে কি, রাওলেরা টেনে দু' হাজার ফুট উৎরাইয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, কি আর না জানি, বল! তবে ছেলেটার সাম্‌নে ব'লে চুপ করে রইলাম।

চার

বদ্রিনারায়ণের মন্দির। দুই তুষারশৈলের মধ্যবর্তী সমতল তুষার-ক্ষেত্র, তাহারই মধ্যভাগে নাতিবৃহৎ তুষারোপম শুভ্র মন্দির। মন্দিরের পাদমূলে শীর্ণকায়া অলকনন্দা তুষারশয্যায় লীনা।

মন্দিরের অনতিদূরে কয়েকটি অনুচ্চ প্রস্তর-প্রকোষ্ঠ। তাহার সম্মুখে কয়েকজন যাত্রী শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেছে। অদূরে একটি অস্থায়ী তাঁবু, তাহাতে লেখা—পোস্ট্ এণ্ড্ টেলিগ্রাফ অপিশ, বদ্রিনারায়ণ। একটি টেলিগ্রাফের তার পশ্চিমের পাহাড়টির মোড় ঘুরিয়া যোশীমঠের দিকে গিয়াছে।

আকাশের দিকে তাকাইয়া বেলা তখন সন্ধ্যা কি সকাল বুঝিবার উপায় নাই। মন্দিরের দ্বি-প্রাহরিক আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আরতি শেষ করিয়া রাওল ঠাকুর সম্মুখে সমাগত যাত্রীদিগের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

এমন সময় পোস্টাপিশের একজন গারওয়ালী পিয়ন জনতার মধ্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বঙ্গালসে কোই দোলগোবিন্দ নামক আদ্‌মী এঁহা আয়া হ্যাঁ?

দোলগোবিন্দবাবু সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন, বলিলেন, কিস্ কা ওয়াস্তে? ম্যায় হি দোলগোবিন্দ!

পিয়ন বলিল, চ্যলিয়ে, আপ্‌কো এক টেলিগ্রাফ্‌ আয়া। আপিশ মে চ্যলিয়ে সহি দেনা পড়েগা। দোলগোবিন্দবাবু পিয়নের সঙ্গে পোস্টাপিশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, টেলিগ্রাফবাবুর নিকট হইতে খামটি লইযা ছিঁড়িয়া পড়িলেন, Anxious for your great pleasure.

দোলগোবিন্দবাবু প্রথমতঃ ইহার কোনই অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না, মনে মনে বলিলেন, আমি ত কাল টেলিগ্রাম করলাম, তা কি পার্যনি ? নিশ্চয়ই পেয়েছে ! আমি ত লিখেছিলাম, Reached Badri great pleasure। তারই কি এই জবাব দিয়েছে ? কিন্তু তাই যদি হয়, তবে এর মানে কি দাড়ায় ? ভাবিযা এক ইংরেজি জানা পাণ্ডাকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা কবিলেন !

সে জবাব দিল, মন্দির মে pleasure করনা ঠিক নেহি হ্যায়—দেওতা দর্শন কর্‌না, ভক্তি কর্‌না, পাণ্ডাজীকো দান কর্‌না ঈ ঠিক হ্যায়। আপকো এঁহা আ কর pleasure কর্‌না মানা কর দিয়া হ্যায়।

দোলগোবিন্দবাবু মাথায় হাত দিয়া ভাবতে লাগিলেন, ইহাই কি এই টেলিগ্রামের অর্থ, না পাণ্ডা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহার এই ব্যাখ্যা করিতেছে ? অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা কখনই এই টেলিগ্রামের অর্থ নহে, পাণ্ডা মতলব সিদ্ধি করিবার জন্য এই ব্যাখ্যা বানাইয়া বলিয়াছে। ভাবিয়া এইবার তিনি টেলিগ্রাম মাষ্টারেব নিকট গিয়া ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। টেলিগ্রাম মাষ্টার দুরূহ হিন্দী ও গারওয়ালীর মিশ্র ভাষায় ইহার যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার বাংলা করিলে এই প্রকার দাঁড়ায়। গতকল্য তিনি Reached Badri great pleasure বলিয়া যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই জবাব। ইহাতে দুইটি শব্দ ভুল ছিল, তিনি তাহা শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। বঙ্গাল দেশের টেলিগ্রাম আফিশ হইতে এমন ভুল শব্দ প্রায়ই আসে, সেখানেও ভুল ম্যাসেজ ডেলিভারী হয়। বাঙ্গালী লোক

ইংরেজি জানে না, হিন্দীও জানে না! কেবল বাংলা বাংলা করিয়া চিৎকার করিয়া মরে! সেইজন্য সেখানকার সব ম্যাসেজই তাহাকে সংশোধন করিয়া লইতে হয়; কিন্তু বাঙ্গালীরা ইহার জন্য তাহার কোন পারিশ্রমিক দেয় না। তাঁহাকে এই সংশোধনের জন্য দোলগোবিন্দবাবুর তৎক্ষণাৎ কিছু নগদ দক্ষিণা দেওয়া আবশ্যক। শুনিয়া দোলগোবিন্দবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইচ্ছা ছিল, No anxiety starting soon বলিয়া দেশে একটি টেলিগ্রাম করিবেন, কিন্তু তাঁহার আর সাহসে কুলাইল না।

—শেষ—